হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত

প্রেমময় দাশগুপ্ত



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

প্রকাশক ঃ
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা, ১৯৮২

ইউনিক কালার প্রিন্টারর্স
২০ এ, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা - ৯

আমাদের কথা

'বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ' পুস্তকমালায় হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন। পূর্ববর্তী বইগুলোর থেকে এর আকার ও আয়তন অনেক বড়, বৈচিত্র্য অনেক বেশী এবং সঙ্গত কারণেই হিউয়েন সাঙের বিবরণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতির বহুবিধ তথ্যের আকর। কোন একটি বিশেষ আদর্শ ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ভিন্ন হিউয়েন সাঙের মতো পরিব্রাজক দুর্গম পথে চীন থেকে ভারতবর্ষে এসে এই বিশাল দেশের বহু বিচিত্র প্রদেশ ও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম হতেন না এবং সেই কারণেই তার কিছু কিছু বিবরণ প'ড়ে মনে হয় যে তিনি হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে কিংবদন্তী বা অপরের মুখের অতিশয়োক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা হয়তো তাঁকে দিয়ে এমন অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়েছে যা' আজকের পাঠক-পাঠিকার পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর। বিশেষ যত্নের সহিত আমাদের এই সংকলনটিতে বিশ্বাসযোগ্য, সঙ্গতি ও তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে যাতে এটি আজকের পাঠক-পাঠিকার পক্ষে বিশেষ পঠন ও অনুধাবনযোগ্য হয়।

হিউয়েন সাঙ উল্লিখিত কিংবদন্তী ও অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পুরোপুরি বর্জন করলে এর স্বাদ ও চরিত্র একেবারে বদলে যা'বে এবং তা'তে হয়তো একালের কিছু পাঠক-পাঠিকা ইতিহাস-ক্ষুণ্ণতার দা'য়ে আমাদের দায়ী করতে পারতেন। সেই কারণে এর কিছু (নমুনা হিসাবে) রাখতে বাধ্য হয়েছি।

পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ

মহান চীনা পর্যটক হিউয়েন-সাঙ ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে হো-নান প্রদেশের চিন-লিউ-তে জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। অল্প বয়সেই তিনি মেজ ভাইয়ের সঙ্গে চীনের পূর্ব-রাজধানী লো-আঙ আসেন। ভাই ছিলেন ৎসিঙ-তু মন্দিরের ভিক্ষু। তের বছর বয়সে হিউয়েন-সাঙও এই মন্দিরে উপাসক হলেন। সুই রাজবংশের পতনকালে যে পরিস্থিতি দেখা দেয় তার ফলে তিনি ও তাঁর ভাই ঝেচেওয়ান প্রদেশের রাজধানী শিঙ-তু-তে চলে আসেন। এখানে ২০ বছর বয়সে তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ ভিক্ষু রূপে উপসম্পদা লাভ করেন বা দীক্ষিত হন।

উপসম্পদা লাভের কিছু কাল পর থেকে তিনি চীনের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ শুরু করেন। উদ্দেশ্য হলো দেশের শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে শিক্ষালাভ। ঘুরে ঘুরে শেষ অবধি চাঙ-অন এলেন। সেখানে ফা-হিয়েন ও চি-য়েন এর স্মৃতিকথা পড়ে ভারতে আসার জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। এখানকার বৌদ্ধ ঋষিদের সংস্পর্শে এসে মনের যা কিছু প্রশ্ন ও সংশয় দূর করার গভীর বাসনা দেখা দেয়। এ সময়ে তাঁর বয়স ২৬ বছর।

৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চাঙ-অন থেকে ভারত অভিমুখে রওনা হলেন। সঙ্গে ছিলেন কান-সুহ প্রদেশের সিঙ-চান শহরের একজন ভিক্ষু। সেই শহরে পেঁছে তিনি বিশ্রাম নিলেন। তারপর এগিয়ে চললেন লন-চাউ। এটি কান-সুহ প্রদেশের প্রধান শহর তখন। এখান থেকে তিনি এই প্রদেশের শাসনকর্তার একজন রক্ষীর সঙ্গে নদীর অপর পাড়ে থাকা লিয়াঙ-চাউ গেলেন। এ শহরটি তিব্বত ও সুঙ-লিঙ পর্বতমালার পূর্বদিকের দেশগুলি থেকে আসা বণিকদের মিলন কেন্দ্র ছিল। হিউয়েন এদের কাছে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করলেন। জানালেন, ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানার জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের দেশ ভারতবর্ষে যেতে চান। তাঁরা তাঁকে এজন্য খরচ যুগিয়ে দিলেন। শহরের শাসনকর্তা রাজনৈতিক কারণ থেকে তাঁকে যেতে বারণ করলেন। কিন্তু হিউয়েন দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সরকারি অনুমতি না দিলেও পরোক্ষ সাহায্য দিলেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দুজন ভিক্ষুর সহায়তায় তিনি পশ্চিম দিকে কাওয়া-চাউ এলেন। এ শহরটি সু-লু নদী থেকে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে এবং সম্ভবত বুলানাঘির। এখান থেকে এক যুবকের সঙ্গে তিনি উত্তর দিকে এগোতে থাকলেন। এই যুবকটি তাঁর

পথ-দিশারী হবার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ হিউয়েনকে হত্যা করে তাঁর অর্থ লুটে নেয়া। হিউয়েন তার বিশ্বাসঘাতকতা এড়িয়ে একা একাই এখানকার সীমান্ত অঞ্চলে থাকা পাঁচটি প্রহরা ঘাঁটির প্রথমটির দিকে এগিয়ে চললেন। এখানে নানা বিপদের হাত থেকে একরকম অলৌকিক ভাবে রক্ষা পেয়ে তিনি পাঁচটি ঘাঁটি পেরিয়ে সীমান্তের অপর দিকে ই-গু বা কামুল পেঁছিলেন। এখানে বিশ্রাম নেবার কালে স্থানীয় রাজা কাও-চাঙ (তুরফন) তাঁকে তাঁর রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। তিনি হিউয়েনকে স্থায়ী ভাবে তাঁর রাজ্যে থাকার জন্য আটকে রাখতে চাইলেন। হিউয়েন রাজী হলেন না। নানাভাবে চেষ্টা করেও যখন রাজা দেখলেন, হিউয়েনকে আটকানো সম্ভব নয় তখন তিনি তাঁকে ও-কি-নি বা করসার যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখান থেকে তিনি এলেন কুচে। কুচে থেকে বালুকা বা বই (অক্সু প্রদেশে)। এখান থেকে উত্তর দিকে তুষারাবৃত পর্বতমালা ডিঙিয়ে তিনি ৎসিঙ হ্রদের নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে এসে হাজির হলেন (ইস্সাইককুল)।

এর পর 'সু-য়েহ' বা চু নদীর সুফলা উপত্যকা ধরে পথ হেঁটে তুরকীদের শহর 'সু-য়েহ'তে। সেখান থেকে তরস, নুজকেন্দ ও তাসখন্দ। তারপর সুতৃষ্ণ, সমরকন্দ কেবুদ, কর্সানিয়া হয়ে বোখারায় এলেন।

বোখারা থেকে বেটিক, খোয়ারিজন, কেশ, তিরমেদ, চঘানিয়ান, গরসো, সুমান কুবাদিয়ান, ওয়াখশ, খোটল, কুমিধ, রোশান, বঘলান, পুই, সমনগান ও খুলম হয়ে হাজির হলেন বালখ-এ।

বালখ পিছনে রেখে তারপর তিনি এগোতে থাকলেন জুমধ, জুজগান, তালিকান, গচি, বামিয়ান ও কপিশার দিকে।

কপিশায় পেঁছে সেখান থেকে এগিয়ে চললেন 'লান-পো' বা ভারতের উত্তর সীমান্তের ল[illegible]ক। বোধ হয় ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সেখানে এসে প্রথম ভারতের মাটিতে পা রাখলেন।

আর তার ১৪ বছর পর ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ-ল-ন বা বরণ থেকে ভারতের বাইরে পা রাখেন ও এক বছর পর ৬৪৫-এ চীনের পশ্চিম রাজধানী শিঙ-ফুতে পেঁছান।

চীনে ফিরে এসে তিনি প্রধানতঃ ভারত থেকে নিয়ে আসা বিভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র-বই অনুবাদের দিকে মন দেন। কম করেও ৭৫ খানি বই তিনি অনুবাদ করেন।

ভারত থেকে ফেরার পর চীনে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করেন। ৬৬৪তে তিনি মারা যান। চীন সম্রাটের নির্দেশে প্রচুর জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁকে পশ্চিম রাজধানী শিঙ-ফুতে সমাধিস্থ করা হয়। এর পাঁচ বছর পর ৬৬৯-এ তাঁর দেহাবশেষ

সেখান থেকে সম্রাটের নির্দেশে ফন-চুয়েন উপত্যকার উত্তরে একটি জায়গায় সরিয়ে আনা হয় ও সেখানে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মারক-সৌধ গড়া হয়।

ভারত থেকে ফেরার সময়ে যে বিরাট পুঁথিভাণ্ডার ও মূর্তি ইত্যাদি তিনি সঙ্গে নিয়ে যান তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো—

১। বুদ্ধের দেহাস্থি—৫০০ গ্রেন।

২। স্বচ্ছ স্তম্ভের উপর থাকা একটি সোনার বুদ্ধমূর্তি।

৩। স্বচ্ছ স্তম্ভের উপর থাকা একটি চন্দন কাঠের বুদ্ধমূর্তি। এটি কৌশম্বীর রাজা উদয়নের তৈরী মূর্তির আদলে তৈরী।

৪। ওই ধরনের আর একটি চন্দন কাঠের বুদ্ধমূর্তি। ৩৩তম স্বর্গ বা তুষিত স্বর্গ থেকে বুদ্ধের ফিরে আসার সময়কার আদলে তৈরী।

৫। স্বচ্ছ বেদীর উপর বসানো একটি রূপার তৈরী বুদ্ধমূর্তি।

৬। স্বচ্ছ বেদীর উপর বসানো একটি সোনার বুদ্ধমূর্তি।

৭। স্বচ্ছ বেদীর উপর বসানো একটি চন্দন কাঠের বুদ্ধমূর্তি।

৮। মহাযান শাখার ১২৪টি সূত্রের পুঁথি।

৯। ২২টি ঘোড়ার পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া ৫২০ বোঝা অন্যান্য শাস্ত্র বই।

ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ, হিউয়েন-সাঙ ও তার ভ্রমণ পথ

মানুষ শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে তৃপ্ত ও সুখী জীবন যাপন করছে, নির্ভয়ে যখন যেখানে খুশি যেতে পারছে, বসবাস করতে পারছে—ভারতে এসে পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এ দৃশ্যই দেখে গেছেন। তিনি এদেশে আসেন হিউয়েন-সাঙ থেকে প্রায় ২৩০ বছর আগে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর একেবারে আরম্ভে। গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষ ভাগ তখন। পুরো দেশ রাজনৈতিক দিক থেকে সুসংহত, বিদেশী শত্রুর ভয়-মুক্ত।

হিউয়েন-সাঙও তৃপ্ত ও সুখী মানুষ দেখেছেন, মানুষের সম্পদ ও ঐশ্বর্য দেখেছেন, বিলাসিতা প্রত্যক্ষ করেছেন। পাশাপাশি আবার দেখেছেন দারিদ্র, চোর-লুটেরা-ডাকাতের উপদ্রব, নিয়ম-শৃঙ্খলার তুলনামূলক অভাব বা অবনতি।

দরিদ্র ও ভিখারি অবশ্য 'রাম-রাজত্বে'ও ছিল। ইতিহাস লিখতে বা পড়তে গিয়ে সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিই না। জাঁক-জমক, আড়ম্বর, ধন-সম্পদ, দান-ধ্যান ইত্যাদি দেশ ও সমাজের আলোর জৌলুষের দিকেই তাকাই, রাতের অন্ধকার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকি।

হিউয়েন-সাঙ এদেশের মাটির উর্বরতা দেখে, প্রচুর শস্য, ফুল, ফলের ফলন দেখে অভিভূত হয়েছেন। প্রাকৃতিক শোভা, শিল্পকলা, ভাস্কর্য দেখে হয়েছেন মুগ্ধ। ঐশ্বর্যের পরিচয় লেখা বাড়ি ঘর, বিলাসিতা, আড়ম্বর, প্রাচুর্য, দান-ধ্যান তাঁকে অবাক করে দিয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি অন্য চিত্রটিও তাঁর নজর এড়ায়নি। পাঞ্জাবের টক্ক রাজ্য ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন ও বলেছেন 'আগে এ দেশটিতে গরিব ও অনাথদের থাকার জন্য অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছিল। তারা এদের ওষুধপত্তর, খাদ্য, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিষপত্র বিতরণ করতো। এর ফলে ভ্রমণকারী বা পথচারীদের যথাসর্বস্ব, তেমন কেড়ে নেওয়া হতো না'। এই মন্তব্যে হিউয়েন শুধু চোর-লুঠেরার কথাই বলেননি, তাদের উপদ্রব বৃদ্ধির কারণের আভাসও কিছুটা দিয়েছেন।

দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে হিউয়েন জানিয়েছেন 'লুটেরা-ডাকাতের দল এখানে সবার চোখের সামনে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' এই উপদ্রব শুধু যে টক্ক আর চোল রাজ্যেই ছিল তা নয়। পথে লুটেরা-ডাকাতদের উপদ্রবের কথা তিনি অনেক জায়গাতেই উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেও বার চারেক এদের কবলে পড়েন বলে তার জীবনীতে বলা হয়েছে। এমনকি খোদ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের রাজ্য মধ্যে অযোধ্যা ও প্রয়াগের মধ্যবর্তী হয়মুখ রাজ্য দিয়ে প্রয়াগ আসার পথে তিনি জলদস্যুদের হাতে পড়েন।

জীবনী মধ্যে ওই সব ঘটনার যে রকম অলৌকিক পরিসমাপ্তি দেখানো হয়েছে তাতে এরকম ধারণা স্বাভাবিক যে বৌদ্ধ ধর্ম ও বিশেষভাবে হিউয়েন-সাঙ-এর মহিমা বাড়ানোর জন্যই বোধহয় ওই ঘটনাগুলি কল্পনা করা হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলেও তা যে বাস্তব পরিস্থিতির ভিতের উপর গড়া কল্পনা—হিউয়েনের বিবরণই সেকথা বলে দেয়। সুতরাং অতিরঞ্জিত হলেও ওই সব ঘটনা নিছক কল্পিত কাহিনী বলে মনে করা চলে না।

সারা ভারত ঘুরে বেড়ানোর কালে হিউয়েন অনেক শহর, পুরানো রাজধানী, অনেক গ্রাম, এমন কি এক একটি রাজ্যকেও ক্ষয়িষ্ণু ও জন-বিরল অবস্থায় দেখেছেন। গান্ধারের কথা বলেছেন 'এর শহর ও গ্রামগুলি প্রায়-পরিত্যক্ত, খুব অল্প লোকই এখন এখানে বাস করে।' উত্তর ভারতে কপিলাবস্তুর কাছে থাকা 'লান-ম' বা 'রাম' রাজ্যটি সম্পর্কে বলেছেন 'এ রাজ্যটি বহুকাল চাষ-আবাদহীন জন-মানব শূন্য হয়ে পড়ে ছিল।...শহরগুলির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। অধিবাসীর সংখ্যা সামান্য।' উত্তর-পশ্চিম বাঙলায় গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা কজুঘীরা বা কজঙ্গল রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে

জানিয়েছেন 'একটি পড়শী রাজ্য এখন একে শাসন করছে। এজন্য এর শহরগুলোতে মানুষজন একরকম নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ লোকই গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে।' কলিঙ্গ রাজ্যের বেলায় বলেছেন 'আগে এখানে খুব ঘনবসতি ছিল। এক ঋষির ক্রোধে পরে জনশূন্য হয়ে পড়ে। এরপর বাইরের লোক এসে ধীরে ধীরে এখানে বাসবাস শুরু করে। তবু এখনো যথেষ্ট জনবসতি গড়ে ওঠেনি।'

এ নিশ্চয়ই দেশের সর্বত্র সব স্তরের মানুষের মধ্যে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির মনোরম ছবি নয়। যুদ্ধ বিগ্রহে নড়বরে, অর্থনীতি ও আইন-শৃঙ্খলায় ভাঁটা দেখা দেয়া এক জনসমাজের ছবি।

ষষ্ঠ শতাব্দীর আরম্ভে গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন শুরু হয়। এর ফলে যে রাজনৈতিক একাত্মতার অভাব ও শক্তি-শূন্যতা দেখা দিতে আরম্ভ করে তা বিদেশী শক্তিকে আবার ভারতের দিকে লোভের থাবা বাড়াতে উৎসাহিত করে তোলে। তোরমান ও তার ছেলে মিহিরকুলের নেতৃত্বে হূণরা আগের চেয়েও প্রবল বেগে হানা দিতে থাকে ভারতের জনজীবন ও রাজনৈতিক স্থিতি টলোমলো করে তোলে। মালবের যশোধর্মণ ও মগধের গুপ্ত রাজা বালাদিত্যের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তাদের থাবা ভেঙে গেলেও তাদের দুজনের কারো পক্ষেই দেখা দেওয়া একাত্মতার অভাব ও শক্তি-শূন্যতা দূর করা সম্ভব হয়নি। যশোধর্মণ উল্কার মতোই দেখা দেন ও মিলিয়ে যান।

সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে গৌড় বা কর্ণ-সুবর্ণের রাজা শশাঙ্কও সম্ভবতঃ ওই অভাব ও শূন্যতা দূর করতে চেয়েছিলেন। তার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে আসেন স্থানেশ্বরের পুষ্পভূতি রাজবংশের হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য। শশাঙ্ককে তিনি পরাস্ত করতে না পারলেও তার অগ্রগতি যে রোধ করে দিয়েছিলেন এতে সন্দেহ নেই। মৃত্যুর পর শশাঙ্কের গড়া রাজ্য হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

হর্ষবর্ধনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেন মহারাষ্ট্রের চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে তিনি হর্ষবর্ধনের অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেন। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে বিপাশা নদী পার হওয়াও হর্ষবর্ধনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সে অঞ্চলে তখন কাপিশা, উদ্যান, কাশ্মীর ও টক্কের শাসনাধীন। একটি রাজ্য (লঙলা) পারস্যের অধিকারে। নেপাল ও কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষপুরও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল।

বিপাশা নদীর এপারে অবশিষ্ট উত্তরাপথে হর্ষবর্ধন কতখানি সাফল্য অর্জন করে-ছিলেন তা এখনো গবেষণার বিষয়। হিউয়েন-সাঙ হর্ষবর্ধনের আমলে এদেশে আসেন। তিনি তাঁর অবারিত প্রশংসা প্রশস্তি করেছেন। তাঁকে পূব থেকে পশ্চিম

পর্যন্ত সমগ্র ভারত (উত্তরাপথ)-এর একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বিবরণ ভুলত্রুটি ও অতিরঞ্জন বর্জিত নয়।

হিউয়েনের জীবনী বইটিতে তাঁর নিজের গুরুত্ব ও মহত্ব বাড়ানোর জন্য, তিনি নিজেই হোন অথবা তাঁর শিষ্যরা হোন, বেশ কিছুটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এর ফলে মূল বইয়ে থাকা হর্ষবর্ধন, শীলাদিত্য ও কামরূপের ভাস্করবর্মণ এবং এদের সঙ্গে হিউয়েনের সম্পর্ক গড়ে ওঠার বর্ণনার সঙ্গে জীবনী বইয়ে থাকা বর্ণনার কিছুটা গরমিল দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। যেমন মূল বইতে হিউয়েন জানিয়েছেন— কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণ তিন তিনবার নিমন্ত্রণ পাঠালেও তিনি যাননি। তখন নালন্দার আচার্য শীলভদ্র তাঁকে যাবার জন্য উপদেশ দেন। এরপর তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য দূতের সঙ্গে কামরূপ যাত্রা করেন। কিন্তু জীবনী বইতে বলা হয়েছে, ভাস্করবর্মণ হিউয়েনকে পাঠাবার জন্য দু' দুবার শীলভদ্রের কাছে দূত মারফত পত্র পাঠান। কিন্তু 'সে যে শীঘ্রই দেশে চলে যাবে' এই অজুহাত দেখিয়ে না করে পাঠান। শেষে ভাস্করবর্মণ ক্ষেপে গিয়ে হুমকি দিয়ে পত্র দেন যে যদি হিউয়েনকে না পাঠানো হয় তবে শশাঙ্ক রাজা যেভাবে বৌদ্ধ-ধর্মের নাশ করেন ও বোধিবৃক্ষ ধ্বংস করেন তিনিও ঐভাবে সেনা ও হাতি পাঠিয়ে নালন্দা মহাবিহার গুঁড়িয়ে দেবেন। তখন শীলভদ্র তাঁকে যাবার উপদেশ দেন। ভাস্করবর্মণ কি এতই আহাম্মক ছিলেন যে একজন বৌদ্ধ শ্রমণের জন্য তিনি নালন্দা মহাবিহার গুঁড়িয়ে দিতে চাইবেন। বিশেষ করে যে মহাবিহার আবার তাঁর নিজের রাজ্যে নয়, সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজ্যে। ভাস্কর-বর্মণ বৌদ্ধও ছিলেন না। হিউয়েনের বিবরণ মতো তিনি ছিলেন বিষ্ণু উপাসক ও ব্রাহ্মণ। শীলাদিত্যকে কেন্দ্র করেও এই একই ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনার আমদানি হয়েছে সেখানে।

জীবনী বইটিতে যেরকম অলৌকিকত্বের ছোঁয়াচ লেগেছে সে তুলনায় মূল বইটি কিন্তু খুব স্বাভাবিক। ধর্মীয় প্রসঙ্গ ও উপাখ্যানগুলিকে বাদ দিলে বাকি অংশ সহজ, সরল, স্বাভাবিক। হিউয়েন সরলভাবে নিষ্ঠার সঙ্গেই সব তুলে ধরতে চেয়েছেন। এমন কি বৌদ্ধ হয়ে অন্য ধর্মীদের মন্দির কিংবা বিগ্রহের বর্ণনা ও তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে তার আটকায়নি। আটকায়নি অন্যধর্মী পন্ডিতদেরও প্রশংসা করতে, শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে। এসব ক্ষেত্রেও তার মনের স্বাভাবিক মানবিক সৌন্দর্য, তার ভেতরের জ্ঞান-শিল্পকলা-সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষটি চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

ধর্মীয় অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী এই মানুষটি অলৌকিকতার ক্ষেত্রেও কিন্তু বৈষম্য করেন নি। যেমন তিনি বৌদ্ধ বোধিসত্ব মূর্তি, বুদ্ধমূর্তি, স্তূপ, দেহাবশেষের

অলৌকিকত্ব বর্ণনা করেছেন, তেমন হিন্দু দেব-দেবী বিগ্রহ বা মন্দিরের অলৌকিকত্ব ও মহিমা ব্যক্ত করতে কুন্ঠিত হননি, বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। যখন তিনি স্তূপ, মূর্তি বা দেহাবশেষ থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হওয়ার কথা বলেন তা পড়ে অবশ্য আমাদের হাসি পায়। কিন্তু তিনি যে মিথ্যে কথা বলেন নি তার পরিচয় পাওয়া যায় জীবনীতে বিবৃত একটি ঘটনা থেকে।

বৌদ্ধ পূর্ণিমায় হিউয়েন-সাঙ একবার অপর এক বিখ্যাত পন্ডিত জয়সেনকে নিয়ে বুদ্ধ-গয়ায় উৎসব দেখতে যান। এই উৎসবের সময় সেখানকার বোধিবিহার-এ বুদ্ধের দেহাস্থি দেখানো হয়ে থাকে। হিউয়েনও জয়সেনকে সঙ্গে নিয়ে তা দেখতে গেলেন। এর মধ্যে ছোট ও বড়ো দু রকম দেহাস্থিই ছিলো। বড়োগুলি গোল মুক্তার মতো। চকচকে উজ্বল। রক্তাভ হলদে রঙের। চামড়ার নিদর্শনও রয়েছে। বরবটীর বিচির মতো আকারের, দেখতে উজ্বল লাল। দেখে ফিরে এসে রাতে জয়সেন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থির আকারের সঙ্গে তার অসাম্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে হিউয়েনকে বললেন—'আপনি তো অনেক জায়গাতেই দেহাস্থি অবশেষ দেখেছেন। সবগুলিই চালের দানার মতো ছোট ছোট। তাহলে এখানকার এগুলো এতো বড়ো বড়ো হলো কী করে? এ ব্যাপারে আপনার মনে কি সন্দেহ দেখা দিচ্ছে না?'

হিউয়েন উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ, আপনার মতো আমার মনেও এ ব্যাপারে সন্দেহ জাগছে।'

এর কিছুক্ষণ পরেই বিহারটিতে থাকা সবগুলি বাতি হঠাৎ নিভে গেল। আচমকা এক অলৌকিক আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তাঁরা তাকিয়ে দেখলেন, অস্থি থাকা সেই স্তূপটি থেকে সূর্যের মতো আলো ও জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। স্তূপটির চূড়া থেকে পাঁচরঙা চঞ্চল আলোকশিখা আকাশ ছুঁয়েছে। চারিদিক আলোয় আলোময়। সে আলোর চাঁদ আর তারা ম্লান হয়ে গেছে। এক মৃদু সুরভিতে বিহারের পরিমন্ডল ভরে উঠেছে।

চারিদিকে জোর হৈ হৈ উঠলো, 'শরীর (দেহাস্থি বা দেহাবশেষ) তার অলৌকিক ক্ষমতা দেখাচ্ছে।' সকলে সেখানে ছুটে গেলো। এ দৃশ্য দেখে গদগদ হয়ে উঠলো প্রশংসায়। আলো ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে যেতে থাকলো, বার কয়েক স্তূপের চূড়ায় পাক খেয়ে স্তূপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে এলো চারিদিকে আগের সেই অন্ধকার। আকাশের তারাগুলিকে চোখে দেখা সম্ভব হলো আবার। এই অলৌকিক ঘটনা চোখে দেখে সবাই তাদের মধ্যে থাকা সবরকম সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত হলো।

যে সব বৌদ্ধ স্তূপ, দেহাস্থি বা মূর্তি থেকে জ্যোতি বিকিরণের কথা হিউয়েন

জানিয়েছেন সে সব স্থানে এভাবেই জ্যোতি বিকীর্ণ করানো হতো। সব থেকে বেশি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবার কথা হিউয়েন বলেছেন রাজা অশোকের গড়া স্তূপগুলি প্রসঙ্গে। বইটিকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য সে বিবরণ অবশ্য এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে প্রাচীন আখ্যায়িকা ও গাল-গল্পগুলোও। পরস্পরের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করতে গিয়ে ধর্ম কোন অতলে খসে গিয়েছিল, কীরূপ মিথ্যার পসরা তৈরী করেছিল, এগুলি তারই উদাহরণ। সব ধর্মেই এগুলি সমান রয়েছে। আগেও ছিল, এখনো আছে। অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী ও তার বাস্তব মহিমায় (অজ্ঞ সাধারণ মানুষের উপর তার প্রভাব দেখে) অভিভূত হিউয়েন এখানে এসে যা দেখেছেন ও শুনেছেন তাকেই সাংবাদিকের মতো লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর মূল বইটিতে। এসব অতিরঞ্জন ও গালগল্পের জন্য মূলতঃ তিনি দায়ী নন। দায়ী ভারত, ভারতের তৎকালীন তথাকথিত ধর্মীয় পরিবেশ। ধর্মের মহিমা বাড়াতে গিয়ে তাঁরা নানা গালগল্প অতিরঞ্জনের দ্বারা ইতিহাসকে বিকৃতির অতলে তলিয়ে দিতেও পিছপা হননি। তাই পঁচিশ, পঞ্চাশ বা একশো বছর আগেকার ঘটনাও অবিকৃত ভাবে পাওয়া যায় না। তাই হিউয়েন রাজা শশাঙ্ক বা হূণ রাজা মিহিরকুলের বিবরণ অবিকৃতভাবে আমাদের দিয়ে যেতে পারেননি। বৌদ্ধ ধর্মের শত্রু হিসাবে দুজনকেই সমান ভাবে দুর্জন সাজিয়েছেন। আর এই ভারতীয় বিকৃতির ছোঁয়াচ হিউয়েনের গায়েও যে শেষ পর্যন্ত লেগেছিলো তার পরিচয় তাঁর জীবনী বইটি ও রাজা হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যের বিবরণ। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করার দরুন হর্ষবর্ধন নিশ্চয়ই একজন সুজন। রাজা অশোক ও কনিষ্কের মতোই তাঁর কীর্তি ও মহিমার অতিরঞ্জন আবশ্যক। অতএব অবলোকিতেশ্বর আবির্ভাব ও কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্মের যে ক্ষতিসাধন করেছে তার ক্ষত মুছে দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের জন্য হর্ষবর্ধনের প্রতি তার আদেশ—এসব গালগল্প শোনাতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। বলতে বাধেনি 'তাঁর সৈন্যরা অবিরাম গতিতে এগিয়ে চললো। পূব থেকে পশ্চিমে সবাইকে তিনি অধীনে আনলেন। দখল করলেন ছয় বছরের মধ্যে পুরো পঞ্চসিন্ধু।' হর্ষবর্ধন ও তার ভাই-বাবা-পূর্বপুরুষরা যে মূলতঃ কনৌজের রাজবংশ নন, থানেশ্বরের রাজবংশ এই সাধারণ সংবাদটি যিনি জানেন না, তিনি শীলাদিত্যের সঙ্গে অবলোকিতেশ্বর বোধি-সত্ত্বের দেখাসাক্ষাতের ঘটনাটি কী করে জানলেন এ প্রশ্ন অবশ্যই আমরা করতে পারি। মনে হয়, তার সম্পর্কে তিনি বিশদভাবে কোন খোঁজ খবর নেন নি। যা নিজের চোখে দেখেছেন, যা বৌদ্ধ মহলের পরিচিত পাঁচজনের কাছ থেকে শুনেছেন তার উপরেই লিখেছেন। কোন লোক বড়ো হলে তাকে নিয়ে আমাদের দেশে দেখতে দেখতে নানা

স্বাদু গল্প, কিংবদন্তী গড়ে ওঠে। অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গে শীলাদিত্যের দেখাসাক্ষাৎ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ মহল থেকে ছড়ানো সেই ধরনেরই এক স্বাদু গল্প।

রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে যে সব বিবরণ এখানে রয়েছে তা কতদূর সত্য তা নিয়ে স্বতঃই সন্দেহ জাগে। যিনি নিজের মূল রাজ্য কর্ণসুবর্ণের সংঘারাম ও স্তূপগুলি অক্ষত রাখলেন তিনি কেন মগধে গিয়ে সেখানকার সংঘারাম ভাঙতে গেলেন, বোধিবৃক্ষ কাটতে গেলেন, বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত পাথর গঙ্গায় ফেলে দিতে গেলেন? কেনই বা সেখানকার বৌদ্ধ বিহার থেকে বুদ্ধের মূর্তি সরিয়ে মহেশ্বর মূর্তি স্থাপনের আদেশ করলেন? সমস্ত ব্যাপারটিই গালগল্প বলে মনে হয়। অধিকার বিস্তার করতে গিয়ে শশাঙ্ক যেসব রাজাকে উচ্ছেদ ও পদানত করেন তাদের অনেকেই বোধ হয় বৌদ্ধধর্মী বা তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর ফলে বৌদ্ধধর্ম তাদের পৃষ্ঠপোষণা থেকে বঞ্চিত হয়ে সম্ভবতঃ সামগ্রিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও শশাঙ্ককে বৌদ্ধ-ধর্মের শত্রুরূপে মনে করতে শুরু করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে হর্ষবর্ধনের বড়ো ভাই রাজ্যবর্ধন, যাকে শশাঙ্ক হত্যা করেন বলে জানা যায়, বৌদ্ধ ছিলেন। বরঞ্চ হর্ষবর্ধনই পুরোপুরি বৌদ্ধধর্মানুরাগী ছিলেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তার রাজকীয় মোহর ও অন্য দুটি লেখ থেকে মনে হয় যে তিনি শৈব ধর্মানুরাগী ছিলেন। বোধিবৃক্ষের কাছে থাকা বৌদ্ধ বিহারটি সম্পর্কে যে কিংবদন্তী হিউয়েন-সাঙ শুনিয়েছেন তা থেকে সন্দেহ উঁকি দেয়, যে সেটি সম্ভবতঃ আগে একটি শিব বা মহেশ্বর মন্দির ছিল ও পরে তাকে বৌদ্ধ বিহারে পরিণত করা হয়। হয়তো বা সেই কারণেই শশাঙ্ক তাকে আবার মহেশ্বর মন্দিরে রূপায়িত করার আদেশ দেন। যাই হোক, এ সম্পূর্ণই অনুমান। রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে সত্য ঘটনা জানার জন্য আমাদের তথ্যের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

হিউয়েন-সাঙ তাঁর বিবরণে সিংহল নিয়ে মোট ৮২টি রাজ্যের কথা বলেছেন। প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি বলে মনে করা যেতে পারে। কেননা, উত্তর ভারত তিনি যতোটা ব্যাপকভাবে ঘুরেছেন, দক্ষিণ ভারতে ততো ব্যাপক ঘোরেননি। ফলে সেখানকার কিছু রাজ্যের কথা স্বভাবতঃই তার বিবরণ মধ্যে বাদ পড়েছে। কিন্তু ভারতের কথা সামগ্রিকভাবে বলার বেলায় বলেছেন 'সমগ্র ভূ-ভাগ সত্তরটি বা কিছু কম-বেশি দেশে বিভক্ত।' এই ব্যতিক্রমের দুরকম কারণ হতে পারে। (১) তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন সমগ্র দেশটি ৭০-এর কাছাকাছি রাজা-শাসিত অঞ্চলে বিভক্ত। (২) অথবা তিনি যে ১১টি রাজ্যকে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য বলেছেন তাকে এই হিসাব থেকে বাদ দিয়েছেন।

হিউয়েন কপিশা থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে প্রায় ৬০০ লি পথ পার হবার পর ভারতের উত্তর সীমান্তে পা রাখেন। যে জায়গাটিতে তিনি আসেন সেটি হলো লম্পক বা লামঘান রাজ্য। সেখান থেকে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য বলে অভিহিত ২১টি দেশ তিনি এভাবে ঘুরে দেখেন—(১) লম্পক—(২) নগরহার—(৩) গান্ধার—(৪) উদ্যান —(৫) বোলর-গান্ধার—(৬) তক্ষশীলা—(৭) সিংহপুর—(৮) উরস—(৯) কাশ্মীর—(১০) পুনচ—(১১) রাজপুরী।

জীবনীতে ৫-বোলর-কে এই ভ্রমণ পথ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার বদলে, ভারত থেকে ফিরে যাবার বেলায় পামির উপত্যকা অতিক্রম করার সময়ে পামিরের দক্ষিণে এক পর্বতমালার ওপারে এ দেশটি অবস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বোধ হয়, এটি ভারতের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে পড়ে না বলে এই পরিবর্তন করা হয়েছে।

রাজপুরী থেকে হিউয়েন একের পর এক যান (১২) টক্ক (১৩) চীনাপাতি (১৪) জালন্ধর (১৫) কুলুত (১৬) শতদ্রু (১৭) পারিযাত্র (১৮) মথুরা (১৯) স্থানেশ্বর (২০) শ্রুঘ্ন (২১) মতিপুর (২২) ব্রহ্মপুর।

ব্রহ্মপুরের পর হিউয়েন পর্বতমালার মধ্যে প্রমীলারাজ্য (২৩) হিরণ্যগোত্রের কথা বলেছেন, কিন্তু সেখানে যাননি।

এরপর (২২) ব্রহ্মপুর থেকে নিচের দিকে নেমে, আসেন (২৪) গোবিসান ও সেখান থেকে (২৫) অহিক্ষেত্র বা অহিচ্ছত্র। জীবনীতে কিন্তু গোবিসান বাদ গেছে। (২৫) অহিক্ষেত্র থেকে এবার তিনি একের পর এক ঘুরলেন (২৬) বীরসান (২৭) কপিত্থ (২৮) কনৌজ (২৯) অযোধ্যা (৩০) হয়মুখ (৩১) প্রয়াগ (৩২) কৌশাম্বী (৩৩) বিশাখা (বিশোক ?) (৩৪) শ্রাবস্তী (৩৫) কপিলাবস্তু (৩৬) রাম বা রাম গ্রাম (৩৭) কুশীনগর (৩৮) বারানসী (৩৯) গর্জপুর বা ঘাজিপুর (৪০) বৈশালী।

মূল বইয়ের বিবরণ অনুসারে এরপর হিউয়েন (৪১) বৃজি ও (৪২) নেপাল গিয়ে আবার (৪০) বৈশালী ফিরে আসেন ও সেখান থেকে (৪৩) মগধ উপস্থিত হন।

কিন্তু জীবনীতে বৃজি ও নেপালকে বাদ দেয়া হয়েছে। এজন্য তিনি ওই দুটি রাজ্যে প্রকৃতই গিয়েছিলেন কিনা এ নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়।

৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপটেম্বর মাসে হিউয়েন-সাঙ চীন থেকে যাত্রা শুরু করেন। ৬৩০-এর সেপটেম্বরে ভারত সীমানায় পদার্পণ করেন। ৬৩১-এর মে মাসে তিনি কাশ্মীর আসেন ও ৬৩৩ এপ্রিল পর্যন্ত পুরো দুবছর সেখানে অধ্যয়ন করে কাটান। এরপর আবার যাত্রা শুরু করেন। চীনাপাতিতে পৌঁছে বিশিষ্ট পন্ডিত বিনীতপ্রভের কাছে ১৪ মাস থেকে অধ্যয়ন করেন। তারপর জালন্ধরে আচার্য চন্দ্রবর্মার কাছে

চারমাস অধ্যয়নের জন্য থাকেন। এরপর শ্রুঘ্ন রাজ্যেও তিনি আচার্য জয়গুপ্তের কাছে ছয় মাস কাটান। তারপর মতিপুর এসেও তিনি গুণপ্রভের শিষ্য মিত্রসেনের কাছে ছয় মাস অধ্যয়নের জন্য থাকেন। ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনৌজ আসেন। ৬৩৭-এ মগধে ও নালন্দা মহাবিহারে।

৬৩৯-এ তিনি আবার ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। এবার যান একে একে (৪৪) হিরণ্য পর্বত (৪৫) চম্পা (৪৬) কজুঘীরা (৪৭) পুন্ড্রবর্ধন।

এর মধ্যে হিরণ্য পর্বত রাজ্যে তথাগত গুপ্ত ও ক্ষান্তি সিংহের কাছে এক বছর অধ্যয়ন করে কাটান।

মূল বইতে (৪৭) পুন্ড্রবর্ধনের পর (৪৮) কামরূপ (৪৯) সমতট (৫০) তাম্রলিপ্ত (৫১) কর্ণসুবর্ণ-এর বিবরণ রয়েছে। কিন্তু জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি কামরূপ অনেক পরে গিয়েছিলেন। সেখানে এই সময়কার ভ্রমণ পথ রয়েছে।

(৪৭) পুন্ড্রবর্ধন—(৫১) কর্ণসুবর্ণ—(৪৯) সমতট—(৫০) তাম্রলিপ্ত। এই পথই ঠিক বলে মনে হয়।

এরপর তিনি যান (৫২) উড্র (৫৩) কঙ্গোদ (৫৪) কলিঙ্গ (৫৫) কোশল (৫৬) অন্ধ্র (৫৭) ধনকন্টক (৫৮) চোল (৫৯) দ্রাবিড়।

হিউয়েন (৬১) সিংহলে যাবার জন্য এপথ ধরে এগিয়ে চলছিলেন। কিন্তু দ্রাবিড়ের রাজধানী কাঞ্চীপুরে দুজন সিংহলীয় শ্রমণের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তাদের কাছে জনতে পেলেন যে সিংহলের রাজা মারা গেছেন রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও বিশৃঙ্খলা চলছে। এজন্য তারা ৩০০ জনের মতো ভিক্ষু এদেশে চলে এসেছেন। শুনে তিনি সেখানে যাবার বাসনা ত্যাগ করলেন। (৬০) মালকূট বা মহীশূর অঞ্চল দেখে ফিরে এলেন দ্রাবিড়ে। সেখান থেকে সিংহলী শ্রমণদের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন। গেলেন একে একে (৬২) কঙ্কণপুর (৬৩) মহারাষ্ট্র (৬৪) ভরুকচ্ছ (৬৫) মালব (৬৬) অটলি (৬৭) কচ্ছ (৬৮) বল্লভী (৬৯) আনন্দপুর (৭০) সুরাষ্ট্র (৭১) গুর্জর (৭২) উজ্জয়নী। (৭৩) চি-কি তো (৭৪) মহেশ্বরপুর।

এর পরের ভ্রমণ পথটি মূল বইতে এক রকম পাওয়া যায়, জীবনীতে অন্যরকম।

মূল বই মতো হিউয়েন (৭৪) মহেশ্বরপুর থেকে (৭১) গুর্জর ফিরে আসেন। সেখান থেকে (৭৫) সিন্ধু (৭৬) মূলস্থান (৭৭) পর্বত (৭৮) অন্তনবকেল (৭৯) লঙলা হয়ে পারস্য যান। পারস্য থেকে আবার ফিরে আসেন (৭৮) অত্যনবকেল, সেখান থেকে যান (৮০) পীতশিলা ও (৮১) অবন্ড।

জীবনী অনুসারে তিনি (৭৪) মহেশ্বরপুর থেকে (৭০) সুরাষ্ট্র ফিরে আসেন।

সেখান থেকে (৭৮) অন্তনবকেল ও (৭৯) লঙ্গলা হয়ে পারস্য যান। পারস্য থেকে ফিরে আসেন আবার (৭৯) লঙ্গলা। সেখান থেকে যান একে একে (৮০) পীতশিলা (৮১) অবন্ড (৭৫) সিন্ধু (৭৬) মুলস্থান (৭৭) পর্বত।

জীবনী মতো এরপর হিউয়েন দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ ধরে (জুলিয়েনের পাঠ মতো উত্তর পূব) মগধ ফিরে আসেন।

আগেও এ সময় মগধ থাকা কালে তিনি দু-দুবার যষ্ঠীবনের বিশিষ্ট পণ্ডিত জয় সেনের কাছেও অধ্যয়ন করেন। এছাড়া অধ্যয়ন করেন নালন্দায় আচার্য শীলভদ্রের কাছে।

এরপর ৬৪৩ খ্রী. আরম্ভে কুমার রাজা বা কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের আমন্ত্রণে (৪৮) কামরূপ যান। সেখান থেকে ভাস্করবর্মণের সঙ্গে (৪৬) কজূঘীরা যান রাজা হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের সঙ্গে দেখা করার জন্য। সেখান থেকে তাদের সঙ্গে এলেন (২৮) কনৌজ, ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে। পরপর শীলাদিত্যের অনুরোধে তিনি (৩১) প্রয়াগ যান তার মহামোক্ষ পরিষদে যোগ দিতে। এখান থেকে তিনি স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে (৩১) প্রয়াগ থেকে এলেন (৩২) কৌশাম্বী। সেখান থেকে নানা রাজ্য (২৬) বীরসান এলেন। সেখান থেকে রাজা উধীতের রাজ্যে (১৪) জালন্ধরে। এলেন সেখান থেকে (৭) সিংহপুর। সিংহপুর থেকে গেলেন (৬) তক্ষশিলা। সেখান থেকে (১) গান্ধার ও (৪) লম্পক। তারপর লম্পক থেকে গেলেন (৮২) ফ-ল-ন বা বরণ। এখান থেকে তিনি ভারত সীমানা ত্যাগ করলেন। ৬৪৫ খ্রী. চীনের পশ্চিম রাজধানী শিঙ-ফুতে এসে পেঁছিলেন।

এক :

ইতিহাস পড়লে জানা যায়, তিয়েন-চু বা ভারতের অনেক নাম। এ সব নাম কোথা থেকে কীভাবে এসেছে তা নিয়েও মাথা গুলিয়ে দেবার মত নানা মুনির নানা মত রয়েছে। পুরাকাল থেকেই একে সিন-তু (সিন্ধু) ও হিয়েন-তু (হিন্দু) বলা হত। ঠিক উচ্চারণ মতো এখন একে ইন-তু (ইন্দু) বলা হয়। চীনা ভাষায় এর অর্থ হল—চাঁদ। চাঁদের অনেক নামের মধ্যে 'ইন-তু' (বা ইন্দু) একটি। ইন-তুর বিভিন্ন অঞ্চলকে তার লোকেরা রাজ্য-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছে। এই সব (রাজ্য বা) দেশের আচার-প্রথার মধ্যে নানান বৈচিত্র্য রয়েছে। ঠিক ঠিক উচ্চারণ মেনে নিয়ে আমরা পুরো দেশটিকে ইন-তু বলব।

ইন-তুর পরিবারেরা বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণেরা তাদের শুদ্ধতা ও মহত্ত্বের জন্য বিদিত। পরম্পরা এদের যে রকম পবিত্ররূপে চিত্রিত করেছে তাতে আমরা যে

ভুল করে অন্য দেশে এসে পড়েছি এরকম মনে করার কোন কারণই নেই। (বিদেশী) লোকেরা ইন-তু কে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের দেশ বলে।

দুই :

যে দেশগুচ্ছকে ইন-তু বা ভারত বলা হয় তাদের সাধারণত পঞ্চ-সিন্ধু (Five Indies) নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এর আয়তন প্রায় নব্বুই হাজার লি। তিনটি দিকই সাগরে ঘেরা। উত্তর বা পিছনের দিকটিতে তুষারের টোপর পরা পর্বতমালার পাঁচিল। উত্তর দিকটি চওড়া আর দক্ষিণ দিকটি সরু হবার দরুণ আকৃতি আধফালি চাঁদের মতো। পুরো ভূ-ভাগ কিছু কম-বেশি সত্তরটি দেশে বিভক্ত। আবহাওয়া উষ্ণ, ভূমি সুজলা ও ভিজেল। উত্তর ভাগে সারি সারি পাহাড়ের পর পাহাড়, পর্বতের পর পর্বত। জমি শুকনো ও নোনা। পূর্বদিকে রয়েছে উপত্যকা আর সমতলভূমি। অজস্র নদীনালার জন্য সুজলা-সুফলা। দক্ষিন অঞ্চল অরণ্য আর ওষধি গাছে ভরা। পশ্চিম ভাগ পাথুরে ও ঊষর।

তিন :

পরিমাপের কথা তুললে সবার আগে মনে জাগে যোজনের কথা। অতি পুরাকালের রাজা-রাজড়াদের আমলে সৈন্যবাহিনীর একদিনের পথকে যোজন বলা হত। পুরোনো নথিতে একে ৪০ লি-র সমান বলা হয়েছে। ভারতের চলতি গণনা মতো ৩০ লি-র সমান। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম বইয়ে এর দৈর্ঘ্য মাত্র ১৬ লি-র সমান বলা হয়েছে।

ছোট বিভাগের বেলা এক যোজন আট ক্রোশের সমান। গরুর ডাক যতখানি দূর পর্যন্ত শোনা যায় সেই দূরত্বকে সাধারণতঃ ক্রোশ বলা হয়। ক্রোশ আবার ৫০০ ধনুতে বিভক্ত। এক ধনু চার হাতের সমান। হাতকে ভাগ করা হয়েছে চব্বিশ আঙুলে। এক আঙ্গুল ৭ যবের সমান। যবকে আবার উকা বা উকুনে, উকুনকে লিখ্যাতে, লিখ্যাকে রজ, গরুর লোম, ভেড়ার লোম, ঘোটকীর কেশ, তাম্রপাত্রের ছিদ্র। আর এই ভাবে ভাগ করতে করতে সপ্তম ধাপে এসে পেঁছেছে ধূলিকণায়। ধূলিকণাকে আবার ভাগ করতে করতে সপ্তম ধাপে নিয়ে আসা হয়েছে অণুতে। অণুকে আর ভাগ করা সাধ্যের বাইরে। ভাগ কবতে গেলেই শূন্যতায় মিলিয়ে যাবে। তাই অণুর ছোটকে পরমাণু আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

চার :

আহ্নিক ও বার্ষিক গতির নিয়ম, রবি ও চন্দ্রের বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থানকে যদিও ভারতে অন্য সব নাম দেওয়া হয়েছে তাহলেও তাদের ঋতুগুলি আমাদের সঙ্গে এক। ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান অনুসারে মাসগুলির নামকরণ করা হয়েছে।

সময়ের সব থেকে ছোট বিভাগকে ক্ষণ বলা হয়। ১২০ ক্ষণ এক তৎক্ষণের সমান। ৬০ তৎক্ষণে এক লব। ৩০ লবে এক মুহূর্ত। ৫ মুহূর্তে এক কাল। ৬ কাল (প্রহর) এক অহোরাত্রের সমান। তবে, চলতি হিসাবে অহোরাত্রকে সাধারণতঃ ৮ কালের (প্রহর) সমান ধরা হয়।

অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত কালকে শুক্লপক্ষ আর পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা কালকে কৃষ্ণপক্ষ ধরা হয়। কৃষ্ণপক্ষে কখনো ১৪, কখনো ১৫ দিন ধরা হয়। কেননা, মাস কখনো বা বড়ো কখনো বা ছোট। প্রথমে কৃষ্ণ, পরে শুক্ল—এভাবে দুই পক্ষকে নিয়ে এক মাস ধরা হয়। ছয় মাসে এক অয়ন। সূর্য যখন (কর্কট ক্রান্তির) ভিতর-বৃত্তার্ধে গতি বারে তখন উত্তরায়ণ। যখন বাইরের বৃত্তার্ধে গতি বারে তখন দক্ষিণায়ণ। এ দুই অয়নকাল মিলিয়ে এক বছর।

প্রথম	মাসের	১৬	তারিখ	থেকে	তৃতীয়	মাসের ১৫	তারিখ	অবধি	—ক্রমগ্রীষ্ম
তৃতীয়	মাসের	১৬	,,	,,	পঞ্চম	মাসের ১৫	,,	,,	—গ্রীষ্ম
পঞ্চম	মাসের	১৬	,,	,,	সপ্তম	মাসের ১৫	,,	,,	—ক্রমগ্রীষ্ম
সপ্তম	মাসের	১৬	,,	,,	নবম	মাসের ১৫	,,	,,	—বর্ষা
নবম	মাসের	১৬	,,	,,	একাদশ	মাসের ১৫	,,	,,	—ক্রমশীত
একাদশ	মাসের	১৬	,,	,,	প্রথম	মাসের ১৫	,,	,,	—শীত

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থানুসারে বছর তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম মাসের ১৬ তারিখ থেকে পঞ্চম মাসের ১৫ তারিখ গ্রীষ্মকাল। পঞ্চম মাসের ১৬ তারিখ থেকে নবম মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত বর্ষা। নবম মাসের ১৬ তারিখ থেকে প্রথম মাসের ১৫ তারিখ শীতকাল।

আবার চার ঋতুর বিভাগও আছে। বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত। বসন্ত ঋতুর তিন মাসকে বলা হয়—চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ। এরা প্রথম মাসের ১৬ তারিখ থেকে চতুর্থ মাসের ১৫ তারিখ অবধি। গ্রীষ্ম ঋতুর তিন মাসকে বলা হয়—আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র পাদ। এরা চতুর্থ মাসের ১৬ তারিখ থেকে সপ্তম মাসের ১৫ তারিখ অবধি। শরৎ ঋতুর তিন মাসকে বলা হয়—অশ্বযুজ, কার্তিক ও মার্গশীর মাস। এরা সপ্তম মাসের ১৫ তারিখ থেকে দশম মাসের ১৫ তারিখ অবধি। শীত ঋতুর তিন মাসের নাম—পুষ্য, মঘা ও ফাল্গুন। এরা চীনের দশম মাসের ১৬ তারিখ থেকে প্রথম মাসের ১৫ তারিখ অবধি।

পাঁচ :

শহর ও গ্রামগুলির প্রবেশ দ্বার রয়েছে। যে দেয়াল দিয়ে সেগুলি ঘেরা তা বেশ

চওড়া ও উঁচু। পথ ও অলিগলি এদিক ওদিক পাক খেয়ে এগিয়ে গেছে। বড় রাস্তা আঁকাবাঁকা মোচড় খাওয়া। পথ জুড়ে নোংরা। দু'ধারে থাকা দোকানপাটগুলিতে নামের ফলক। কসাই, জেলে, নর্তকী, জহ্লাদ, ঝাড়ুদার প্রভৃতির বাস শহরের বাইরে। পথ চলার সময় এদের রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে হাঁটতে হয়। তাদের বাড়িঘর নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা ও শহরতলী অঞ্চলে। মাটি নরম ও কাদাটে হওয়ার দরুণ শহরতলির দেয়াল অধিকাংশই ইট বা টালি দিয়ে তৈরী। দেয়ালের লাগোয়া ফটকস্তম্ভ কাঠ বা বাঁশের তৈরী। ঝোলা-বারান্দা ও অলিন্দগুলি কাঠের তৈরী। চুণকাম বা চুণ-বালির প্রলেপ দেওয়া। ছাদ টালি দিয়ে ছাওয়া। এখানকার বিভিন্ন বাড়িঘরের আকৃতি চীনে তৈরী ঘর-বাড়ির মতোই। খড়, গাছের শুকনো পাতা, চালি বা ফলক দিয়ে আচ্ছাদন করা। চুণ অথবা মিশেল-মাটি দিয়ে দেয়ালগুলো ঢাকা। শুদ্ধতার জন্য এর সঙ্গে গোবরও মেশানো হয়। ঋতু অনুসারে আঙিনায় ফুলগাছ লাগায়।

সংঘারামগুলি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে তৈরী। চারকোণে তেতালা মিনার তোলা হয়। কড়ি ও খিলানগুলিকে অতি অটুতার সঙ্গে বিভিন্ন আকারে তৈরী ও খোদাই করা হয়ে থাকে। দরজা, জানালা, নিচু দেয়ালগুলি নানারকম ভাবে চিত্রিত করা হয়। ভিক্ষুদের থাকার ঘরগুলোর ভিতরের দিক অলঙ্কার করা আর বাইরের দিকটা সাধাসিধা। দালানের ঠিক মাঝখানে এক মহাকক্ষ (hall)—বেশ উঁচু আর লম্বা-চওড়া। বাড়িগুলি বিভিন্ন তলবিশিষ্ট, চূড়াগুলি নানান আকারের ও উচ্চতার—এ নিয়ে ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। দরজা পূর্বদিকে। রাজসিংহাসনও পূবমুখী।

ছয় ঃ

বসা ও বিশ্রামের জন্য তারা সকলেই মাদুর ব্যবহার করে। রাজ-পরিবার নামকরা নামকরা লোকেরা ও সহকারী কর্মধ্যক্ষরা নানারকম নক্সাকরা মাদুর ব্যবহার করেন। মাপে সবগুলিই সমান। রাজার আসন বেশ বড় ও উঁচু। মূল্যোবান রত্নাদি দিয়ে সাজানো। একে সিংহ-আসন বা সিংহাসন বলা হয়। এটি অতি চমৎকার ভাবে ঝালর দিয়ে ঘেরা। পা রাখার চৌকিও রত্নখচিত। অভিজাতরা চিত্রিত করা জাঁকালো আসনে বসে নিজেদের অভিরুচি মতো।

সাত ঃ

পরণের পোষাক কেটে ছেঁটে, বিশেষ কোন শ্রী ছাঁদ মতো তৈরী করা হয় না। বেশির ভাগ মানুষই ধবধবে সাদা পোষাক পছন্দ করে। রঙমিশালী বা অলংকার করা পোষাক তেমন পছন্দ করে না। পুরুষেরা তার কোমর ঘিরে কাপড় পরে ও তাকে বগলের নিচ দিয়ে ঘুরিয়ে শরীরকে বেড় দিয়ে ডাইনে তলের দিকে ঝুলিয়ে দেয়।

মেয়েদের পোষাক মাটি পর্যন্ত নেমে আসে। তারা তাদের কাঁধ পুরোপুরি ঢাকা দেয়। মাথার উপর চূড়োর মত করে খোঁপা বাধে ও বাকি চুল আলতো ভাবে ঝুলতে থাকে।

কতক লোক তাদের গোঁফ কামিয়ে ফেলে। আরো নানা অদ্ভুত অদ্ভুত প্রথা রয়েছে। তারা মাথায় উষ্ণীষ পরে থাকে। তাতে ফুলের গুচ্ছ ও রত্নাভরণ থাকে।

তাদের পোষাক আশাক কৌষেয় ও তুলার তৈরী। কৌষেয় বন্য গুটিপোকা থেকে মেলা সুতোয় তৈরী। ক্ষৌম বস্ত্রও রয়েছে তাদের। এগুলি এক ধরণের খড় (মসিনার ছাল) দিয়ে তৈরী। কম্বল দিয়ে তৈরী কাপড়ও আছে। এগুলি ছাগলের মিহি লোম দিয়ে তৈরী। কয়াল দিয়ে তৈরী পরিচ্ছদও আছে। বন্য প্রাণীর লোম দিয়ে এগুলো বানানো। এগুলি বুনোট করতে বেশ পরিশ্রম ও কুশলতার দরকার। এজন্য এ ধরনের বস্ত্র অতি দামী ও উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত।

উত্তর ভারতের আবহাওয়া হিমেল। এই কারণে তারা 'হু' (Hu)-দের মতো ছোট ও আঁটোসাঁটো পোষাক পরে। বিধর্মীরা যে সব পোষাক ও অলংকার পরে তা যেমন বিভিন্ন রকমের, তেমনি আবার মিশেল। কেউ কেউ ময়ূরের পালক পরে। কাউকে কাউকে বা নরমুণ্ডের মালা পরতে দেখা যায়। কেউ কেউ কিছুই একেবারে পরে না, পুরো নগ্ন থাকে (নির্গ্রন্থ)। কেউ আবার পাতা বা বল্কল পরে। অনেকে চুল তুলে ফেলে গোঁফ কামায়। অন্যেরা ঝোপের মত গোঁফদাড়ি রাখে, চুল জট পাকিয়ে মাথার উপর বেঁধে রাখে। পোষাক-পরিচ্ছদও এক রকমের নয়। আর তার রঙ—তা লালই হোক আর সাদাই হোক—সব সময়ে এক প্রকার নয়।

শ্রমণদের তিন রকমের পোষাক। সংঘাটি, সংকক্ষিকা ও নিবাসন। এর ছাঁদ সব জায়গায় এক রকমের নয়। শাখাভেদ অনুসারে ছাঁদের ভেদ দেখা যায়। কারো যদি পট্টি চওড়া, কারো তবে সরু। কেউ যদি খোল চিপা করে তৈরী করছে তবে অন্যে করছে ঢিলা। সংকক্ষিকায় বাঁ-কাঁধ ঢাকা, দু' বগল ঘেরা। বাঁদিক খোলা আর ডানদিক আটকানো ভাবে এটি পরা হয়। ঝুল কোমর ছাড়িয়ে আরো নিচ পর্যন্ত নামানো। নিবাসনে কটিবন্ধ কিংবা রেশমের ঝাপপা ব্যবহারের চল নেই। পরার সময় একে চুনটের মতো ভেঙ্গে ভাঁজ করে কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। পোষাকের রঙ নিয়েও ভেদ রয়েছে। হলদে ও লাল দুই রঙ-ই চালু।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা পোষাক-আশাকের ব্যাপারে বেশ ছিমছাম পরিষ্কার। বেশ ঘরোয়া চালে অনাড়ম্বর ভাবে জীবন কাটায়। রাজা-রাজড়া ও বড় বড় মন্ত্রীরা নানা রকমের ভিন্ন ভিন্ন পোষাক ও আভরণ পরে। সুন্দর ভাবে সাজার জন্য রত্নখচিত

পাগড়ী বা মুকুটে ফুল গোঁজে ; হার অঙ্গদ এইসব পরে। ধনী বণিকদের মধ্যেও অঙ্গদের চল রয়েছে। বেশির ভাগ লোক খালি পায়ে চলে। অল্পকতক চটি ব্যবহার করে। তারা তাদের দাঁত লাল ও কালো রঙে রাঙায়। চুল উপরের দিকে তুলে বাঁধে। কানে ছেঁদা করে। তাদের নাক বেশ টিকালো, চোখ বড় বড়।

আট ঃ

শারীরিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তারা বিশেষ সতর্ক। খেতে বসার আগে প্রত্যেকে হাত মুখ ধুয়ে নেয়, কখনো উচ্ছিষ্ট খায় না, নিজের থালার খাবার অন্যকে খেতে দেয় না। কাঠ ও পাথরের (পাতা ও মাটির ?) পাত্র ব্যবহার করলে [একবার ব্যবহারের পর] তা ফেলে দেওয়া হয়। সোনা, রুপা, তামা বা লোহার বাসন-পত্র প্রত্যেকবারের পর ঘষে মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। খাবার পর একটি দাঁতন দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করে মুখ হাত ধোয়।

তারা খাবার পর মুখ হাত ধোয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে ছোঁয় না। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর জল দিয়ে শরীর পরিষ্কার করে এবং চন্দন অথবা হলুদ মাখে।

রাজা যে সময় স্নান করেন তখন ঢাক বাজানো হয়, বিভিন্ন সঙ্গীত যন্ত্রাদিতে স্তুতি গান করা হয়। পুজো-অর্চনা প্রভৃতি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের আগে স্নান ও আচমন করে নেয়।

নয় ঃ

তাদের বর্ণমালার অক্ষরগুলি ব্রহ্মদেব কল্পিত। আদি থেকে সেই অক্ষরই পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। [স্বর ও ব্যঞ্জন] মিলিয়ে মোট ৪৭টি অক্ষর। উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন মত এগুলিকে সাজিয়ে শব্দ গঠন করা হয়, [বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি জুড়ে] তার বিভিন্ন রূপান্তর ঘটানো হয়। এই বর্ণমালা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন শাখা বিস্তার করেছে। এর ফলে উচ্চারণের কিছু পরিবর্তন ও ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। তবে মূল চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মধ্য-ভারতে এর মূল চরিত্র অবিকৃত থেকে গেছে। এখানে এর উচ্চারণ কোমল ও মার্জিত —ঠিক যেন দেবতার ভাষা। শব্দের উচ্চারণ স্পষ্ট ও নির্ভুল, সব লোকের কাছে আদর্শস্থানীয়। সীমান্তের লোকদের উচ্চারণের মধ্যে কতক বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

ধারাবাহিকভাবে ঘটনাধারা নথিভুক্ত করে রাখার জন্য প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব লোক রয়েছে। এই নথিকে Ni-lo-pi-ch'a বলা হয়। এই নথিতে ভাল-মন্দ সব ঘটনা, দৈব-দুর্বিপাক ও শুভসূচক স্মরণীয় বিবরণ লেখা রয়েছে।

ছোটদের লেখাপড়া শেখানোর প্রথম ধাপ হিসাবে (সিম্ধবস্তু নামে) ১২ অধ্যায়ের একখানি বই পড়ানো হয়। সাত বছরে পা দিলে বা তার পর অতি দরকারী শাস্ত্র হিসাবে পঞ্চ বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার পাঠ আরম্ভ হয়।

এই পঞ্চবিদ্যার প্রথমটি হলো শব্দ বিদ্যা। এই শাস্ত্র ভাষা ও ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে শেখায়।

দ্বিতীয় হলো শিল্পস্থান বিদ্যা। এতে কলা, শিল্প ও জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখান হয়।

তৃতীয়টি চিকিৎসা বিদ্যা। —এতে শরীর রক্ষার বিধি-নিয়ম, তন্ত্র-মন্ত্র, ওষধি গুণ সম্পন্ন পাথর, শল্যবিদ্যা (acupunture), ও ওষধি গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ বিষয়ে শেখানো হয়।

চতুর্থ হলো হেতুবিদ্যা। এতে সত্য-মিথ্যা, ভুল-ঠিক ইত্যাদি যুক্তিসম্মতভাবে নির্ধারণের পদ্ধতি শেখানো হয়।

পঞ্চম হলো অধ্যাত্মবিদ্যা। এতে পঞ্চযান, তাদের কারণ ও পরিণাম এবং তার সূক্ষ্ম প্রভাব বিষয়ে শেখানো হয়।

ব্রাহ্মণরা চারি বেদ অধ্যয়ন করে। এর প্রথমটি আয়ুর্বেদ। এই বাক্যটি সংকলকের বক্তব্য। এতে জীবন রক্ষা ও প্রাকৃতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বিষয় রয়েছে। দ্বিতীয়টি যজুঃর্বেদ। এতে যজ্ঞ ও পূজা-স্তুতির বিষয় রয়েছে। তৃতীয়টি সামবেদ। রীতি-পদ্ধতি, জ্যোতিষ ও রণনীতি বিষয় রয়েছে। চতুর্থটি অথর্ববেদ। এতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, তন্ত্রমন্ত্র ও ওষধি বিষয়ে পাঠ রয়েছে।

বেদ শিক্ষকদের এগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এসবের গূঢ়তত্ত্ব ও সঠিক অর্থ আয়ত্ত করতে হয়। তারপর তারা শিক্ষার্থীদের এসব ব্যাখ্যা করে বোঝান, কঠিন শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করেন। যতদিনে না তাদের শিক্ষা ঠিকভাবে সম্পূর্ণ হয় ততদিন শিক্ষার্থীদের নানাভাবে নিজেদের কাছে আটকে রাখেন। অনেক লোক আছেন যাঁরা প্রাচীন সভ্যতায় গভীরভাবে অভিজ্ঞ। তাঁরা সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে, সরল জীবন ধারার অনুবর্তী হয়ে উন্নত কৃষ্টির সাধনায় মগ্ন থাকেন। এভাবে তারা পার্থিব পরিসরের ঊর্ধ্বে আরোহণ করেন ও জাগতিক ভোগবিলাস তাঁদের কাছে তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত হয়। তাঁদের প্রজ্ঞার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজারা তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। রাজসভায় টেনে আনতে চাইলেও আনতে পারেন না। তাঁদের মনীষার নিকট দেশের প্রধানকেও নতি স্বীকার করতে হয়। জনসাধারণের মুখে মুখে তাঁদের গুণ-গান শোনা যায়, তাঁদের প্রতি অন্তরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদিত হতে দেখা যায়।

এরূপ খ্যাতি ও সম্মানের প্রেরণা থেকেই এখানকার জ্ঞানীগুণীরা অক্লান্তভাবে কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানের সাধনা করে চলেন। যদি তাঁদের প্রচুর ধনসম্পদ থাকে তবু তাঁরা জীবন-নির্বাহের জন্য বিভিন্ন দিকে ঘুরে বেড়ান। তবে এমন লোকও আছেন, যাঁরা জ্ঞানচর্চার মহত্ব মুখে আওড়ালেও সেদিক অবহেলা করে নির্লজ্জের মতো আমোদ-প্রমোদ করে পয়সা ওড়ান। নিজেদের অর্থ ও সামর্থ্য দামী দামী খাবার আর পোষাক-পরিচ্ছদে নিঃশেষ করেন। কোনরকম মহান আদর্শ, ও জ্ঞানের সাধনা না থাকার ফলে শেষপর্যন্ত তাঁরা নিন্দার পাত্র হয়ে পড়েন, দিকে দিকে তাঁদের অখ্যাতি ছড়ায়।

ভগবান বুদ্ধের অনুগামীরা নিজ নিজ স্তর অনুসারে প্রত্যেকেই তাঁর মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। সেই পরম-পুরুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পর বহুকাল অতীত হয়ে গেছে। বর্তমানে তাঁর মতবাদকে অনেক পরিবর্তিত আকারে তুলে ধরা হয় ও বোঝা হয়। ঠিক হোক ভুল হোক, যার যেমন প্রতিভা সেই মতো সে একে বোঝে।

দশ ঃ

তথাগতের অনুগামীদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সব সময় মতবিরোধ লেগে রয়েছে। তাদের বাদ-প্রতিবাদের ঝড় যেন সর্বদা সাগরবুকে উত্তাল তরঙ্গ তুলে চলেছে। প্রত্যেক শাখারই ভিন্ন ভিন্ন প্রবক্তা রয়েছেন এবং নানা পৃথক পৃথক পথ ধরে এক অভিমুখের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে চলেছেন।

বৌদ্ধধর্মীরা মোট ১৩টি শাখায় বিভক্ত। এদের প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে। মহাযান ও হীনযানের প্রবক্তারা আলাদা আলাদা থাকেন। কিছু কিছু আছেন যাঁরা নীরবে ধ্যান ও অনুশীলন করে চলেছেন। যখন যে অবস্থাতে থাকুন না কেন সব সময় তাঁরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাধনায় নিমগ্ন। কতক আবার ঠিক তাদের বিপরীত ভাবে নিজেদের ধ্যানধারণা নিয়ে আকাশ পাতাল তোলপাড় করে ফেরেন।

এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংঘ অনুসারে বিশেষ কতকগুলি নিয়ম-কানুনের অধীন। সে সবের উল্লেখ করে বিবরণকে আর ভারি করব না।

বিনয়-অভিধর্ম ও সূত্র-পিটক তিনটিই সমানভাবে বৌদ্ধ-গ্রন্থ। যিনি এর মধ্যে যেকোন একটি বর্গের বইগুলিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হন তাকে 'কর্মদান'-এর বিধি থেকে রেহাই দেয়া হয়। যিনি দুই বর্গের বই ব্যাখ্যায় সক্ষম তাঁকে এর সঙ্গে উচ্চতর আসনের সামগ্রী দেয়া হয়। যিনি তিন বর্গের বই ব্যাখ্যায় সমর্থ তাঁকে তাঁর দেখাশোনা ও কাজকর্ম করে দেবার জন্য ভৃত্য দেয়া হয়।

যিনি চার বর্গের বই ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দেখাতে পারেন তাঁর পরিচর্যার জন্য একজন 'উপাসক'কে দেয়া হয়। যিনি পাঁচ বর্গের বই ব্যাখ্যা করতে পারেন তিনি হাতিতে চড়ে চলাফেরার সুবিধা লাভ করেন। যিনি ছয় বর্গের বই ব্যাখ্যায় পারদর্শী তিনি ওইসঙ্গে দেহরক্ষীও পান।

যখন কোন ব্যক্তি বিদ্যাবত্তার খ্যাতিতে খুব উচ্চসীমায় পেঁছান তখন তিনি মাঝে মাঝে আলোচনাসভা ডাকেন। যারা এতে ভাগ নেয় তিনি তাদের প্রতিভা বিচার করেন, ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেন, যোগ্যকে প্রশংসা করেন, অযোগ্যকে তিরস্কার করেন। যদি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ মার্জিত ভাষা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, গভীর প্রবেশ ক্ষমতা ও তীব্র যুক্তি তর্কের দ্বারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করতে পারেন তবে তাঁকে মূল্যবান আভরণে সুসজ্জিত হাতির পিঠে চাপিয়ে শোভাযাত্রা করে সংঘারামের তোরণ দ্বারগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদি কেউ বলতে বলতে যুক্তির খেই হারিয়ে ফেলেন, দুর্বল, যুক্তিহীন ভাষা প্রয়োগ করেন, তর্কশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ করেন ও সেই রকম শব্দ প্রয়োগ করেন তবে তার মুখে সাদা রঙ লেপে, গায়ে ধুলো ও ময়লা মাখিয়ে তাকে কোন নির্জন জায়গায় বা কোন খানার মধ্যে ফেলে দিয়ে আসে। এইভাবে সেখানে প্রতিভাবান ও অপদার্থ জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

আমোদ-প্রমোদ, ভোগ-বিলাসকে তারা পার্থিব-জীবন ও জ্ঞান-অন্বেষাকে ধর্মজীবন বলে মনে করে। ধর্মজীবন থেকে পার্থিব জীবনের দিকে ঢলে পড়াকে দোষাবহ বিচার করা হয়। যদি কেউ নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙে, তাকে সকলের সামনে তিরস্কার করে। সামান্য ত্রুটির জন্যও তিরস্কার করা হয় বা সাময়িকভাবে বের করে দেয়া হয়। বড় ত্রুটির জন্য পাকাপাকি ভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

যাদের এভাবে তাড়িয়ে দেয়া হয় তারা অন্য কোথাও গিয়ে থাকার আশ্রয় খোঁজে। অনেক সময় মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে পথে ফেরে। কোন কোন সময়ে তারা পুরোনো বৃত্তি, পূর্ব জীবনে ফিরে যায়।

এগারো :

বর্ণ বিভাগে পরিবারগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম হলো ব্রাহ্মণ বা বিশুদ্ধ আচারের লোক। তারা ধর্ম-আচরণের ব্যাপারে সদা-সতর্ক। শুদ্ধ জীবন যাপন করে ও ত্রুটিহীনভাবে নীতি নিয়ম মেনে চলে।

দ্বিতীয় হলো ক্ষত্রিয় বা শাসক জাতি। যুগ যুগ ধরে তারা শাসকের ভূমিকা পালন করে এসেছে। মানবিকতা ও করুণার নীতি তারা মেনে চলে।

তৃতীয় হলো বৈশ্য। এরা বণিক জাতি। ব্যবসা বাণিজ্য এদের প্রধান কাজ। দেশ ও বিদেশ দুদিক থেকেই তারা লাভ করে।

চতুর্থ হলো শূদ্র। এরা কৃষক শ্রেণী। জমি চাষ-আবাদ করে ফসল ফলানোই এদের প্রধান কাজ।

পবিত্র-অপবিত্র অনুসারে সমাজে প্রত্যেকের স্থান সুনির্দিষ্ট। বিবাহকালে সেই নতুন গড়া সম্পর্ক অনুসারে তাদের মর্যাদার পতন-অভ্যুদয় ঘটে। জ্ঞাতি মধ্যে বিবাহ নিষেধ। কোন স্ত্রীলোক জীবনে একবারের বেশি বিবাহ করতে পারে না।

এছাড়া আরো নানান শ্রেণীর লোক রয়েছে। তারা তাদের নিজ নিজ প্রথা অনুসারে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করে। এদের সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলা বেশ কষ্টকর।

বারো :

রাজ-ধারাবাহিকতা ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যেই সীমিত। অন্যায়ভাবে ও রক্তপাতের দ্বারা এরা নানা সময়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। তবু একটি বিশেষ শ্রেণী বা জাতি হিসাবে তাদের মর্যাদা আছে।

প্রধান যোদ্ধাদের দেশের সব থেকে সাহসী লোকদের মধ্য থেকে বাছা হয়। সন্তানেরা যেহেতু পিতার বৃত্তি অনুসরণ করে তাই তারা খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। তারা বাহিনীবদ্ধ হয়ে রাজপ্রাসাদ ঘিরে বাস করে। কোনরকম অভিযানের বেলা সম্মুখ-বাহিনীরূপে সবার আগে যায়। সেনাদের মধ্যে চারটি বিভাগ রয়েছে ঃ পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী ও হস্তী। হাতিদের মজবুত বর্ম দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। তাদের শুঁড়ে তীক্ষ্ন ফলাকা আটকে দেয়া হয়। সেনা-নায়ক একটি রথে চড়ে সৈন্য পরিচালনা করে। দুজন সারথী ডান ও বাঁ দুদিক থেকে রথ চালায়। চারটি ঘোড়া রথ টানে। সেনাপতি রথের মধ্যখানে থাকে। একদল রক্ষক তাকে ঘিরে থাকে। তারা তার রথের চাকার পাশে পাশে চলে।

প্রতিরোধ করার জন্য অশ্বারোহীর দল সামনের দিকে ছড়িয়ে থাকে। পরাজয় ঘটলে বিভিন্ন আদেশ পালনের জন্য তারা নানা জায়গায় ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। পদাতিকেরা তাদের ক্ষিপ্র গতিবেগের দ্বারা প্রতিরোধকে মজবুত করে তুলতে সাহায্য করে। সাহস ও পরাক্রমের জন্যেই তাদের এ কাজে বাছাই করা হয়েছে। সাধারণতঃ তারা একটি বড় ঢাল ও একটি লম্বা বর্শা নেয়। কখনো কখনো তলোয়ার বা খড়্গ নিয়ে প্রচণ্ড বেগে সামনের দিকে ছুটে চলে। যুদ্ধের সব অস্ত্রই খুব ধারালো ও তীক্ষ্ন। এদের মধ্যে কয়েকটির নাম—বর্শা ও ঢাল, ধনুক ও তীর, তলোয়ার, খড়্গ,

রণ-কুঠার, বল্লম, পরশু, দীর্ঘ-বল্লম ও বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তর-নিক্ষেপ যন্ত্র বা ফিঙা। এগুলি তারা যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করে আসছে।

তেরো ঃ

সাধারণ লোকদের সম্পর্কে এবার কিছু বলা যাক। স্বভাবতঃই এরা হালকা চিত্তের মানুষ। তা হলেও ন্যায়-পরায়ণ ও সম্মানবোধসম্পন্ন। টাকা পয়সার ব্যাপারে ছল-চাতুরীর ধার ধারে না। বিচারের বেলাও বিবেচক। পরলোকের শাস্তিকে তারা ভয় করে ও ইহলোককে লঘু করে দেখে! স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে প্রতারক বা বিশ্বাস-ভঙ্গকারী নয়, কথা দিলে কথা রাখে, কোন রকম শপথ কি অঙ্গীকার করলে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। সরকারী প্রশাসনও যথেষ্ট ন্যায়-পরায়ণ, ব্যবহার যথেষ্ট ভদ্র ও মিষ্টি। অপরাধ ও বিদ্রোহ খুব কম, কখনো-কখনো বিপদজনক হয়ে ওঠে। কেউ আইন ভাঙলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে বিষয়টিকে খুঁটিয়ে বিচার করে তবে অপরাধীকে কারাদন্ড দেয়া হয়। কোনরূপ দৈহিক শাস্তি দেয়া হয় না। অপরাধীকে সোজাসুজি বাঁচতে বা মরতে ছেড়ে দেয়া হয় ও মানুষের মধ্যে ধরা হয় না। যদি নীতি-নিয়ম ভাঙা হয়, যদি কোন লোক স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করে বা জনক-জননীর প্রতি কর্তব্য উপেক্ষা করে তবে তার নাক বা কান বা হাত-পা কেটে দেয়া হয় অথবা দেশ থেকে বার করে দেয়া হয় বা তাকে জনহীন অরণ্যে তাড়িয়ে দেয়া হয়। অন্যান্য ত্রুটির জন্য অল্পসল্প জরিমানা করা হয়। অপরাধমূলক তদন্তের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য লাঠির ব্যবহার করা হয় না। কোন দোষী লোককে প্রশ্ন করার বেলা যদি সে খোলা মনে সব কথার উত্তর দেয় তবে তদনুযায়ী দন্ড লঘু করা হয়। যদি অপরাধী একগুঁয়ের মতো অপরাধ অস্বীকার করে চলে বা দোষ-স্খালনের চেষ্টা করে, তবে সত্য খুঁজে বার করে বিচার নিষ্পত্তির জন্য চার রকমের পরীক্ষার আশ্রয় নেয়। (১) জলের দ্বারা (২) শক্তি প্রয়োগের দ্বারা (৩) পরিমাপের দ্বারা (৪) বিষের দ্বারা।

যখন জলের দ্বারা পরখ হয় তখন অভিযুক্তকে একটি বস্তার মধ্যে ভরা হয়। বস্তাটি একটি পাথরের পাত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তারপর ওই অবস্থায় তাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। যদি সে ডুবে যায় ও পাথরটি ভাসে তবে সাব্যস্ত হয়—সে দোষী। যদি লোকটি ভাসে ও পাথরটি ডুবে যায় তবে সাব্যস্ত হয়—সে নির্দোষ।

যখন শক্তি প্রয়োগের দ্বারা পরখ করা হয় তখন সাহায্য নেয়া হয় আগুনের। তারা একটি লোহার পাত গরম করে ও অভিযুক্তকে তার উপর বসতে বাধ্য করে। তারপর তার পা দুটি তার উপর রাখা হয়। পরে তার হাতের পাতায় এটি রাখা হয়। আবার

জিভ দিয়েও তাকে এটি চাটতে বাধ্য করে। যদি এর ফলে কোথাও কোন পোড়াদাগের সৃষ্টি না হয় তবে প্রমাণ হয়—সে নির্দোষ। যদি পোড়াদাগের সৃষ্টি হয় তাহলে প্রমাণ হয় সে দোষী। যারা দুর্বল ও ভীতু লোক, যাদের সহন ক্ষমতা এ-ধরনের পরখের অন্তরায় তাদের বেলা একটি ফুলের কুঁড়ি নিয়ে তাকে আগুনে ছুঁড়ে দেয়া হয়। যদি আগুনের তাপে এটি ফুলের মতো ফোটে তবে প্রমাণ হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ। যদি কুঁড়িটি পুড়ে যায় তবে সাব্যস্ত হয় যে সে দোষী।

পরিমাপ বা ওজনের দ্বারা পরখ এই রকমের ঃ একজন মানুষ ও একটি পাথরকে সমানভাবে পাল্লায় রাখা হয়। তারপর তুলনামূলক ভাবে কে ভারি আর কে হালকা তাই দেখে দোষী নির্দোষী স্থির হয়। যদি অভিযুক্ত লোকটি নির্দোষ হয় তাহলে তার ওজন পাথরের চেয়ে বেশি হবে। যদি দোষী হয় তবে পাথরটির তুলনায় তার ওজন কম হবে।

বিষের দ্বারা পরখ করা হয় এইভাবে ঃ একটি ভেড়া নিয়ে এসে তার দক্ষিণ উরুতে একটি ক্ষত করা হয়। তারপর অভিযুক্তের খাবার থেকে খানিকটা নিয়ে তাতে সব রকমের বিষ মিশিয়ে তা সেই ক্ষতের মধ্যে ভরে দেয়া হয়। যদি সেই বিষের ক্রিয়ায় প্রাণীটি মারা পড়ে তাহলে প্রমাণ হয় যে মানুষটি দোষী। যদি প্রাণীটি বেঁচে থাকে তবে সাব্যস্ত হয়—মানুষটি নির্দোষ।

চার রকমের এই পরখ-প্রথার দরুণ অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

চৌদ্দ ঃ

প্রকাশ্যভাবে সৌজন্য জানানোর নয়টি রীতি চলিত আছে। (১) নম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার করে অনুরোধ জানানো। (২) সম্মান দেখানোর জন্য মাথা নত করা। (৩) দু'হাত তুলে মাথা নত করে। (৪) দু'হাত যুক্ত করে মাথা নত করা। (৫) হাঁটু মুড়ে ঝুঁকে পড়ে। (৬) ভূমিতে সম্পূর্ণ দেহ প্রসারিত করে। (৭) হাত ও হাঁটু মুড়ে প্রসারিত হয়ে। (৮) পাঁচটি গোলকের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে। (৯) দেহের পাঁচটি ভাগ ভূমিতে প্রসারিত করে।

এই নটি রীতির মধ্যে সব থেকে বেশি সম্মান প্রকাশক হলো ভূমিতে দেহ প্রসারিত করা ও তারপর হাঁটু মুড়ে সেই ব্যক্তির স্তুতি-গান করা। যখন দূর থেকে সম্মান জানানো হয় তখন মাথা নত করাই সাধারণ রীতি। কাছ থেকে জানানোর বেলা পায়ের পাতা চুম্বন ও পায়ের গোছ ঘষে দেয়া।

যখন কোন উচ্চপদস্থ বা বয়স্ক লোকের কাছ থেকে কোন আদেশ গ্রহণ করা হয় তখন আদেশ-গ্রহণকারী পোষাকের প্রান্ত তুলে ও নত হয়ে তা গ্রহণ করে। যারুক

এরূপ সম্মান দেখানো হয়েছে তার উচিত ওই লোকটির মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে স্নেহের নমুনা স্বরূপ কিছু মিষ্ট উপদেশ দিয়ে ভদ্রভাবে কথা বলা।

যখন কোন শ্রমণ বা ধর্মীয় জীবন গ্রহণ করেছেন এমন কোন লোককে এরূপ সম্মান দেখানো হয় তখন সে শুধু মৌখিকভাবে তার শুভ কামনা করে।

তারা শুধু নত হয়েই সম্মান দেখায় না, যে লোক বা বস্তুকে সম্মান দেখাতে হবে তাকে নানাভাবে প্রদক্ষিণ করেও সম্মান দেখিয়ে থাকে। কখনো শুধু একবার প্রদক্ষিণ করে, কখনো বা তিন বার। যদি দীর্ঘ প্রতীক্ষা বা অনেক কাল পুষে রাখা আকাঙ্ক্ষার পর দর্শন পায় ও বিশেষ সম্মান দেখানোর ইচ্ছা বা উচ্ছ্বাস দেখা দেয় তবে মনের সাধ অনুসারে যতবার খুশী প্রদক্ষিণ করে।

পনেরো ঃ

অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা সাধারণতঃ ৭ দিন উপবাস করে। এ সময়ের মধ্যে অনেকই ভাল হয়ে যায়। না হলে তখন ওষুধ খায়। এই সব ওষুধের চরিত্র বিভিন্ন। নামও বিভিন্ন। রোগীর পরীক্ষা এবং তার পদ্ধতি নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

কোন লোক যখন মারা যায় তখন যারা তার শব-সংকারের জন্য একত্র হয় তারা চীৎকার ক'রে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে শোক প্রকাশ করে। কান্নার সময় অনেকে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, চুল এলোমেলো করে, কপাল চাপড়ায়, বুক চাপড়ায়। শোকের পোষাক সম্পর্কে কোন নিয়মকানুন নেই। শোক পালনের সময় সম্বন্ধেও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

মৃতকে অন্তিম-সম্মান প্রদর্শনের তিনটি বিধি চালু রয়েছে। (১) সংকার করা। অর্থাৎ কাঠের চিতা সাজিয়ে তার উপর দেহ রেখে তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা। (২) জলে ছুঁড়ে ফেলে ভাসিয়ে দেয়া। (৩) নির্জনে ফেলে দেয়া। দেহটিকে বন্য জন্তু জানোয়ার থাকা অরণ্য মধ্যে ফেলে দেয়া—পশুদের খাবার জন্য।

রাজা মারা গেলে সবার আগে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা হয়, যাতে সে রাজার সংকার-কার্য পরিচালনা করতে পারে, কোন কাজের পর কোন কাজ করতে হবে তা যাতে ঠিক করে দিতে পারে। জীবিতকালে তারা তাদের শাসককে তার চরিত্রের গুণাবলী অনুসারে উপাধি দেয়। যখন মারা যায় তখন মরণোত্তর কোন উপাধি দেয় না।

কোন বাড়িতে লোক মারা গেলে সেখানে কোনরূপ খাওয়া নিষিদ্ধ। তবে সংকারের পর তারা পুনরায় যথারীতি খায়। কারো মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয় না।

যারা শবানুগমন করে তাদের তারা অশুদ্ধ মনে করে। শবানুগমনকারীরা শহরের বাইরে স্নান করে তবে শহরে প্রবেশ করে।

মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে এমন বৃদ্ধ ও অশক্ত লোক এবং দুরারোগ্য রোগীরা, মৃত্যুর প্রতীক্ষা থেকে মুক্তি পেতে, কিংবা জীবনের দুর্বিপাক বা সাংসারিক ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পেতে অনেক সময় মৃত্যু বরণ করে। সে তখন বিদায় ভোজ খেয়ে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিদায় নেয়। তারা গানবাজনা সহ তাকে গঙ্গার তীরে এনে একটি নৌকার উপর বসিয়ে মাঝ-গঙ্গার বুকে ঠেলে দেয়। সেখানে সে নিজে ডুবে মরে। এভাবে তারা দেবতাদের মধ্যে জন্ম নিতে চায় (অর্থাৎ, স্বর্গে যেতে চায়)। কখনো কখনো এরকম লোককে নদীর কূলে তখনো না-মরা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

ভিক্ষুদের মধ্যে মৃতের জন্য কান্না বা শোক করার নিয়ম নেই। কোন ভিক্ষুর বাবা বা মা মারা গেলে তিনি প্রার্থনা জানান। ওই সময়ে তিনি তাঁর নিকট নিজের ঋণের কথা স্মরণ করেন। অতীতে যেরূপে মমতাভরে তাকে লালন পালন করেছেন সে সব স্মৃতি স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এর ফলে স্বর্গতঃ ব্যক্তির পুণ্যফল বৃদ্ধি পাবে বলে তাঁরা আশা করে থাকেন।

খোলো :

সরকার পরিচালনা হিতকর নীতি-নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য এর কাজকর্ম সরল, সাদাসিধে। পরিবারের নাম-পরিচয় নথিভুক্ত করা হয় না। লোকদের বেগার খাটানোর বা বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে নাম লেখানোর বিধি নেই। রাজ্যের নিজস্ব আয়কে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগ ব্যয় হয় রাজ্যের শাসন পরিচালনা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের জন্য। দ্বিতীয় ভাগ ব্যয় হয় রাজ্যের কর্মচারী ও মন্ত্রীদের দেয় ভাতা মেটাবার জন্য। তৃতীয় ভাগ খরচ হয় রাজ্যের বিশিষ্ট প্রতিভাধর লোকদের পুরস্কারাদি দেবার জন্য। চতুর্থ ভাগ খরচ করা হয় ধর্মীয় সংস্থা সমূহকে দান ও পুণ্যকর্মের জন্য। এর ফলে করের বোঝা খুব অল্প, লোকজনের প্রয়োজনও অল্প। প্রত্যেকের পার্থিব সম্পত্তি নিরাপদ। ভরণ-পোষণের জন্য প্রত্যেকেই চাষ-আবাদ করে। যারা রাজার খাস জমিতে চাষ করে তাদের এক-ষষ্ঠ্যাংশ কর দিতে হয়। বণিকেরা অবাধে জিনিষপত্র নিয়ে আসে ও বিনিময় করে চলে যায়। নদীপথ ও রাস্তার চৌকি সামান্য পথশুল্ক দিলেই খুলে দেয়া হয়। জনহিতকর কাজের জন্য শ্রমের দরকার পড়লে তার জন্য পারিশ্রমিক দেয়া হয়। কাজের অনুপাত অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়া হয়ে থাকে।

সৈন্যেরা সীমান্ত পাহারা দেয়, কোথাও বিদ্রোহ বিশৃংখলা দেখা দিলে তা দমন করতে যায়। রাতে রাজপ্রাসাদ পাহারা দেয়। কাজের গুরুত্ব অনুসারে তাদের ভাতা দেয়া হয়। কিছু নির্দিষ্ট ভাতা বা মাইনে দেবার সর্তে তাদের সাধারণের মধ্য থেকে বেছে নেয়া হয়। শাসনকর্তা, মন্ত্রী, অমাত্য ও কর্মাধ্যক্ষগণকে ভরণপোষণের জন্য জমি দেওয়া হয়।

সতেরো ঃ

মাটি ও জলাবায়ুর প্রভেদের জন্য এদেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও বহু প্রকারের। ফুল, ফল, গাছপালা, লতাপাতা, শাকসবজী বিভিন্ন রকমের ; এবং প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ নাম রয়েছে। যেমন—অমল ফল, আম্র ফল, মধুক ফল, ভদ্র ফল, কপিশ্থ ফল, অমলা ফল, তিন্দুক ফল, উদুম্বর ফল, মোচ ফল, নারিকেল ফল, পনস ফল। সবরকম ফলের নাম করা অসাধ্য, যেগুলি লোকে বেশি পছন্দ করে সেগুলিই শুধু বলা হলো। খেজুর, বাদাম, লকেট ও পার্সিমন অজানা। নাশপাতি, বুনো কুল, পীচ, খোবানি, আঙুর এসব কাশ্মীর থেকে আনা হয় ও অন্যান্য প্রত্যেক জায়গাতেই জন্মাতে দেখা যায়। ডালিম ও মিষ্টি কমলা সবখানেই জন্মায়।

যারা চাষ-আবাদের কাজ করে তারা ঋতু অনুসারে তা করে থাকে। অন্য সময় চুপচাপ বিশ্রাম করে কাটায়। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান ও শস্য জাতীয় ফসলই বেশি। খাবার যোগ্য ওষধি ফল ও তরি-তরকারীর মধ্যে আদা, সরিষা, তরমুজ, কুমড়ো, হিউয়েন-তো ইত্যাদি। পিয়াজ রসুন অল্প হয় ও খুব অল্প লোক এসব খায়। যারা এসব খায় তাদের শহরের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সব থেকে বেশি প্রচলিত খাদ্য হলো দুধ, ঘি, ননী, গুড়, মিছরি, সরিষার তেল এবং শস্য দিয়ে বানানো নানারকমের পিঠে। মাছ, ভেড়ার মাংস, ও নানা জাতের হরিণের মাংস তারা টাটকা অবস্থায় খেয়ে থাকে। কখনো কখনো শুকনো করেও খায়। গরু, গাধা, হাতি, ঘোড়া, শুয়োর, কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে, সিংহ, বানর ও অন্য সবরকম লোমশ জন্তু খাওয়া বারণ। যারা এসব খায় তাদের ঘৃণা ও তিরস্কার করা হয়, সমাজচ্যুত করা হয়। তারা জনবসতির বাইরে বাস করতে বাধ্য হয় ও কদাচিৎ তাদের লোক-সমাজে দেখা যায়।

মদ ও মাদক-জাতীয় পানীয় অনেক রকমের রয়েছে। আঙুরের রস, আখের রস ইত্যাদি ক্ষত্রিয়েরা পানীয় রূপে খেয়ে থাকে। বৈশ্যেরা কড়া মাদক-পানীয় খেতে অভ্যস্ত। শ্রমণ ও ব্রাহ্মণরা আঙুর ও আখ থেকে তৈরী এক রকমের সরবৎ পান করেন। এটি মাতানো মদের মতো নয়।

বর্ণ-সঙ্কর ও নিচ-জন্মের লোকেরাও খাদ্য-পানীয়ের ক্ষেত্রে এ থেকে আলাদা নয়। একমাত্র বাসন-পত্র ব্যবহারের দিকেই যা অন্য। উপাদান ও দাম দুদিক থেকেই এক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত মানের জিনিষপত্রের কোন অভাব নেই। চাটু ও কড়াই থাকলেও, জলের ভাপে ভাত রান্নার পাত্রের ব্যবহার জানে না তারা। মাটির তৈরী নানারকম পাত্র আছে তাদের। দেশী তামায় তৈরী পাত্র কদাচিৎ ব্যবহার করে। নানারকম খাদ্য এক সঙ্গে মেখে একটি পাত্র থেকে তারা তাদের আঙুল দিয়ে খায়। চামচ নেই, কাপও নেই। কোনরকম খাবার কাঠিও নেই। যখন অসুস্থ হয় তখন অবশ্য তারা তামার তৈরী পানীয় পাত্র ব্যবহার করে।

আঠারো ঃ

সোনা, রুপা, দেশী তামা, সাদা জেড, আগ্নেয়-মুক্তা (fire pearls) এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। এছাড়া বিরল রত্নাদি এবং বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন নামের মূল্যবান পাথরও প্রচুর আছে। সাগর বুকের দ্বীপগুলি থেকে এসব সংগ্রহ করা হয়। অন্য পণ্যের সঙ্গে এগুলি তারা বিনিময় করে। সত্যি কথা বলতে কি তারা সবসময়ে ব্যবসায়িক পণ্যের বিনিময় করে থাকে। কারণ তাদের সোনা বা রুপার মুদ্রা নেই। মুক্তা-ঝিনুক কিংবা ক্ষুদে মুক্তাও নেই।

[ভারত ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে পাঠকের মনে একটি সামাগ্রিক ছবি ফুটিয়ে তুলে এবার রাজ্যভিত্তিক বিশদ বর্ণনার দিকে হিউয়েন-সাঙ মন দিয়েছেন। বর্ণনা সুরু করেছেন লান-পো বা লামঘান থেকে। একে ভারতের লোকেরা সেকালে 'লম্পক' বলতেন। এখানে তিনি এসেছিলেন বাল্‌খ-জুমধ-জুঝগান-তালিকান-গচি-বামিয়ান-কপিশার পথ ধরে। চীন থেকে পুরো যাত্রাপথটি জানার আগ্রহ থাকলে যে অধ্যায়ে তাঁর জীবনকথা বলা হয়েছে সেই অধ্যায়টি দেখুন। তারপর তাঁর বিবরণের দিকে মন দিন।]

॥ ১ ॥ লম্পক

কপিশা থেকে পথ চলার পর লম্পকে এসে পেঁছিনো গেল। এ রাজ্যটি আয়তনে এক হাজার লির মতো। উত্তর দিকে তাকালে চোখে পড়বে শুধু তুষার মুকুট পরা বিরাট বিরাট পর্বতের পাঁচিল। অন্য তিন দিকও কালোরঙের পাহাড় দিয়ে ঘেরা। রাজধানীর আয়তন দেখা গেল দশ লির মতো। এখানকার সর্বশেষ রাজবংশ কয়েক শতাব্দী আগে লোপ হয়ে গেছে। তারপর থেকে চলেছে গোষ্ঠী প্রধানদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। সকলেরই নজর কী করে নিজে সকলের উপর উঠবেন। ফলে যা হয় তাই হয়েছে। রাজ্যটি শেষ পর্যন্ত কপিশার অধীনে চলে গেছে।

এ দেশের লোকেরা ধানের চাষে বেশি অভ্যস্ত। আখের বনও দেখলাম প্রচুর আছে। গাছেও প্রচুর ফল হয়, তবে খুব কম ফলই পাকে। আবহাওয়া তেমন ভাল নয়। প্রায়ই জমাট তুষার কণা চারিদিক অন্ধকার করে ফেলে। তবে, তুষারপাত তেমন বেশি নয়।

সাধারণ লোক প্রাচুর্যের মধ্যে রয়েছে। চোখে মুখে তৃপ্তির আভাস। সঙ্গীত চর্চার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখলাম। কিন্তু স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে সুবিধের নয়। বিশ্বাসের অযোগ্য। চুরির স্বভাবও রয়েছে। কী করে অন্যের কাছ থেকে কিছু হাতড়ে নেবে সব সময় সেদিকে নজর। নিজের স্বার্থ সবার আগে, অন্যেরটা বুঝতে রাজী নয়। চেহারার দিক থেকে বেঁটে-খাটো হলে কি হবে, কর্মঠ ও আবেগ প্রবণ। পোষাক-পরিচ্ছদের বেশির ভাগ দেখলাম সাদা কাপড়ে তৈরী। সেগুলি বেশ মানানসই।

দশটির মতো সংঘারাম রয়েছে। কিন্তু সেখানে ভিক্ষুর সংখ্যা কম। বেশির ভাগই মহাযানের অনুগামী। কয়েক কুড়ি দেব-মন্দিরে বিধর্মীদের সংখ্যাও নিতান্ত কম।

॥ ২ ॥ নগরহার

লম্পক থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণ-পূব দিকে এগিয়ে চললাম। এক বিরাট পাহাড় শ্রেণী ডিঙোতে হলো। একটা চওড়া নদীও পার হলাম। এভাবে ১০০লির মতো পথ চলবার পর না-কিত্র-লো-হো বা নগরহার পেঁছিলাম; কিংবা বলতে পার উত্তর ভারত-সীমানায় পা রাখলাম।

এ দেশটি কপিশার অধীন। কোন রাজা বা রাজ্যপাল নেই। সামরিক শাসনকর্তা ও কর্মচারীরা সব কপিশা থেকে আসেন।

পূর্ব-পশ্চিমে নগরহার প্রায় ৬০০লি লম্বা। উত্তর-দক্ষিণে ২৫০ থেকে ২৬০লির মতো। হঠাৎ মাথাচাড়া দেয়া খাড়া পাহাড় ও প্রাকৃতিক সব প্রতিবন্ধ দিয়ে চারিদিক ঘেরা। রাজধানীর আয়তন ২০ লির মতো হবে।

খাদ্যশস্যের বেশ প্রাচুর্য রয়েছে দেখলাম। ফুল আর ফলেও ভরা। আবহাওয়া ভিজে ও উষ্ণ। লোকেরা স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে সরল ও সৎ। বেশ উদ্দীপনা আর সাহসে ভরা। ধন-সম্পদকে তুচ্ছ চোখে দেখে। জ্ঞানের চর্চা করতে ভালবাসে। সবাই বৌদ্ধ ধর্মের অনুগামী। অন্য ধর্মমতে অনুরাগীর সংখ্যা নেই বললেই চলে। অনেকগুলি সংঘারাম রয়েছে। তবে ভিক্ষুদের সংখ্যা সেখানে কম। স্তূপগুলিও দেখলাম পরিত্যক্ত ও ধ্বংসাবশেষে পরিণত। পাঁচটি দেব-মন্দির আছে। সেখানে প্রায় শ' খানেক অনুগামীও চোখে পড়লো।

শহর থেকে তিন লির মতো পূবে যেতে একটি বিরাট স্তূপ দেখতে পেলাম। প্রায় তিনশো ফুট উঁচু। রাজা অশোক এটিকে তৈরী করিয়েছিলেন। অতি সুন্দর করে খোদাই করা ও নানা কারুকার্য করা পাথর দিয়ে এটি চমৎকার ভাবে তৈরী।

এর পশ্চিম দিকে একটি সংঘারাম। কয়েকজন মাত্র ভিক্ষু সেখানে বাস করেন। তার দক্ষিণে একটি ছোট স্তূপ। এ স্তূপটিও রাজা অশোকের তৈরী।

শহরের মধ্যে একটি বিশাল স্তূপের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল। প্রবাদ অনুসারে এখানে নাকি ভগবান বুদ্ধের দন্ত রাখা হয়েছিল। স্তূপটিও নাকি খুব উঁচু আর অতি চমৎকার ছিল। এখন অবশ্য প্রাচীন ভিতটুকুই যা আছে, দন্তও নেই।

এর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ৩০০ ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ। পুরোনো কাহিনী থেকে এর জন্মবৃত্তান্ত কিছু জানা যায় না। তবে, লোকে বলে যে এটি নাকি আকাশ থেকে নেমে এসেছে। কোনরকম মানবিক শিল্পকর্মের চিহ্নবর্ণ এতে না থাকার দরুন এটি স্পষ্টতঃই স্বর্গীয় রচনার নিদর্শন।

নগরের দক্ষিণ পশ্চিমে ১০ লির মতো হাঁটার পর একটি স্তূপ নজরে এলো। ২০ লির মতো যেতে দেখা পেলাম একটি ছোট পর্বত টিলার। এখানে বিরাট মহাকক্ষ-যুক্ত একটি সংঘারাম দেখলাম। পাথরের পর পাথর সাজিয়ে এর বহুতল তোরণ-দ্বারটি তৈরী। এককালে জন-মুখরিত এই সংঘারামটি এখন নির্জন ও পরিত্যক্ত। এর মাঝখানে ২০০ ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ। রাজা অশোক এটি তৈরী করিয়েছিলেন।

এই সংঘারামের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি প্রপাত। পাহাড়ের উঁচু মাথা থেকে প্রবল বেগে জল নিচে আছড়ে পড়ছে। পাহাড়ের ধারগুলি যেন দেয়ালের মত তাকে ঘিরে রেখেছে। এরই পূব দিকের একটি দেয়ালে বিরাট এক গুহা রয়েছে। গুহাটি বেশ গভীর আর চওড়া। এটি গোপাল নাগের আবাস। এর প্রবেশপথ সরু, ভিতর অন্ধকার। খাড়া পাহাড়ের বিভিন্ন দিক থেকে সরু জলস্রোত এই গুহায় নেমে এসেছে। আগের কালে এখানে ভগবান বুদ্ধের শরীর-ছায়া দেখা যেত। একেবারে প্রকৃত চেহারার মতো দীপ্ত ও সকল বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন। আজকাল আর বিশেষ দেখা যায় না। যা দেখা যায় তা হল চেহারার ক্ষীণ-সাদৃশ্য। তবে, যে লোক গভীর প্রত্যয় নিয়ে আন্তরিক প্রার্থনা জানায়, সে দিব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে একে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়—কিন্তু তাও বেশীক্ষণ নয়। গুহার দরজার কাছে দুটি চৌকা পাথর আছে। এর একটিতে সুন্দর ও সুস্পষ্ট চক্রচিহ্ন সহ বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন রয়েছে। এটি থেকে থেকে আলোর দ্যুতি বিকিরণ ক'রে ঝলসিত হয়ে ওঠে।

গুহাটির দুদিকে কয়েকটি পাথরের কক্ষ রয়েছে। বুদ্ধদেবের পবিত্র শিষ্যেরা এখানে ধ্যানে বসতেন।

গুহার উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি স্তূপ। এতে বুদ্ধের চুল ও নখ রাখা আছে।

এর অনতিদূরে আরো একটি স্তূপ। এই স্থানটিতেই বুদ্ধ তথাগত তাঁর সত্য-ধর্মের গূঢ় নীতিগুলি তৈরী করে স্কন্ধ-ধাতু-আয়তন ঘোষণা করেছিলেন।

গুহাটির পশ্চিমে একটি বড় পাথর রয়েছে। বুদ্ধ তাঁর বস্ত্র ধুয়ে এটির উপর মেলে দিয়েছিলেন।

রাজধানী-শহর থেকে দক্ষিণ-পূবে ৩০ লির মতো যেতে দেখা পেলাম হিডড বা হি-লো শহরের। এর আয়তন ৪ থেকে ৫ লি। শহরটি বেশ উঁচুতে গড়ে উঠেছে ও স্বাভাবিক ঢালু অঞ্চলের দ্বারা প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত। এখানে নানা রকমের ফুল ও বন সম্পদ রয়েছে। একাধিক হ্রদও আছে। জল আয়নার মতো স্বচ্ছ। অধিবাসীরা সরল, সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ। এখানে একটি দোতলা তোরণ আছে। বাড়িগুলি চিত্রিত। স্তম্ভগুলি লাল রঙ করা। দোতলায় একটি ছোট স্তূপ রয়েছে। সাতটি মূল্যবান বস্তু দিয়ে এটি তৈরী। এতে বুদ্ধদেবের করোটি রক্ষিত হয়েছে। করোটিটি ১৪ ইঞ্চির মতো গোল। সাদাটে-হলুদ বর্ণ। চুলের ছিদ্রগুলি স্পষ্ট। একটি বহুমূল্য আধারে ক'রে এটিকে স্তূপের মধ্যে রাখা হয়েছে। যে সব লোক ভাগ্য সম্পর্কে পূর্ব-সংকেত লাভে আগ্রহী তারা সুগন্ধি মৃত্তিকার তালের উপর এই করোটির ছাপ নেন। পুণ্যফল অনুসারে ছাপ ওঠে।

এটি ছাড়া আরো একটি স্তূপ আছে। এ স্তূপটিও সাত মূল্যবান বস্তুতে তৈরী। এটিতে বুদ্ধের করোটি আটকে বন্ধ ক'রে রাখা হয়। এটির আকৃতি পদ্ম-পাতার মতো। অন্যটির মতোই এর রঙ। এটিও একটি সীলকরা ও বাঁধা মূল্যবান আধারে ভরে রাখা হয়েছে।

এছাড়া আরো একটি স্তূপ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তথাগতের চোখের মণি। এটি একটি আমের মত বড়, উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। অন্য দুটির মতো একেও একটি মূল্যবান আধারে রাখা হয়েছে।

তথাগতের গেরুয়া রঙ করা সুতি কাপড়ের সংঘাটি পোষাকও এখানে একটি মূল্যবান পেটিকায় রাখা হয়েছে। অনেক পুরানো হয়ে যাওয়ার দরুন এর কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। সাদা লোহার আংটা-ওয়ালা চন্দন কাঠের যষ্টিটিও তাঁর একটি মূল্যবান আধারে রাখা আছে।

কাপিশার রাজা পাঁচজন ব্রাহ্মণের উপর এ-সবের পুজো-অর্চনার ভার দিয়েছেন।

নির্জন সাধনার জন্য অবসর ক'রে নেয়ার উদ্দেশে তারা এ-সব বস্তু দর্শনের জন্য বিশেষ দর্শনী ধার্য করেছেন। যিনি বুদ্ধদেবের করোটি দেখতে চাইবেন তাকে দিতে হবে এক স্বর্ণমুদ্রা। ছাপ নিতে চাইলে দিতে হবে পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা। অন্য সবের জন্যও এরকম বাঁধা দর রয়েছে। যদিও এই দর্শনীর হার খুব বেশি তা সত্ত্বেও দর্শনার্থীর সংখ্যা অনেক।

এই দোতলা তোরণের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি স্তূপ আছে। এটি তেমন উঁচু বা বড় নয়। তবু এর অনেক অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। যদি লোকে একে কেবল একটুখানি আঙুল দিয়ে ছোঁয় এটি ওঠে ও ভিত পর্যন্ত কাঁপতে থাকে এবং ঘণ্টা ও কাঁসর এক লয়ে দুলে উঠে মধুর শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

॥ ৩ ॥ গান্ধার

হিডড থেকে ক্রমশঃ আরো দক্ষিণ-পূব দিকে এগিয়ে চললাম। শুধু পাহাড় আর উপত্যকার চড়াই আর উৎরাই। ৫০০ লির মতো পথ পেরিয়ে আসার পর দেখা পেলাম গান্ধার রাজ্যের।

এ দেশটি পূব-পশ্চিমে ১০০০ লির ও উত্তর-দক্ষিণে ৮০০ লির মতো। এর পূব সীমানা ছুঁয়ে সিন (সিন্ধু) নদী বয়ে চলেছে। রাজধানীর নাম পো-লু-শো-পু-লো বা পুরুষপুর। আয়তন ৪০ লির মতো। এখানকার রাজবংশও লোপ পেয়েছে। এখন কাঁপিশার অধীন। শহর ও গ্রামগুলি প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায়। খুব অল্প লোক এখন বাস করে। শহরের দেয়ালঘেরা অংশটিতে প্রায় এক হাজার পরিবারের বাস। রাজপ্রাসাদও এখানেই অবস্থিত।

দেশটিতে প্রচুর খাদ্যশস্য জন্মায়। নানারকম ফুল আর ফলের দেখা পেলাম। আখও প্রচুর। এ দিয়ে তারা চিনি তৈরী করে। আবহাওয়া উষ্ণ ও ভিজে। বরফ বা তুষারপাত সাধারণতঃ হয় না। লোকেরা কোমল ও ভীরু চরিত্রের। জ্ঞানের চর্চা করতে ভালবাসে। এদের অধিকাংশই বিধর্মী। বৌদ্ধ অল্প কিছু।

প্রাচীন কাল থেকে এ-পর্যন্ত ভারতের এই প্রান্তিক দেশটি বহু শাস্ত্রকারের জন্ম দিয়েছে। নারায়ণ দেব, অসংগ বোধিসত্ত্ব, বসুবন্ধু, বোধিসত্ত্ব ধর্মতাত, মনোহিত, মহানুভব পার্শ্ব সকলেরই জন্ম এখানে। প্রায় এক হাজারের মতো সংঘারাম ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সবগুলিই এখন জনশূন্য অবস্থায় ধ্বংসের মুখে। জঙ্গল আর আগাছায় ভরা। স্তূপগুলির বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। বিধর্মী মন্দিরের সংখ্যা একশোর মতো। আর সবগুলিতেই তাদের নানান সম্প্রদায় বিশৃংখল ভাবে বাস করছে।

পুরোনো শহরের মধ্যে উত্তর-পূব দিকে একটি পুরোনো ভিত দেখা যায়। এখানে আগে বুদ্ধের 'পাত্রের' অমূল্য স্তূপটি ছিল। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর পাত্রটি এদেশে আসে। অনেক শতাব্দী ধরে এখানে সেটি পূজা পায়। তারপর নানা দেশের হাতবদল হয়ে এখন সেটি পারস্যে আছে।

শহরের বাইরে, প্রায় ৮ বা ৯ লি দক্ষিণ-পূবে একশো ফুটের মতো উঁচু একটি অশ্বত্থ গাছ আছে। এর ডালগুলি মোটা, নিচের ছায়া ঘন ও অন্ধকার। আগের চার বুদ্ধ এর নিচে বসে গেছেন। এখন সেখানে সেই চার বুদ্ধের উপবিষ্ট মূর্তি রয়েছে। এর নিচে দক্ষিণমুখী হয়ে বসে শাক্য তথাগত আনন্দকে বলেছিলেন—"পৃথিবী থেকে আমি বিদায় নেবার চারশো বছর পর এখানে কণিষ্ক নামে এক রাজা রাজত্ব করবে। সে এর কাছে, দক্ষিণ দিকে একটি স্তূপ বানাবে ও তাতে আমার অস্থি ও দেহভস্ম রাখবে।"

কণিষ্ক তদানুসারে দক্ষিণদিকে একটি জোড়া-স্তূপ তৈরী করান ও সেখানে বুদ্ধের অস্থি ও দেহভস্ম রাখেন। এই দুটি স্তূপের একটিকে ঘিরে অন্যটি তৈরী। মাঝের স্তূপটি অন্যটি থেকে উঁচু। এই স্তূপ দুটি এখনো বর্তমান।

এই জোড়া-স্তূপের পূবদিকে, সোপান শ্রেণীর দক্ষিণ পাশে দুটি স্তূপ রয়েছে। একটি তিন ফুট, অন্যটি পঁচিশ ফুট উঁচু। এদুটি বড় স্তূপ দুটির (জোড়া-স্তূপ) সমানুপাতিক। বুদ্ধের দুটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি রয়েছে এখানে: একটি চার ফুট ও অন্যটি ছয় ফুট উঁচু। বোধিবৃক্ষের নিচে বুদ্ধ আসন করে বসে আছেন এভাবে মূর্তি দুইটি তৈরী।

সোপানশ্রেণীর দক্ষিণ দিকে বুদ্ধের একটি ১৬ ফুট উঁচু ছবি আঁকা রয়েছে। ছবিটির উপরের ভাগ দুটি দেহ, নিচের ভাগ একটি দেহ।

বড় স্তূপটির দক্ষিন-পশ্চিমে ১০০ পায়ের মত এগিয়ে গেলে বুদ্ধের একটি মূর্তি দেখা যাবে। এটি শ্বেত পাথরে তৈরী ও ১৮ ফুট উঁচু। এটি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থার মূর্তি। উত্তরমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্তূপটির ডাইনে-বাঁয়ে ১০০টির মত ছোট স্তূপ পাশাপাশি একটানা ভাবে রয়েছে এবং এগুলি শিল্প নৈপুণ্যের চূড়ান্ত নিদর্শন।

তথাগতের ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে এই স্তূপটি সাতবার পুড়ে যাবার ও পুনর্নির্মিত হবার পর বৌদ্ধ ধর্ম লোপ পাবে। পুরোনো নথি থেকে জানা যায়, এ পর্যন্ত এটি তিনবার পুড়েছে ও তিনবার পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। আমি যখন

প্রথম এদেশে এলাম ঠিক সে সময়ে একটি অগ্নিকাণ্ডে এর ক্ষতি হয়। পুনরুদ্ধারের কাজ চলেছে, এখনো শেষ হয়নি।

স্তূপটির পশ্চিমে একটি প্রাচীন সংঘারাম আছে। এটিও রাজা কনিষ্কের তৈরী। এর দুটি তোরণ, সংলগ্ন ছাদ, তলাবিশিষ্ট স্তূপ ও ভিতর কক্ষ—সব কিছুই বলে দেয়, এককালে এখানকার বিরাট বিরাট জ্ঞানী পুরুষেরা খ্যাতির উঁচু সোপানে আরোহণ ক'রে ধর্মের রূপ বিন্যাস করেন ও এই সংঘারামটিকে বিখ্যাত করে তুলেন। বর্তমানে এর কিছুটা ভগ্নদশা হলেও স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন বহন করে এটি। অল্প কয়েকজন ভিক্ষু তখন এখানে বাস করছেন। এটির জন্মকাল থেকে এযাবৎ অনেক শাস্ত্রকার এখানে জীবন কাটিয়েছেন, পরম সম্পদ লাভ করে গেছেন। তাদের পবিত্র খ্যাতি এখনো ব্যাপক, তাদের আদর্শ ধর্মপ্রাণ চরিত্র এখনো জীবন্ত।

তৃতীয় মিনারে শ্রদ্ধেয় পার্শ্বিকের কক্ষ। কিন্তু এটি অনেক কাল আগে ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে এখানে তার একটি স্মৃতিফলক বসানো হয়েছে। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। আশি বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মানুগামী হন।

পার্শ্বিক যেখানে থাকতেন তার পূর্বদিকে একটি পুরানো দালান আছে। এখানে বোধিসত্ত্ব বসুবন্ধু 'অভিধর্মকোষ' শাস্ত্র রচনা করেন। শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে লোকেরা এখানে এ সম্পর্কে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করেছেন।

বসুবন্ধুর আবাসের দক্ষিণদিকে পঞ্চাশ পায়ের মতো গেলে একটি দোতালা আবাস রয়েছে। এখানে থেকে শাস্ত্রবিশারদ মনোহির্ত বিভাগ শাস্ত্র রচনা করেন। তিনি বুদ্ধ থেকে দশম শতকের মধ্যকালে জীবিত ছিলেন। যুবাকালে গভীর জ্ঞানচর্চা করে ধর্মানুরাগীদের মধ্যে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বিশেষ প্রতিভাবান ছিলেন। সাধারণ মানুষও এজন্য তাঁকে সম্মান করতেন। এ সময়ে শ্রাবস্তীর রাজা ছিলেন প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য। মনোহির্ত তাঁর কোপে পড়ে অন্যায়ভাবে তর্কযুদ্ধে লাঞ্ছিত হন। লজ্জায় অপমানে তিনি নিজের জিভ কেটে ফেলেন ও এভাবে মারা যান। বসুবন্ধু তাঁর শিষ্য ছিলেন।

কিছুকাল পরে বিক্রমাদিত্য রাজ্য হারালেন। যিনি নতুন সম্রাট হলেন তিনি বিশেষ ভাবে গুণীদের সমাদর করতেন। তিনি জানতেন মনোহির্ত প্রকৃতই একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। শিষ্য বসুবন্ধু আর সহায়তায় মনোহির্তের সুনাম পুনরুদ্ধার করেন।

কনিষ্ক রাজার তৈরী সংঘারামটি থেকে উত্তর-পূবে পঞ্চাশ লি-র মতো গেলে একটি বড় নদী পড়ে। এই নদী পার হয়ে পো-শি-কিএ-লো-ফা-তি বা পুষ্কলাবতী। এর

আয়তন ১৪ বা ১৫ লির মতো। অনেক লোক বাস করে এখানে। এক পরিখা দিয়ে এর তোরণ-দ্বারগুলির একের সঙ্গে অন্যের যোগ রয়েছে।

পশ্চিম তোরণের বাইরে একটি দেবমন্দির আছে। দেবতার বিগ্রহটি বেশ আকর্ষণীয়, প্রায়ই নানা আলৌকিক কাণ্ড ঘটায়।

নগরীর পূব দিকে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ। আগের চার বুদ্ধ এখানে ধর্মপ্রচার করেন। প্রাচীন (বৌদ্ধ) সাধু সন্তদের মধ্যে অনেকে মধ্যভারত থেকে এখানে জ্ঞান প্রচারের জন্য এসেছিলেন। তাদের মধ্যে শাস্ত্রবিশারদ বসুমিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি অভিধর্ম প্রকরণপাদ গ্রন্থখানি এখানে বসে রচনা করেন।

নগরীর উত্তরে ৪ বা ৫ লি গেলে আরেকটি পুরোনো সংঘারাম দেখা যায়। এর মহা কক্ষগুলি এখন নিস্তব্ধ নির্জন হয়ে পড়ে রয়েছে। মাত্র সামান্য কয়েকজন ভিক্ষু এখানে থাকেন। সকলেই হীনযান পন্থী। শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মতাত এখানে তার সংযুক্তাভি-ধর্ম শাস্ত্রগ্রন্থখানি রচনা করেন।

সংঘারামটির পাশে কয়েকশো ফুট উঁচু একটি স্তূপ আছে। রাজা অশোক এটিকে তৈরী করান। কাঠ ও পাথর দিয়ে একে বানানো হয়েছে। কাঠের উপর নানা কারুকাজ, পাথরে নানারকম চিত্র খোদাই। নানান শ্রেণীর শিল্পীরা মিলে এটি বানিয়েছেন।

এখান থেকে পূব দিকে সামান্য একটুখানি যেতে দুটি পাথরের স্তূপ চোখে পড়বে। দুটিই প্রায় ১০০ ফুট উঁচু। একটি ব্রহ্মা ও দ্বিতীয়টি শক্র (ইন্দ্র) দেবের তৈরী। এ দুটি আগে দামী দামী পাথর ও মণি-রত্নভূষিত ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর পর সে সব সাধারণ পাথরে পালটে যায়। এ দুটি এখন ভগ্নদশায় পৌঁছেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ দুটি এখনো যথেষ্ট উঁচু ও জমকালো।

এই স্তূপ দুটি থেকে ৫০ লি মতো উত্তর-পশ্চিমে গেলে আরেকটি স্তূপ। শাক্য তথাগত এখানে যক্ষমাতার হৃদয় পরিবর্তন করে অপরের শিশু বধ করা থেকে তাকে নিবৃত্ত করেন। এই কারণে সাধারণ লোকেরা এখানে সন্তান লাভের জন্য মানত করে।

এখান থেকে পঞ্চাশ লি মতো উত্তর দিকে গেলে আরো একটি স্তূপ। এখানেই সামক বোধিসত্ত্ব বালক কালে অন্ধ পিতামাতাকে লালন-পালন করতেন।

এবার দক্ষিণ-পূব দিকে ২০০ লি মতো পথ চলার পর আমরা পো-লু-শ শহরে পৌঁছলাম। এই শহরের উত্তরে একটি স্তূপ আছে। কতক ব্রাহ্মণকে পিতার অতিকায় হাতিটি দান করে দেবার অপরাধে রাজকুমার সুদানকে এখানে দোষী সাব্যস্ত

করে নির্বাসন দণ্ড দেয়া হয়েছিল। নগর থেকে বেরিয়ে এই স্থানটিতে এসেই তিনি তার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেন। এই স্তূপটি একটি সংঘারাম। পঞ্চাশ জনের মতো ভিক্ষু এখানে থাকেন। সকলেই হীনযানে অনুরক্ত। শাস্ত্রবেত্তা ঈশ্বর এখানে পুরাকালে ও-পি-তো-মো-সিঙ-চিঙ-লুন রচনা করেন।

শহরটির পূব-দিককার ফটকের বাইরে একটি সংঘারাম আছে। এখানেও ৫০ জনের মতো ভিক্ষু থাকেন। এরা সবাই মহাযানপন্থী। রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ আছে এখানে।

পো-লু-শ শহর ছেড়ে ২০ লি মতো উত্তর-পূবে যেতে দন্তলোক পাহাড়ের দেখা পাওয়া গেল। এই পাহাড়টির একটি চূড়ায় রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ আছে। রাজপুত্র সুদান এখানে তাঁর নির্বাসিত জীবন যাপন করে গেছেন। এর কাছে আরেকটি স্তূপ আছে। এখানে সুদান তাঁর পুত্র-কন্যাকে ব্রাহ্মণের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। প্রহার করে ব্রাহ্মণ এখানেই তাদের রক্ত ঝরিয়েছিলেন। এখানকার গাছপালা, ঝোপ জঙ্গল এখনো এজন্য গাঢ় লাল রঙের। দুই পাহাড়ের চূড়ার মাঝে একটি পাথরের কক্ষ আছে। ওই রাজপুত্র ও তার স্ত্রী এখানে সাধনা করতেন।

এই বনের পাশে একটি পাহাড়ী গুহা আছে। এখান থেকে তা বেশি দূরে নয়। আগে এক বৃদ্ধ ঋষি সেখানে বাস করতেন।

পাহাড়ী গুহাটি থেকে একশ লির মতো পথ চলে উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলে প্রথমে একটি ছোট পাহাড় পড়বে। সেটি পার হয়ে গেলে একটি বড় পর্বত। এই পর্বতের দক্ষিণে একটি সংঘারাম আছে। এখানে অল্প কয়েকজন ভিক্ষু থাকেন। সকলেই মহাযানের উপাসক। এর পাশে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ। পুরাকালে এখানে একশৃঙ্গ ঋষি বাস করতেন। বারবণিতার ছলনায় ভুলে তিনি তাঁর ঋষিত্ব হারান। সেই রমণীটি তাঁর কাঁধে চেপে নগরে ঘোরে।

পো-লু-শ নগরী থেকে ৫০ লি মতো উত্তর-পূবে গেলে একটি উঁচু পর্বত। এখানে সবুজ (নীলাভ) পাথরে কাটা ঈশ্বর দেবের স্ত্রীর বিগ্রহ রয়েছে। ইনি ভীমা দেবী (দুর্গার অপর রূপ)। ব্রাহ্মণরা ও অপরাপর নিচ ধর্মের লোকেরা বলে যে এই মূর্তিটি আপনা থেকে এখানে আবির্ভূত হয়েছে। এর নানারকম অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর খ্যাতি রয়েছে। এ জন্য সকলের কাছে সে পূজা পায়। ভারতের প্রত্যেক অঞ্চল থেকে লোকে এখানে পূজা দিতে ও সমৃদ্ধি কামনা করতে আসে। গরিব ধনী সকলেই এখানে ভিড় করে। যারা তাঁর দিব্য দর্শন পেতে চায় তারা পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে সাত দিন উপবাসে কাটালে তিনি তাদের দেখা দেন ও অধিকাংশ মনস্কামনা

প্রবেশ করেন। পর্বতের নিচে মহেশ্বর দেবের মন্দির। যে সব বিধর্মীরা সারাদেহে ভস্ম মাখে, এখানে তারা পূজা দেয়।

ভীমা দেবীর মন্দির থেকে দক্ষিণ-পূবে ১৫০ লি মতো গিয়ে আমরা 'উ-তো-ক্যিয়-হন-ছ' শহর পাই। এ শহরটির আয়তন ২০ লি মতো। এর দক্ষিণ সীমানা দিয়ে সিন্ধু নদ বয়ে চলেছে। অধিবাসীরা বিত্তবান, সমৃদ্ধ। নানা দিক থেকে দামী দামী সব পণ্য সামগ্রী ও নানা জিনিসপত্র এখানে এসে জমা হয়।

এ শহর থেকে ২০ লি মতো উত্তর-পশ্চিমে গেলে আমরা 'পো-তো-তু-লো' বা শলাতুরা শহরে এসে হাজির হই। ব্যাকরণ রচয়িতা পাণিনি ঋষির জন্মস্থান এটি। অসংখ্য শব্দ সংগ্রহ করে বর্ণের উপর তিনি একখানি বই লেখেন। এতে ৩২ মাত্রার ১০০০টি শ্লোক রয়েছে। অক্ষর ও শব্দ সম্বন্ধে তাঁর সময় পর্যন্ত জানা সবকিছু এতে আছে, কোন কিছুই বাদ পড়েনি। রচনা শেষ হলে বইখানি তিনি রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন। রাজা বইখানিকে অতি সমাদর করেন। রাজ্যময় এর ব্যবহার ও শিক্ষাদানের নির্দেশ দেন। তিনি এ কথাও ঘোষণা করেন যে যিনি এ বইখানি সুরু থেকে শেষ অবধি পুরো আয়ত্ত করতে পারবেন তাঁকে এক হাজার স্বর্ণখন্ড দেবেন। সেই থেকে পন্ডিতরা সারা বিশ্বে মঙ্গলের জন্য গুরু-শিষ্য পরম্পরায় নির্ভুলভাবে একে হস্তান্তর করে চলেছেন। এই শহরটির ব্রাহ্মণরা এই কারণে তাদের ব্যাকরণ ও দক্ষতা, প্রতিভা ও স্মরণশক্তির জন্য বিখ্যাত।

শলাতুরা শহরে একটি স্তূপ আছে। একজন অর্হৎ পাণিনির এক শিষ্যকে এখানে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন।

তথাগত নির্বাণ লাভের ৫০০ বছর পর কাশ্মীরে একজন অর্হৎ আসেন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য। ক্রমে সেখান থেকে এখানে এসে তিনি এক ব্রহ্মচারীকে দেখলেন। সে অক্ষর বিষয়ে নির্দেশ দিতে দিতে একটি বালককে পেটাচ্ছিল। অর্হৎ তাই দেখে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেটিকে তুমি মারছ কেন? ব্রাহ্মণ উত্তর দিল—"আমি ওকে শব্দবিদ্যা শেখাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই ও ঠিকমতো এগোতে পারছে না।" অর্হৎ ঈষৎ হাসলেন। ব্রাহ্মণ তা দেখে বললেন, "শ্রমণেরা করুণা ও ভালবাসার অনুগামী, মানুষ ও সকল প্রাণীর প্রতি সাধারণতঃ দয়ালু, তা জানি। কিন্তু আপনি হাসছেন কেন? দয়া করে বলুন।" অর্হৎ উত্তর দিলেন, "সহজ কথাটাও যখন তুমি বুঝলে না তখন সেকথা শুনলে তুমি সহজে বিশ্বাস করতে পারবে না। সকলের শেখার সুবিধার জন্য যিনি শব্দবিদ্যা শাস্ত্র লিখে গেছেন সেই ঋষি পাণিনির নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?" ব্রাহ্মণ বললেন—"এ শহরের অধিবাসীরা সবাই তাঁর শিষ্য, সবাই তাঁর

গুণেমুখ। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি মূর্তিও স্থাপিত হয়েছে এবং তা এখনো বর্তমান আছে।" অর্হৎ বললেন—"এই যে ছেলেটিকে তুমি পড়াচ্ছ সে-ই পাণিনি ঋষি। তিনি তাঁর মানসিক উদ্যম যেহেতু শুধু পার্থিব শাস্ত্র আয়ত্তের জন্য ব্যয় করেছেন তাই সত্য কারণহীণ অপর-ধর্মী শাস্ত্র রচনা করেছেন। তাই তাঁর আত্মা ও জ্ঞান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি তখন থেকে এখন পর্যন্ত জন্মের আবর্তন চক্রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সত্য-ধর্মের প্রভাবে তিনি এবার তোমার পুত্র হয়ে জন্মেছেন। এই কারণেই পার্থিব জ্ঞানের দিকে তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। তুমি তাঁকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে গৃহত্যাগের অনুমতি দাও।"

অর্হৎ এই কথা বলে তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এ দেখে ব্রাহ্মণ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো ও তার মনে বিশ্বাস জন্মালো। শহরে ও তার আশেপাশে সে এ ঘটনা রটনা করলো ও ছেলেকে বুদ্ধের অনুগামী হবার অনুমতি দিল। সে নিজের ধর্মমতের পরিবর্তন করলো। গ্রামের লোকেরাও তার আদর্শ অনুসরণ করে বুদ্ধের উপাসক হলো। এখনও পর্যন্ত তারা তাদের সেই পুরানো জীবিকায় একাগ্র রয়েছে।

৪॥ উ-চাঙ-নঃ উদ্যান

'উ-তো-কিয়-হন-ছ' থেকে উত্তর দিকে পথ চলে ৬০০ লির মতো যাবার পর আমরা 'উ-চাঙ-ন' বা উদ্যান রাজ্যে উপস্থিত হলাম। পথে আমাদের কয়েকটি পর্বত অতিক্রম করতে হল, নদী পার হতে হলো।

উদ্যান রাজ্য আয়তনে ৫০০ লির মতো। পর পর পর্বত আর উপত্যকা যেন হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেছে। উপত্যকা আর জলাভূমি একের পর আর পাল্লা দিয়ে উঁচু মালভূমির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছে। এ রাজ্যে অনেক রকম শস্য বোনা হয়। কিন্তু ফসল তেমন ভাল হয় না। আঙুর প্রচুর, আখ অল্পস্বল্প। মাটির নিচ থেকে সোনা ও লোহা মেলে। 'য়ো-কিন' বা হলুদ নামে এক প্রকার গন্ধসার গাছ চাষের পক্ষে এ অঞ্চলটি খুব উপযোগি। বনাঞ্চল বেশ ঘন, আলো ঢুকতে পায় না। ফল ফলাদি ও ফুল অজস্র। ঠান্ডা আর গরম দুটোই মাননসই, ঝড় ও বৃষ্টি তাদের ঋতু অনুসারে।

এখানকার অধিবাসীরা কোমল ও মেয়েলী ভাবাপন্ন। স্বভাবের দিক থেকে কিছুটা ধূর্ত ও কপট। জ্ঞানের আদর করলেও তা অর্জনের দিকে কোন মনযোগ নেই। ভোজ বাজী, তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগের দিকে তাঁদের বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। তাঁরা সাদা সুতীর কাপড় পরেন—এছাড়া আর কিছু বড়ো পরেন না। ভারতের ভাষা

থেকে এঁদের ভাষা কোন কোন দিকে পৃথক হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে মিল রয়েছে। লেখার বর্ণমালা ও সামাজিক ভদ্রতা প্রকাশের রীতিনীতিও ওই রকম কিছুটা মিশেল ধরনের। এঁরা বুদ্ধের প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণ ও মহাযানপন্থী।

শুভবাস্তু (বর্তমান স্বাত) নদীর দুপারে ১৪০০ মতো পুরোনো সংঘারাম রয়েছে। এখন এগুলি বলতে গেলে প্রায় ধ্বংসের মুখে ও মানব-বর্জিত। আগে এখানে আঠারো হাজারের মতো ভিক্ষু বাস করতেন। তারপর কমতে কমতে এখন নামমাত্র সংখ্যায় ঠেকেছে। সবাই মহাযানের উপাসক। সবাই নির্জন সাধনার বিধি পালন করেন, এ নিয়ে শাস্ত্রবাক্য আওড়াতে ভালোবাসেন, কিন্তু এ সম্পর্কে গভীর কোন অনুভব অনুভূতি নেই। যাঁরা নৈতিক নীতিগুলি মেনে চলেন তাঁরা পবিত্র জীবন যাপন করেন, ভোজবাজী-তন্ত্রমন্ত্র এসব থেকে সচেতনভাবে দূরে থাকেন। বিনয় পিটকের যে সব শাখার সঙ্গে তারা পরিচিত সেগুলি হলো—সর্বাস্তিবাদ, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, মহাসংঘিকা—এই পাঁচটি।

এখানে দশটির মতো দেবমন্দির আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুরা সেখানে থাকে। ভাল শহরের সংখ্যা চার থেকে পাঁচ। রাজারা প্রধানতঃ মুঙ্গলী থেকে রাজ্য শাসন করেন। এ শহরটির আয়তন ১৬ বা ১৭ লির মতো। জনসংখ্যা আয়তনের তুলনায় ঢের বেশি। মুঙ্গলি থেকে ৪-৫ লি পূবে একটি বড় স্তূপ আছে।

মুঙ্গলি শহর থেকে ২৫০ বা ২৬০ লির মতো উত্তর-পূবে গেলে একটি বিরাট পর্বতের চূড়ায় নাগ অপলাল-এর প্রস্রবণে হাজির হই। এটি শুভবাস্তু নদীর উৎস। নদীটি দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বয়ে গেছে। গ্রীষ্ম ও বসন্ত দুটি ঋতুতেই এটি জমে যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তুষার-বাষ্প ভেসে চ'লে মেঘের বুকে মিলিয়ে চলেছে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু রঙীন ছটার সূক্ষ্ম প্রতিফলন।

নাগ অপলালের প্রস্রবণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বা নদী থেকে ৩০ লি মতো উত্তর দিকে একটি বড় পাথরের উপর ভগবান বুদ্ধের পদচিহ্ন রয়েছে। পরবর্তীকালে লোকেরা এখানে একটি পাথরের ঘর তুলেছে। বহু দূর থেকে লোকে এখানে পূজা দিতে আসে।

নদীর স্রোত যে পথ ধরে তলমুখী বয়ে গেছে সেই পথে ৩০ লির মতো এগোলে আমরা সেই পাথরটির কাছে পেঁছাই যেখানে তথাগত তাঁর বসন ধুয়েছিলেন। তাঁর কাষায় বস্ত্রের সুতো এখনো সেখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। পাথরের উপর ঠিক যেন খোদাই হয়ে রয়েছে।

মুঙ্গলি শহর থেকে দক্ষিণ দিকে ৪০০ লির মতো চললে হিল পর্বতের দেখা পাওয়া

যায়। উপত্যকার মধ্য দিয়ে নদীটি বয়ে এসে এখানে পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে ও তারপর আবার পূর্বমুখী বাঁক নিয়ে উপরের দিকে (উৎস অভিমুখে) এগিয়ে গেছে। নদীর দুপারে পাহাড়ের দিক মুখ করে নানারকম ফল ও ফুলের গাছ ছড়িয়ে আছে। যে দিকে চোখ ফেরানো যায় বড়ো বড়ো পাহাড়ের চূড়া আর গভীর গুহা। আর বয়ে চলেছে নদীর স্বচ্ছ স্রোত উপত্যকার বুক চিরে। কানে ভেসে আসে কখনো মানুষের কণ্ঠস্বর, কখনো বা গানের কলি। কোথাও কোথাও লম্বাটে সরু চৌকো বিছানার মতো পাথর নজরে পড়ে। দেখলে মনে হবে যেন মানুষের হাতের কাজ। এগুলি সারি সারি পাহাড়ের উপর থেকে উপত্যকা পর্যন্ত নেমে এসেছে। প্রাচীনকালে তথাগত বুদ্ধ এখানে বাস করেন। এখানেই নীতি বিষয়ক অর্ধ-গাথাটি শুনে তাঁর মনে প্রাণ ত্যাগ করার ইচ্ছা দেখা দেয়।

মুঙ্গলি থেকে ২০০ লির মতো দক্ষিণ দিকে গেলে একটি বিরাট পর্বতের কাছে এসে আমরা পেঁছাই। এখানেই মহাবন সংঘারাম। তথাগত পুরাকালে এখানেই সর্বদত্ত রাজা হয়ে জন্মে বোধিসত্ত্বের জীবন কাটান। শত্রুর কাছ থেকে পালিয়ে নিজের দেশ ছেড়ে তিনি গোপনে এখানে চলে আসেন। এক গরিব ব্রাহ্মণের সঙ্গে এখানে তাঁর দেখা হয়। ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে ভিক্ষা চায়। রাজ্য হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ায় কিছুই তাঁর কাছে দেবার মত ছিল না। তিনি তখন তাঁকে বেঁধে বন্দী করে শত্রু রাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্য ব্রাহ্মণকে বললেন। শত্রু রাজা ব্রাহ্মণকে এজন্য নিশ্চয় পুরস্কার দেবেন। সেই পুরস্কারই হবে ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর নিজস্ব দান।

মহাবন সংঘারাম থেকে উত্তর-পশ্চিম ধরে পাহাড়ের নিচের দিকে ৩০-৪০ লির মতো চললে মো-সু বা মসুর সংঘারাম। এখানে ১০০ ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ আছে।

এর একপাশে বিরাট এক চতুষ্কোণ পাথরের উপর বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন রয়েছে। আর গোড়ায় একটি হলদেটে-সাদা পাথর আছে যা সব সময় তেলতেলে পদার্থে ভেজা।

এই সংঘারাম থেকে ৬০ বা ৭০লি পশ্চিমে গেলে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ দেখা যাবে।

এ জায়গাটি থেকে উত্তর-পশ্চিমে ২০০ লির মতো গেলে আমরা শন-নি-লো-শি বা শনি রাজার উপত্যকায় পেঁছাই। এখানে স-পও-শ-তি বা সর্পৌষধি সংঘারাম বর্তমান। এখানে ৮০ ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ আছে।

এই স্তূপের বেশ কাছাকাছি সুমা নামে একটি বড় স্তূপ আছে।

এই শনি রাজার উপত্যকার উত্তরে একটি খাড়া পাহাড়ের পাশে একটি স্তূপ রয়েছে। অসুখে পড়ে যারা এখানে পুজো দেয় তাদের অনেকেই নিরাময় লাভ করে।

পুরাকালে তথাগত যখন ময়ূরদের রাজা হয়ে জন্ম নেন তখন একবার অনুচরদের নিয়ে তিনি এখানে আসেন। ওই সময়ে তাদের দারুণ জলপিপাসা পায়। সবাই জলের খোঁজ সুরু করে। কিন্তু কোথাও জলের দেখা পাওয়া গেল না। ময়ূর-রাজ তখন নিজের ঠোঁট দিয়ে পাহাড়ের গা ঠোকরালেন। সঙ্গে সঙ্গে জলের ধারা বইতে সুরু করলো। সেই জলধারায় অনুচরদের পিপাসা দূর হলো। এই জলধারা থেকেই এখানে একটি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। অসুখ হলে কেউ যদি এই জল পান করে বা এখানে স্নান করে তবে সে ভালো হয়ে যায়। পাহাড়ের উপরে ময়ূরের পায়ের ছাপ এখনো দেখা যায়।

মুঙ্গলি শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৬০ থেকে ৭০লির মতো গেলে একটি বড় নদী। এর পূর্বদিকে ৬০ ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ। রাজা উত্তর সেন এটি তৈরী করান। পুরাকালে তথাগত যখন মৃত্যুমুখে তখন তিনি সমবেত সবাইকে বলে যান "আমার নির্বাণের পর উদ্যানের রাজা উত্তর সেন আমার দেহাবশেষের একটি ভাগ পাবে।" যখন অন্য রাজারা সকলে তা ভাগ করে নিচ্ছেন এমন সময়ে রাজা উত্তর সেন এসে হাজির হলেন। প্রান্তিক দেশ থেকে এসেছেন বলে কেউ তাঁর দিকে নজর দিল না। তখন দেবতারা বুদ্ধদেবের কথাগুলি ঘোষণা করলেন। রাজাকে দেহাবশেষের ভাগ দেয়া হলো। রাজা তা নিয়ে দেশে ফিরলেন ও তাঁর প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য একটি স্তূপ বানালেন। এই স্তূপের পাশে, নদীর পারে হাতীর মতো আকৃতির একটি বিরাট পাথর আছে। রাজা উত্তর সেন একটি বিরাট সাদা হাতীর পিঠে করে দেহাবশেষ এনেছিলেন। এই জায়গাটিতে পেঁাছে হাতীটি মারা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে পাথরে পরিণত হয়ে যায়।

মুঙ্গলি থেকে ৫০লি মতো পশ্চিমে গিয়ে বড় নদীটি পার হলে এই স্তূপটি দেখা যায়। এটির নাম রোহিতক। স্তূপটি ৫০ ফুটের মতো উঁচু। রাজা অশোকের বানানো।

মুঙ্গলি শহর থেকে ৩০ লির মতো গেলে হো-পু-তো-শি বা অদ্ভুত স্তূপ। এটি ৪০ ফুটের মতো উঁচু।

এর পশ্চিম দিকে বড় নদীটি পার হয়ে ৩০ বা ৪০ লির মতো গেলে আমরা একটি বিহারের দেখা পাই। এখানে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্তি রয়েছে।

অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি থেকে ১৪০ বা ১৫০ লির মতো গেলে লন-পো-লু পর্বত। এই পর্বতে ৩০ লি মতো আয়তনের নাগ-হ্রদ বর্তমান। স্বচ্ছ ঢেউ অপরূপ ব্যঞ্জনায় বয়ে চলেছে। জল আয়নার মতো পরিষ্কার। এই নাগ রাজার মেয়ে এক

শাক্য যুবকের প্রেমে পড়েন ও তাদের বিবাহ হয়। নাগ রাজা প্রদত্ত তরবারি দিয়ে এই শাক্য যুবক উদ্যানের রাজাকে হত্যা করে সেখানে রাজা হন। তারপর তাঁর পুত্র উত্তর সেন সেখানকার রাজা হন। বুদ্ধ এই উত্তর সেনের রাজ্যে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর দেখা না পেয়ে তাঁর মায়ের কাছে বলে যান যে তিনি অল্পকাল মধ্যে কুশীনগরে, শাল বনে দেহত্যাগ করবেন। উত্তর সেন যেন সেখানে গিয়ে তার দেহাবশেষ নিয়ে আসেন।

মুঙ্গলি শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করলাম। প্রথমে একটি পাহাড় ডিঙোতে হলো। তারপর এক উপত্যকার মধ্য দিয়ে পথ চলে আমরা আবার সিন্ধু নদের পারে এসে হাজির হলাম। এ পথও রীতিমতো পাহাড়ী-রাস্তা, যথেষ্ট খাড়া। চারদিকের পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকা কেমন যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, থমথমে। কখনো আমাদের দড়ির সাহায্যে খাত পার হতে হলো, কখনো বা লটকানো শিকলের সাহায্যে। কোথাও আবার মাথা ঢাকা ঝুলন্ত কাঠের সেতু, কোথাও উড়ন্ত। কাঠের সিঁড়িও রয়েছে নীচ থেকে খাড়া বাঁধের উপর ওঠার জন্য। এ ভাবে ১০০ লি পথ ভাঙবার পর হাজির হলাম দরিল নদীর উপত্যকায়। উদ্যানের রাজধানী এক সময়ে এখানে ছিল। প্রচুর সোনা ও সুগন্ধি হলুদ এই অঞ্চলে। এখানে একটি বিরাট সংঘারাম আছে। তার পাশে ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের একটি মূর্তি। এটি কাঠের তৈরী। রঙ—সোনালী,—বেশ ঝকমকে। রীতিমতো অলৌকিক-ক্ষমতা সম্পন্ন। মূর্তিটি একশো ফুটের কাছাকাছি উঁচু হবে। অর্হৎ মধ্যান্তিকের কীর্তি এটি (ইনি আনন্দের শিষ্য)। এই অর্হৎ এক শিল্পীকে তুষিত স্বর্গে জীবন্ত পাঠান যাতে সে মৈত্রেয়কে আপন চোখে দেখে তার সঠিক মূর্তি গড়তে পারেন। এজন্য শিল্পী মোট তিনবার তুষিত স্বর্গে যান। এই মূর্তিটি বানানোর পর থেকে পূর্বদিকে বৌদ্ধ ধর্মের হাওয়া বইতে সুরু করে।

৫॥ পো-লু-লো : বোলর

দরিল থেকে বেরিয়ে, আবার খাড়াই পাহাড় আর উপত্যকা পেরিয়ে এবার আমরা সিন্ধু নদের কূলে এসে পেঁছিলাম। সেখান থেকে উড়াল সেতু আর কাঠ দিয়ে বানানো হাঁটাপথের সাহায্যে নদী ও খাত পেরিয়ে, খাড়াই পাহাড় ভেঙে ৫০০ লির মতো পথ পার হলাম। এরপর দর্শন পেলাম বোলর রাজ্যের।

বোলর রাজ্যটির আয়তন চার হাজার লির কাছাকাছি। তুষার মুকুট পরা বিরাট বিরাট পর্বতের মাঝখানে এই দেশটি। পূর্ব-পশ্চিম দিকে লম্বা, উত্তর-দক্ষিণ দিকে সরু। এখানে গম ও ডালের চাষ হয়। সোনা ও রূপার খনি আছে। যথেষ্ট

সোনা থাকার দরুন দেশটি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ। আবহাওয়া সব সময়ে ঠাণ্ডা। মানুষ জন কড়া ও রুক্ষ মেজাজের। মানবিকতা বা ন্যায়বোধের বেশ অভাব দেখলাম তাদের মধ্যে। ভদ্রতা কাকে বলে জানে না, কখনো তার নাম শুনেছে বলেও যেন মনে হয় না। চেহারাও বেজায় কর্কশ, দেখলে ঘৃণার ভাব জাগে। পরণে সবার পশমের তৈরী পোষাক।

এদের লিপিমালা প্রায় ভারতের মতোই। ভাষা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। এ অঞ্চলে ১০০টির কাছাকাছি সংঘারাম। ভিক্ষু সেখানে হাজার খানেকের মতো। জ্ঞান-চর্চার দিকে তাদের তেমন কোন উৎসাহ নেই। নৈতিক চরিত্রের দিকেও ভ্রূক্ষেপ নেই।

এ দেশ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম 'উ-তো-কিয়া-হন-চ' বা উদখাণ্ড (ওহিন্দ)। দক্ষিণ-দিক দিয়ে সিন্ধু নদ পার হলাম। নদটি এখানে তিন থেকে চার লির মতো চওড়া হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বয়ে চলেছে। জল বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খরবেগে বয়ে চলেছে বলে আয়নার মতো সুস্বচ্ছ। পাশে থাকা গুহা-গহ্বর, ফাঁক-ফোকোরের মধ্যে নানা রকমের বিষাক্ত সাপ ও হিংস্র জন্তু-জানোয়ার রয়েছে। কেউ যদি মূল্যবান জিনিষপত্র বা ধন-রত্নাদি বা দুর্লভ জাতের ফুল বা ফলাদি এবং বিশেষ করে বুদ্ধের দেহাবশেষ নিয়ে এই নদ নৌকায় পার হবার চেষ্টা করে তবে প্রায়ই তার নৌকা ডুবে যায়।

৬ ॥ ত-ছ-শি-লো ঃ তক্ষশীলা

সিন্ধুনদ পার হয়ে আমরা তক্ষশীলায় এলাম। এ রাজ্যটি আয়তনে দু'হাজার লির মতো। রাজধানীর আয়তন প্রায় দশ লি। মূল রাজবংশের চিহ্নবর্ণও নেই। অভিজাতরা এর অধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে চলেছে। আগে এটি কপিশার অধীন হয়ে ছিল। পরে কাশ্মীরের অধীনে এসেছে।

উর্বরাশক্তির জন্য দেশটি বিখ্যাত। প্রচুর ফসল ফলে। নদী আর ঝরণায় দেশটি ভরা। ফুল আর ফলের ফলনও প্রচুর। আবহাওয়া অতি মনোরম। অধিবাসীরা বেশ সজীব ও সাহসী। ত্রিরত্নকে শ্রদ্ধা করে। অনেক সংঘারাম আছে। তবে সেগুলির এখন ভাঙন-দশা, জন-শূন্য অবস্থা। খুব অল্প কতক ভিক্ষু আছেন। সকলেই মহাযান উপাসক।

নাগরাজ এলাপাত্রের সরোবরটি রাজধানী থেকে প্রায় ৭০ লি উত্তর-পশ্চিমে। এটি প্রায় ১০০ পায়ের মতো গোলাকার। জল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, মিঠা। নানা রঙের পদ্ম ফুল ফুটে সরোবরটিকে নয়নহরা করে তুলেছে। বিভিন্ন রঙের হালকা আভা বিকীর্ণ করে প্রাকৃতিক শোভায় মনোমুগ্ধকর পরিবেশ গড়ে তুলেছে। এই নাগ একজন

ভিক্ষু ছিলেন। কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনি একটি ইলাপাত্র গাছ ধ্বংস করেন। এই কারণে এখনো এখানকার লোকেরা বর্ষা বা ভাল আবহাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাতে হলে শ্রমণদের নিয়ে এখানে আসে। অল্পকালের মধ্যেই তাদের অভীষ্ট পূরণ হয়।

নাগহ্রদের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ৩০ লি মতো হাঁটলে দুটি পর্বতের মাঝে থাকা একটি গিরিখাতে এসে হাজির হই। এখানে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ আছে। উঁচু-১০০ ফুটের কাছাকাছি।

স্তূপটির পাশে একটি সংঘারাম ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। অনেক কাল থেকে এটি মানব-বর্জিত, ভিক্ষু-শূন্য।

নগরের উত্তরদিকে ১২ বা ১৩ লি দূরে রাজা অশোকের তৈরী আর একটি স্তূপ আছে।

কাছেই একটি সংঘারাম। এর বাগান ও উঠান জঙ্গলে ভরপুর, কেউ এদিকে যাওয়া-আসা করে না। মাত্র জনকয়েক ভিক্ষু থাকেন। শাস্ত্রবেত্তা কুমারলব্ধ অতীতকালে এখানে থেকে কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ইনি সৌত্রান্তিক শাখার অনুগামী ছিলেন।

নগরের বাইরে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পাহাড়ের ছায়ায় একটি স্তূপ আছে। উঁচু একশো ফুটের কাছাকাছি। বিমাতার মিথ্যা অভিযোগে এখানে (অশোকের পুত্র) কুণালের চোখ উপড়ে নেয়া হয়েছিল। এ স্তূপটিও রাজা অশোকের বানানো।

৭ ॥ সঙ-হ্‌-পু-লো ঃ সিংহপুর

তক্ষশীলা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পর্বতশ্রেণী ও উপত্যকা ভেঙে ৭০০ লির মতো এগিয়ে যাবার পর সিংহপুর রাজ্যের দেখা পেলাম। আয়তনে রাজ্যটি প্রায় ৩৫০০ থেকে ৩৬০০ লি। পশ্চিম সীমানা দিয়ে সিন্ধু নদ বয়ে চলেছে। রাজধানীর আয়তন ১৪ থেকে ১৫ লি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বর্তমান। ছোট-বড় খাড়া পাহাড়-পর্বতে ঘেরা বলে প্রাকৃতিক ভাবে রাজ্যটি সুরক্ষিত। জমিজমা খুব বেশি চাষ-আবাদ হয় না, কিন্তু ফলন যথেষ্ট। আবহাওয়া শীতল। লোকদের প্রকৃতি উগ্র ধরনের, শৌর্য-বীর্যের উপরেই বেশি জোর দেয়। প্রতারণা করার প্রবণতাও খুব। এ রাজ্যের আলাদা কোন রাজা বা শাসক নেই। কাশ্মীরের অধীন রাজ্য। রাজধানীর কাছেই দক্ষিণ দিকে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ আছে। এর কারুকার্য বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাছেই একটি সংঘারাম। এখন আর কোন ভিক্ষু নেই, জনমানব শূন্য।

শহরের দক্ষিণ-পূবে ৪০ বা ৫০ লি দূরে একটি স্তূপ আছে। এটিও রাজা

অশোকের বানানো। প্রায় ২০০ ফুট উঁচু। এখানে দশটি পুকুর রয়েছে। গোপন-ভাবে পরস্পরের সঙ্গে এগুলি যুক্ত। ডান ও বাঁয়ের গোপন সংযোগ-পথগুলি পাথর দিয়ে ঢাকা। পাথরগুলি বিভিন্ন আকারের ও অদ্ভুত ধরনের। পুকুরের জল পরিষ্কার, বুদবুদগুলি সময়ে সময়ে শব্দ তোলে ও আলোড়ন জাগায়। সাপ ও নানারকম মাছ পুকুরের চারপাশে খানা ও ফোকরের মধ্যে বাসা বেঁধেছে ও জলে খেলা করে বেড়ায়। নির্মল জলের বুকে চার রঙের পদ্মফুল উঁকি দিচ্ছে। প্রায় একশো রকমের ফলগাছ পুকুরগুলিকে ঘিরে রয়েছে। জলের বুকে তাদের ছোট বড়ো ছায়া ঝিলমিল করছে। গাছের নিচেও চমৎকার ছায়া। সব মিলিয়ে, ঘুরে বেড়ানোর পক্ষে চমৎকার একটি জায়গা।

এর পাশে একটি সংঘারাম আছে। এখানে অনেককাল ধরে কোন ভিক্ষু নেই। স্তূপের ধার ঘেঁষে যে জায়গাটি রয়েছে সেখানে বিধর্মীদের মূল প্রবক্তা (মহাবীর) তাঁর ধর্মতত্ত্ব লাভ করেন ও প্রথম প্রচার করেন। এ সম্পর্কে এখানে একটি খোদাই লিপি রয়েছে। এই জায়গাটির পাশে একটি দেব মন্দির আছে। এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা কঠোর জীবন যাপন করেন। দিবারাত্রি অবিরাম তাঁরা কঠোর সাধনা করে চলেছেন। তাঁদের প্রবর্তক যে সব অনুশাসন দিয়ে গেছেন তার বেশিরভাগই বুদ্ধ-দেবের ধর্ম-নীতির বই থেকে নেয়া। এরা একটি ভিন্ন গোষ্ঠীর ও তদানুসারে তাদের নীতিসূত্রাদি ধার্য হয়েছে। যারা উঁচু পর্যায়ের তাদের ভিক্ষু বলা হয়, নবীনদের বলা হয় শ্রমণ। জীবন-ধারা ও ক্রিয়া-অনুষ্ঠানাদির দিক থেকে তাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যথেষ্ট সাম্য রয়েছে। কেবল তাদের একটি করে টিকি আছে ও উলঙ্গ থাকে। তাছাড়া যে কাপড় তারা কখনো সখনো পরে তার রঙ সাদা। এই সামান্য পার্থক্য অন্যদের সঙ্গে তাদের ভিন্নতা প্রকাশ করে। তাদের পবিত্র প্রবর্তকের আকৃতিকে তারা নিঃশব্দে তথাগতের সঙ্গে সমান করে থাকে। একমাত্র কাপড়ের দিক থেকেই যা একটু পৃথক। কিন্তু সৌন্দর্যের দিক থেকে পুরোপুরি এক।

এখান থেকে তক্ষশীলার উত্তর সীমান্তের দিকে ফেরা গেল। সিন্ধু নদ পার হয়ে দক্ষিণ-পূর্বদিকে ২০০ লির মতো যাবার পর একটি বিরাট পাথরের ফটকের কাছে হাজির হলাম। আগের কালে রাজা মহাসত্ত্ব এখানে এক ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাইয়ে ছিলেন। ফটকের দক্ষিণে ৪০ বা ৫০ পা এগোলে একটি পাথরের স্তূপ নজরে পড়বে। এখানেই মহাসত্ত্ব ওই পশুটিকে মৃতপ্রায় দেখতে পেয়ে করুণাবিষ্ট হয়ে একটি বাঁশের ফলাকা দিয়ে নিজেকে বিদ্ধ করে তাকে আপন রক্ত পান করান। এর ফলে প্রাণীটি তার জীবন ফিরে পেল। এজন্য আজো এখানকার মাটি ও গাছপালা রক্ত-বর্ণে

রঞ্জিত। মাটি খ‍ঁুড়লে বিন্ধ করবার ফলাকার মতো জিনিস সব পাওয়া যায়। এসব গল্প আমরা বিশ্বাস করি কি করি না এ প্রশ্ন না তুলেও বলা যেতে পারে যে ঘটনাটি করুণাকর মনের পরিচায়ক।

এই দেহ-উৎসর্গের স্থানটি থেকে উত্তর দিকে ২০০ ফুটের মতো উঁচু একটি পাথরের স্তূপ আছে। রাজা অশোক এটি বানান। এটি উচ্চ সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করে ও নানা ভাস্কর্যমণ্ডিত। এখানে প্রায় একশোটির মতো ছোট স্তূপ আছে। সেখানকার মূর্তিগুলি বেদীসহ অপসারণযোগ্য ভাবে তৈরী।

এই স্তূপটির পূবে একটি সংঘারাম আছে। এখানে প্রায় ১০০ জন ভিক্ষু থাকেন। সকলেই মহাযানের চর্চা করে চলেছেন।

এখান থেকে পূবে পঞ্চাশ লি মতো গেলে আমরা একটি নির্জন পাহাড়ে এসে পেঁছাই। এখানেও একটি সংঘারাম আছে। একশোজনের মতো ভিক্ষু সেখানে থাকেন। তাঁরাও সবাই মহাযানের উপাসক। এখানে একাধিক প্রস্রবণ ও পুকুর রয়েছে, জল আয়নার মতো স্বচ্ছ। ফল ও ফুল প্রচুর। এই সংঘারামটির পাশে ৩০০ ফুটের কাছাকাছি উঁচু একটি স্তূপ আছে।

৮॥ উ-ল-শি : উরস

সিংহপুর থেকে এবার আমরা দক্ষিণ-পূব দিকে যাত্রা করলাম। পাহাড়মালা ডিঙিয়ে চড়াই ও উৎরাই ভেঙে উ-ল-শি বা উরস রাজ্যে উপস্থিত হলাম।

উরস রাজ্যটি আয়তনে দুহাজার লির কাছাকাছি। পাহাড় ও উপত্যকা যেন একের পর অন্য পর পর সাজানো। চাষ করার মতো জমির পরিমাণ বেশ কম; রাজধানীর আয়তন ৭ থেকে ৮ লি। এখানকার কোন স্থানীয় রাজা নেই। কাশ্মীরের শাসনাধীন। চাষের জমি কম হলেও ফসল ফলানোর উপযোগী। তবে ফল আর ফুল কম জন্মায়। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ ও মনোরম। বরফ বা তুষারপাত খুব কম। লোকদের মধ্যে মার্জিত রুচির অভাব বেশ প্রকট। স্বভাবের দিক থেকে কঠোর ও রুক্ষ। পরকে ঠকানোর অভ্যাস বেশ প্রবল। এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নয়।

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চার থেকে পাঁচ লি মতো গেলে একটি স্তূপের দেখা পাওয়া যায়। উঁচু ২০০ ফুটের মতো। এটি রাজা অশোকের তৈরী। পাশেই একটি সংঘারাম আছে। কিন্তু সেখানে ভিক্ষুর সংখ্যা বেশ কম। তারা সকলেই মহাযানের উপাসক।

৯॥ কিয়-শি-মি-লো : কাশ্মীর

উরস থেকে, দক্ষিণ-পূব দিকে চলে অনেক পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, নানা চড়াই

ভেঙে শিকলের সেতু পেরিয়ে একহাজার লির মতো এগিয়ে গেলাম। পেঁছিলাম কাশ্মীর এসে।

রাজ্যটির আয়তন সাত হাজার লির মতো। সব দিক পর্বত দিয়ে ঘেরা। এই পর্বতগুলি খুবই উঁচু। পর্বতগুলির মধ্য দিয়ে যদিও যাবার পথ রয়েছে কিন্তু সেসব পথ যেমন সরু তেমন আঁকাবাঁকা। এ জন্য যেসব প্রতিবেশী রাজ্য এ দেশ আক্রমণ করে পদানত করার চেষ্টা করেছে তারা কেউ এ যাবৎ সফল হয়নি। রাজ্যের রাজধানী পশ্চিম দিকে গড়ে তোলা হয়েছে ও একটি বড় নদী পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। নগরীটি উত্তর-দক্ষিণে ১২ বা ১৩ লি, পূব-পশ্চিমে ৪ বা ৫ লি।

খাদ্যশস্য ফলানোর দিক থেকে এখানকার জমি বেশ উপযোগী। ফল ও ফুলে দেশটি ভরা। ড্রাগন-হর্স (dragon-horses), সুগন্ধি হলুদ (জাফরান ?), ফো-চী (Fo-Chi) ও নানারকম ওষধি গাছ-গাছড়াও এখানে জন্মায়।

আবহাওয়া শীতল ও রুক্ষ। তুষারপাতের মাত্রা বেশি। বাতাস বা ঝড়ও খুব কম। লোকেরা চামড়ার আঁটোসাটো জামা ও সাদা কাপড়ে তৈরী পোষাক পরে। তাদের চেহারা পাতলা, স্বভাবের দিক থেকে লঘুচিত্ত, দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির। দেশটি যেহেতু একটি নাগের দ্বারা রক্ষিত তাই এরা এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে সব থেকে বেশি প্রাধান্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে। লোকদের দেখতে বেশ সদাশয় হলেও ধূর্তামির দিকে বিশেষ প্রবণতা রয়েছে। জ্ঞানচর্চার দিকে তাদের বেশ আগ্রহ রয়েছে। ভালো শিক্ষাও লাভ করে। তাদের মধ্যে অন্য-ধর্মী ও বৌদ্ধধর্মী দুই-ই ছড়িয়ে আছে।

এখানে ১০০ টির মতো সংঘারাম ও পাঁচ হাজারের মতো ভিক্ষু আছেন। অশোক রাজার তৈরী চারটি স্তূপ আছে এখানে। এর প্রত্যেকটিতে ২০ আউন্সের মতো তথাগতের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। দেশের ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজ্যটি আগে একটি বিশাল নাগ-হ্রদ ছিল। পুরাকালে বুদ্ধ যখন এক দুষ্ট প্রকৃতির দানবকে বশ করে মধ্য-ভারতে ফিরছিলেন তখন এই দেশের উপর দিয়ে আকাশ পথে যাবার সময়ে আনন্দকে বলেন—"আমার নির্বাণ লাভের পর অর্হৎ মধ্যান্তিক এখানে একটি দেশের দেখা পাবে, তাদের সংযত করবে ও নিজের চেষ্টায় আমার ধর্মবাণী প্রচার করবে।"

বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পঞ্চাশ বছর পর আনন্দের শিষ্য অর্হৎ মধ্যান্তিক ষড় ঐশ্বর্য ও অষ্ট-বিমোক্ষ লাভের পর এই ভবিষ্যতবাণীর কথা শোনেন। তিনি তখন এই রাজ্যের দিকে আসেন ও একটি উঁচু পাহাড়ে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে তিনি তাঁর পরমার্থিক শক্তিবলে হ্রদস্থ নাগকে বিমোহিত করেন। নাগরাজ জানতে চাইলো

তিনি এখানে কী চান। অর্হৎ তাঁর কাছে হ্রদে পা রাখার মতো একটুখানি জায়গা চাইলেন। নাগরাজ জল সরিয়ে নিয়ে তাঁর জন্য একটু জায়গা করে দিল। অর্হৎ তাঁর দৈব ক্ষমতা বলে বিরাট শরীর ধারণ করলেন। তাঁর পা রাখার মত জায়গা করে দিতে গিয়ে নাগরাজকে হ্রদের সব জল সরিয়ে নিতে হলো। নাগরাজ তখন নিজের জন্য অর্হতের কাছে আশ্রয়স্থান প্রার্থনা করলো। অর্হৎ ১০০ লি মতো দূরে একটি ছোট হ্রদে তাকে ও তার বংশধরদের বাস করতে বললেন। নাগরাজ তারপর তার পূজা করতে চাইলেন। কিন্তু নির্বাণ লাভের পূর্বে এরূপ অনুমতি দেয়া সম্ভব নয় বলে মধ্যান্তিক নিজের অক্ষমতার কথা জানালেন। নাগরাজ তখন প্রার্থনা জানাল "তাহলে আমি যেন এই ধর্মমত যতদিন লোপ না পায় ততদিন ৫০০ অর্হৎকে পূজা করতে পারি ও এই ধর্ম লোপ পাবার পর আবার এই হ্রদে ফিরে আসতে পারি।" মধ্যান্তিক তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

আপনার দৈবক্ষমতা বলে এই জমি লাভ করে অর্হৎ মধ্যান্তিক সেখানে পাঁচশটি সংঘারাম স্থাপন করেন। তারপর যাতে ভিক্ষুদের সেবাযত্ন করতে পারে সেজন্য চারপাশের দেশ থেকে কিছু গরীব লোক কিনে আনার ব্যবস্থা করলেন। মধ্যান্তিক মারা যাবার পর এই গরীব লোকেরা প্রতিবেশী দেশগুলির উপর নিজেরা রাজা হয়ে বসলো। চারিদিকের অন্য সব রাজ্যের লোকেরা এদের নিচজাতীয় লোক বলে ঘৃণা করে, এদের সঙ্গে মেলামেশা করে না ও এদের কৃতীয় বলে ডাকে। এই হ্রদটি আবার প্রকটিত হতে আরম্ভ করেছে।

তথাগত নির্বাণ লাভ করার একশো বছর পরে অশোক মগধের রাজা হয়ে পৃথিবীময় তাঁর আধিপত্য বিস্তার করলেন। এমনকি অতি দূরান্তের লোকও তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। তিনি ত্রি-রত্নকে গভীর ভাবে সম্মান করতেন। এছাড়া সকল জীবন্ত প্রাণীর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি এখানে অর্হৎদের জন্য ৫০০ টি সংঘারাম বানান ও এদেশটি ভিক্ষুদের জন্য দান করেন।

তথাগত নির্বাণ লাভের চারশো বছর পর গান্ধাররাজ কনিষ্ক অতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। একেবারে প্রান্তিক প্রদেশগুলিকেও তিনি তাঁর অধীনে আনেন। রাজকার্যের ফাঁকে তিনি প্রায়ই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি নিয়ে আলোচনা করতেন। ধর্ম ব্যাখ্যানের জন্য ভিক্ষুদের নিজ প্রাসাদে ডাকতেন। কিন্তু (বৌদ্ধ ধর্মানুগামীদের) বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতবাদ মধ্যে বিরোধিতা লক্ষ্য করে তাঁর মনে সংশয় দেখা দেয়। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পথও ছিল না। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় পার্শ্বিক তাঁকে বললেন—"বুদ্ধদেব পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পর বহু কাল অতীত হয়েছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীই তাদের

একাধিক আচার্যের নীতি-নির্দেশের অনুগামী। প্রত্যেকে শুধু নিজ নিজ মতবাদকে আঁকড়ে পড়ে রয়েছে আর এর ফলে ঐক্য বিনষ্ট হয়ে সকলে বহু-বিভক্ত হয়ে পড়েছে।"

রাজা একথা শুনে খুব ব্যথিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর পার্শ্বিকের কাছে বুদ্ধদেবের মতবাদকে অবিকৃতভাবে পরপুরুষের জন্য রেখে যাবার বাসনা থেকে ত্রিপিটককে বিভিন্ন শাখানুসারে সংকলন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পার্শ্বিক রাজার ইচ্ছাকে আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন জানালেন।

রাজা কনিষ্ক তখন কাছের ও দূরের সমস্ত দেশ থেকে (জ্ঞানী ও আচার্যদের) এক পবিত্র সম্মেলন আহ্বান করলেন।

সম্মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে বাছাই করে যারা ত্রি-পিটক ও পঞ্চবিদ্যায় সুপটু এরকম ৪৯৯ জনকে নির্বাচিত করা হল। এর পর এ দেশের হিমেল ও রুক্ষ আবহাওয়ার দরুণ কষ্টভোগ হেতু রাজা নিজের দেশে ফিরে যেতে চাইলেন। তাছাড়া, কাশ্যপ যেখানে ধর্ম-সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন রাজগৃহের সেই পর্বত গুহাটিও তাঁর দেখার ইচ্ছা দেখা দিল। শ্রদ্ধেয় পার্শ্ব ও অন্য সকলে তখন তাঁকে বললেন—"আমাদের সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে অনেক বিধর্মী পণ্ডিত রয়েছে। বিভিন্ন শাস্ত্র পর্যালোচনা করতে গেলে শুধু বাদ-বিবাদ ও বৃথা তর্ক দেখা দেবে। যথেষ্ট সময় নিয়ে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে নতুন গ্রন্থ সংকলিত না হলে তা থেকে কোন্ সুফল বা পাওয়া যাবে? সম্মেলনের সকলেরই এ দেশ পছন্দ। পর্বতমালা দ্বারা দেশটি ভালভাবে সুরক্ষিত। যক্ষেরা এর সীমান্ত রক্ষা করে চলেছে। জমি উর্বরা ও সুফলা আর খাদ্যও বেশ প্রয়োজন মতো রয়েছে। সাধু ও ঋষিরা এখানে সমবেত হন, বাস করেন। দেবর্ষিরাও এখানে বিচরণ ও বিশ্রাম করেন।"

রাজা তখন তাঁর মত পরিবর্তন করলেন।

সম্মেলনের সকলে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন যে তারা রাজার অভিলাষকে বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রস্তুত। রাজা তখন সম্মেলনের স্থান থেকে অর্হৎগণকে নিয়ে আর এক স্থানে গেলেন। সেখানে একটি বিহার স্থাপন করলেন। যাতে সবাই সেখানে সম্মিলিত হয়ে (আলাপ আলোচনা করে) শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলন করতে পারেন ও বিভাষা শাস্ত্র রচনা করতে পারেন সে জন্যই এই ব্যবস্থা।

বসুমিত্রকে সভাপতি করে এই পাঁচশত সাধু ও ঋষি প্রথমে সূত্র পিটক ব্যাখ্যার জন্য এক লক্ষ শ্লোক দিয়ে উপদেশ শাস্ত্র রচনা করলেন। তারপর বিনয় পিটক ব্যাখ্যার জন্য এক লক্ষ শ্লোকে বিনয় বিভাষা শাস্ত্র রচনা করা হলো। পরে অভিধর্ম পিটক ব্যাখ্যার জন্য এক লক্ষ শ্লোকে অভিধর্ম-বিভাষা শাস্ত্র সংকলিত হলো।

কণিষ্ক রাজা এগুলিকে লাল তামার পাতে খোদাই করালেন। তারপর একটি পাথরের কুঠুরীতে সেগুলি রেখে দিয়ে তাকে ঘিরে একটি স্তূপ বানালেন।

এই মহৎ কাজ শেষ হবার পর সৈন্যসহ তিনি রাজধানীতে ফিরে যাবার উদ্যোগ করলেন। পশ্চিমের ফটক দিয়ে এ দেশের বাইরে বেরিয়ে পূবমুখী হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আবার এই পুরো দেশটিকে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দান করলেন।

কণিষ্কের মৃত্যুর পর কৃতীয় জাতীর লোকেরা আবার রাজ্য দখল করলো। ভিক্ষুদের তাড়িয়ে বৌদ্ধধর্মকে উৎখাত করলো।

তুষার দেশের হিমতাল রাজ্যের রাজা শাক্য-বংশীয় ছিলেন। বুদ্ধের নির্বাণের পর ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি তার পূর্ব-পুরুষদের রাজ্য লাভ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের গভীর অনুরাগী ছিলেন। কৃতীয়গণ এদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের উচ্ছেদ করেছে শুনে তিনি ৩০০০ বাছাই যোদ্ধাকে নিয়ে বণিকের ছদ্মবেশে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন ও কৃতীয় রাজাকে হত্যা করে এ দেশ অধিকার করেন। তারপর একটি সংঘারাম তৈরী করে তিনি ভিক্ষুদের ফিরিয়ে আনলেন। আবার আগের মতো তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনিও পশ্চিমের দ্বার দিয়ে এ রাজ্য ত্যাগ করেন ও বাইরে এসে পূবমুখী হয়ে রাজ্যটিকে পুনরায় ভিক্ষুদের জন্য দান করেন।

বার বার ভিক্ষুদের দ্বারা তাদের অধিকার ও ধর্মমত প্রতিহত হবার দরুণ কৃতীয়রা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ ঘৃণা ও বিরূপতা পোষণ করতে সুরু করে। কিছুকাল পরে আবার তারা ক্ষমতায় এলো। এই কারণে এ রাজ্যের লোকেরা বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়। বিধর্মী মন্দিরগুলিই তাদের চিন্তাধারাকে আবিষ্ট করে রেখেছে।

নতুন শহর থেকে দশ লি দক্ষিণ-পূবে, আর পুরানো শহর থেকে উত্তরে, একটি বড় পর্বতের দক্ষিণভাগে একটি সংঘারাম রয়েছে। এখানে তিনশো জনের মতো ভিক্ষু থাকেন। এ স্তূপটিতে বুদ্ধের একটি দাঁত রক্ষিত আছে। এটি লম্বায় প্রায় দেড় ইঞ্চি, রঙ হলদেটে সাদা।

এ সংঘারামটি থেকে ১৪ বা ১৫ লি দূরে, দক্ষিণ দিকে, আরেকটি ছোট সংঘারাম আছে। এখানে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের একটি দাঁড়ানো মূর্তি আছে।

ছোট সংঘারামটি ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূবে ৩০ লি মতো এলে একটি বড় পর্বতের দেখা মেলে। এখানে একটি পুরানো সংঘারাম আছে। এটির গঠন-শৈলী দেখার মতো। বেশ মজবুত করে তৈরী। এখন অবশ্য এটি ভাঙনের মুখে। মাত্র একটি দিক টিকে আছে। এই দিকটিতে একটি ছোট যমজ-তোরণ রয়েছে। এই সংঘারামে ৩০ জনের

মতো ভিক্ষু আছেন। সকলেই মহাযানের অনুগামী। প্রাচীনকালে এখানে বসেই শাস্ত্রকার সংঘভদ্র ন্যায়ানুসার শাস্ত্র রচনা করেন। সংঘারামের ডাইনে ও বাঁয়ে অনেকগুলি স্তূপ দেখা গেল। এখানে মহান অর্হৎদের দেহাবশেষ রাখা আছে।

যে সংঘারামটিতে বুদ্ধের দাঁত রয়েছে সেখান থেকে ১০ লি মতো পূর্বদিকে গেলে উত্তর দিককার একটি গিরিপথের মাঝে একটি ছোট সংঘারাম দেখা যাবে। পুরাকালে বিরাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্কন্ধিল এখানে বিভাষা-প্রকরণপাদ শাস্ত্র লেখেন।

এই সংঘারামটিতে একটি স্তূপ রয়েছে। পঞ্চাশ ফুটের কাছাকাছি উঁচু। এখানে একজন অর্হতের দেহাবশেষ রাখা আছে।

রাজধানী থেকে দুশো লি মতো গেলে মাই-লিন (বিকৃত বন ?) নামে একটি সংঘারামে এসে পৌঁছাই। শাস্ত্রবেত্তা পূর্ণ এখানে থেকে তার বিভাষা সূত্র-টীকা লেখেন।

শহরের পশ্চিমে ১৪০-৫০ লির মতো গেলে একটি বড় নদী পড়বে তার তীরে উত্তর দিকে, একটি পর্বতের ঢালু জায়গায় একটি সংঘারাম আছে। এটি মহা-সংঘিকা গোষ্ঠীর। প্রায় একশো জন ভিক্ষু থাকেন। আগের কালে শাস্ত্রবেত্তা বোধিল এখানে বসে তার 'ৎসিহ-চিন-লুন' (তত্ত্ব-সঞ্চয়-শাস্ত্র ?) রচনা করেন।

॥ ১০ ॥ পুন-নু-ৎসো : পুনাচ বা পুনচ

এবার কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওনা হলাম। কয়েকটি পর্বত ডিঙিয়ে, অনেক খাড়া চড়াই আর ছোট ছোট খাড়া পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে ৭০০ লির মতো পথ চলার পর পুনাচ রাজ্যের দেখা পেলাম।

রাজ্যটি দু-হাজার লির মতো আয়তনের। অনেক পাহাড় আর নদী আছে দেখলাম। তার ফলে চাষ-আবাদ করার মতো জমি খুবই কম। তবে নিয়মিতভাবে এখানে ফসল বোনার কাজ হয়। ফুল আর ফলের পরিমাণ যথেষ্ট। প্রচুর আখ জন্মে। কিন্তু আঙুরের ফলন নেই। অমল, উদুম্বর, মোচ এসব প্রচুর। একেবারে অঢেলভাবে ফলানো হয়। খেতে সুস্বাদু বলে এসব ফলের আবাদ বেশ লাভজনক।

আবহাওয়া উষ্ণ ও ভিজালো। লোকেরা সাহসী। সাধারণতঃ সুতীর পোষাক পরে। স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে সবাই সত্যানুরাগী, ন্যায়বান। তারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুগামী। এখানে পাঁচটি সংঘারাম চোখে পড়লো। তবে বলতে গেলে, সবগুলিই প্রায় জনশূন্য। এখানকার কোন স্বাধীন রাজা নেই, এরা কাশ্মীরের অধীন।

প্রধান শহরের উত্তরদিকে একটি সংঘারাম চোখে পড়লো। সামান্য কয়েকজন ভিক্ষু রয়েছেন দেখলাম। একটি স্তূপও আছে এখানে।

॥ ১১ ॥ হো-লো-শি-পু-লো : রাজপুরী

পুনাচ থেকে এবার দক্ষিণ-পূর্বদিকে পথ ভাঙতে সুরু করলাম। চারশো লির মতো হাঁটার পর রাজপুরীতে এসে পেঁছিলাম।

'হো-লো-শি-পু-লো' বা রাজপুরী রাজ্যটি আয়তনে চার হাজার লির কাছাকাছি। রাজধানীটি দশ লির মতো গোলাকার। অনেক পাহাড়-পর্বত ও নদীর জন্য রাজ্যটি প্রাকৃতিক ভাবেই সুরক্ষিত। কিন্তু পাহাড়ী অঞ্চল বেশি হবার দরুণ আবাদী জমি খুব কম। ফসলের পরিমাণও এই কারণে কম। আবহাওয়া পুনাচ রাজ্যের মতোই। ফল ফলাদিও সব সেখানকার মতো। লোকজন বেশ চটপটে ও ব্যস্তবাগীশ। এ রাজ্যেও কোন স্বাধীন রাজা নেই, রাজ্যটি কাশ্মীরের অধীন।

এখানে দশটির মতো সংঘারাম আছে। ভিক্ষুর সংখ্যা দেখলাম খুব কম। একটি দেবমন্দির রয়েছে। বিপুল সংখ্যক বিধর্মী তার উপাসক।

'লান-পো' বা লমঘান থেকে 'হো-লো-শি-পু-লো' বা রাজপুরী পর্যন্ত লোকজনের চেহারা রুক্ষ, স্বভাব উগ্র এবং কাম ও উত্তেজনা প্রবণ। ভাষা স্থূলরুচির পরিচায়ক, অমার্জিত, অনুন্নত। ভদ্রতা বা সুরুচি প্রায় দুর্লভ। এরা সঠিকভাবে ভারতবর্ষীয় নয়। ভারতের প্রান্তিক সীমানার অধিবাসী ও বর্বর ভাব-অভ্যাস প্রবণ।

॥ ১২ ॥ ৎসেহ-কিয়া : টক্ক

রাজপুরী থেকে আরো দক্ষিণ-পূর্বদিকে এবার এগিয়ে চলা সুরু করলাম। পাহাড়ী অঞ্চলের খাড়াই ভাঙা শেষ হলো। এবার উৎরাইয়ের দিকে নামতে সুরু করলাম। তারপর নদী পার হলাম। এভাবে ৭০০ লির মতো পথ ভাঙবার পর 'ৎসেহ কিয়া' বা টক্ক রাজ্যে এসে পেঁছিলাম।

দশ হাজার লি মতন আয়তনের এই রাজ্যটির পূব সীমানার গা ছুঁয়ে বিপাশা নদী বয়ে গেছে। পশ্চিম সীমানা ধরে বয়ে গেছে সিন্ধু নদ। এ রাজ্যের রাজধানীর আয়তন প্রায় ২০ লির মতো। জমি ধান চাষের উপযোগী। দেরিতে বোনা ফসল যথেষ্ট জন্মায়। এ অঞ্চলে সোনা, রূপা, তিওউ পাথর (teoushih), তামা ও লোহা প্রভৃতি পাওয়া যায়। আবহাওয়া খুব উষ্ণ। ঝড়-ঝঞ্ঝা হয়। লোকেরা চটপটে ও উগ্র। ভাষা কর্কশ ও অমার্জিত। এরা কৌষেয় (silk) নামে এক ধরনের ঝিলমিলে সাদা রঙের কাপড় পরে। এছাড়া প্রভাতী-লাল ও অন্যান্য রঙের কাপড়ও ব্যবহার করে। খুব কম লোকই বুদ্ধের অনুগামী। দেবতা ও পুণ্যাত্মাদের উদ্দেশে অনেক পূজা, যজ্ঞ ও বলিদানাদি হয়ে থাকে। দশটির মতো সংঘারাম ও কয়েকশো মন্দির আছে। আগে এদেশে গরিব ও অনাথদের থাকার জন্য অনেক পুণ্যাশ্রম ছিল। তারা

তাদের ওষুধপত্র, খাদ্য, কাপড় চোপড়, ও অন্য সব জিনিষপত্র যোগাতো; ফলে ভ্রমণকারী বা পথচারীদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়ার ঘটনা খুব কম হতো।

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ১৪-১৫ লি মতন গেলে আমরা পুরোনো শহর শাকল পৌঁছাই। এর সীমানা দেয়ালগুলি ভেঙে পড়লেও ভিত এখনো বেশ শক্ত আর মজবুত রয়েছে। আয়তনে শহরটি ২০ লির কাছাকাছি হবে। এ শহরের মধ্যেই তারা একটি ছোট শহর গড়ে তুলেছে। এটির আয়তন ছয় কি সাত লি হবে। এর বাসিন্দারা বেশ সমৃদ্ধিশালী ও ধনী। এই শাকলই ছিল আগে এ রাজ্যের রাজধানী। কয়েক শতাব্দী পূর্বে মিহিরকুল নামে এক রাজা ছিল। সে এই শহরের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করে ও সারা ভারত শাসন করে। সে ছিল খুব উপস্থিত-মনা প্রতিভাবান লোক। খুব সাহসীও ছিল। প্রতিবেশী সব রাজ্যকেই সে তার অধীনে আনে। সমগ্র ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম লোপ করার জন্য সে আদেশ জারী করে।

মগধ-রাজ বালাদিত্য বৌদ্ধধর্মের পরম অনুরাগী ছিলেন। প্রজাদের তিনি সন্তানের মতো পালন করতেন। মিহিরকুলের নিষ্ঠুর কার্যকলাপ ও অত্যাচারের কথা শুনে তিনি তাঁর রাজ্যের সীমানায় কঠোর প্রহরা বসালেন। অস্বীকার করলেন মিহিরকুলের বশ্যতা মেনে নিতে। বালাদিত্যের এ হেন স্পর্ধার শাস্তি দেবার জন্য মিহিরকুল সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। খবর পেয়ে বালাদিত্য রাজধানী থেকে পালিয়ে সাগর মধ্যে একটি দ্বীপে আশ্রয় নিলেন। অনেক প্রজাও প্রিয় রাজার অনুগমন করলো। মিহিরকুল তখন তার ভাইয়ের উপর সেনাবাহিনীর ভার দিয়ে বালাদিত্যকে আক্রমণ করার জন্য (অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে) সাগর অভিমুখে এগোলে বালাদিত্যের সৈন্যরা সেখানে মিহিরকুলকে বন্দী করলো। কিন্তু পরে মায়ের আদেশে বালাদিত্য ছেড়ে দিলেন তাকে। শুধু উত্তরের কয়েকটি ছোট রাজ্যের উপর তাকে রাজত্ব করার সুযোগ দিলেন। কিন্তু মিহিরকুলের ভাই সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে গিয়ে সে রাজ্য-গুলি দখল করে নিল। রাজ্যহারা মিহিরকুল শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরে পালিয়ে গিয়ে কাশ্মীর-রাজের কাছে আশ্রয় নিল। কাশ্মীর-রাজ তার দুর্দশায় করুণাপরবশ হয়ে তাকে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল ও একটি শহর রাজ্যরূপে দিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই মিহিরকুল সমস্ত শহরের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলে বিদ্রোহ করে কাশ্মীররাজকে হত্যা করলো ও নিজে সিংহাসন দখল করে বসলো। কাশ্মীরের পর সে গান্ধারের উপর নজর দিল। ছদ্মবেশে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে সেখানকার রাজাকে হত্যা করলো। রাজ পরিবার এবং প্রধান-মন্ত্রীকেও নিশ্চিহ্ন করলো। ১৬০০ মতো স্তূপ ও সংঘারাম ভেঙে ফেললো। তার সেনাবাহিনী যে সব লোক হত্যা করেছে তা ছাড়া আরও নয় লক্ষ

লোককে সে মেরে ফেলতে মনস্থ করলো। তখন সেখানকার সকল মন্ত্রীরা একত্র হয়ে নিজেদের প্রাণের পরিবর্তে তাদের প্রাণ-বাঁচানোর আবেদন জানালেন। মিহিরকুল কিন্তু তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না।

সে তিন লক্ষ প্রথম শ্রেণীর লোককে সিন্ধুনদের তীরে বধ করলো। এই একই সংখ্যার মধ্যম শ্রেণীর লোককে নদীর জলে ডুবিয়ে মারলো। আর এই একই সংখ্যার তৃতীয় শ্রেণীর লোককে সৈন্যদের মধ্যে বেঁটে দিল। তারপর দেশের সমস্ত ধন-সম্পদ লুঠ করে সৈন্যদের নিয়ে ফিরে গেল। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে মারা পড়লো। তার মৃত্যুকালে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি সুরু হলো, ঘন অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেল। ভূমিকম্পে পৃথিবী দুলে উঠে প্রবল ঝঞ্ঝা বইয়ে দিল। তার জন্য করুণা প্রকাশ করে পবিত্র ঋষিরা বললেন, অসংখ্য মানুষকে হত্যা ও বুদ্ধের ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সে এবার গভীর নরকগামী হলো, এবার সেখানে তাকে জন্মের অনন্ত পাকচক্রে পাক খেয়ে ফিরতে হবে।

শাকলের পুরানো নগরীতে একটি সংঘারাম আছে। এটিতে একশো জনের মতো ভিক্ষু থাকেন। এরা হীনযানের উপাসক। পুরাকালে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব এখানে বাস করে 'পরমার্থ শাস্ত্র' রচনা করেন।

এর কাছে দুশো ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ রয়েছে।

সংঘারামটি থেকে ৫ বা ৬ লি উত্তর-পশ্চিমে আর একটি স্তূপ। এটি রাজা অশোকের বানানো। দুশো ফুটের কাছাকাছি উঁচু স্তূপটি।

নতুন রাজধানীর উত্তর-পূব দিকে দশ লি মতো গিয়ে আমরা আরো একটি স্তূপের দেখা পেলাম। এটিও দুশো ফুটের কাছাকাছি উঁচু। রাজা অশোকের-ই বানানো।

॥ ১৩ ॥ চি-নো-পো-তি : চীনাপতি

শাকল থেকে পাঁচশো লি মতো চলে আমরা চীনাপতি রাজ্যে এলাম।

এ দেশটি আয়তনে দু'হাজার লির মতো। রাজধানীর ঘের ১৪ বা ১৫ লি। এখানে প্রচুর ফসল ফলে। চারিদিকে অল্পস্বল্প ফলের গাছ ছড়িয়ে আছে। লোকেরা সন্তোষ-চিত্ত ও শান্তিপ্রিয়। দেশটি নানা প্রকার সম্পদে পরিপূর্ণ। আবহাওয়া উষ্ণ ও ভিজালো। স্বভাবের দিক থেকে লোকেরা ভীতু ও উদাসীন চরিত্রের। তন্ত্র-মন্ত্র চর্চার দিকে বিশেষ ঝোঁক পড়লো। তাদের মধ্যে বুদ্ধের অনুগামী ও বিধর্মী দু-রকম লোকই রয়েছে। এখানে দশটি সংঘারাম ও আটটি দেব মন্দির আছে।

রাজা কণিষ্কের রাজত্বকালে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার সৈন্য-ক্ষমতা ও পরাক্রম সকলে স্বীকার করে নেন। পীত নদীর পশ্চিম দিকের দেশগুলির

রাজারা তার অধীনতা মেনে নেন ও তার নিদর্শনরূপে তার সভায় তাদের প্রতিনিধি পাঠান। রাজা কণিষ্ক এই সব প্রতিনিধিদের প্রতি বিশেষ আদর যত্ন দেখান। বছরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর জন্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন (অঞ্চলে) আবাস দেন। নিরাপত্তার জন্য বিশেষ রক্ষী নিয়োগ করেন। এ দেশটি তাদের শীতকালীন আবাস ছিল। এই কারণে এর নাম হয় চীনাপতি।

ভারতের কোন অঞ্চলে আগে নাশপাতি ও পীচফল ছিল না। এই প্রতিনিধিরাই প্রথম সেগুলি এখানে লাগান। এই জন্যই পীচকে এখানে চীনানী ও নাশপাতিকে চীনারাজপুত্র বলা হয়। পূর্ব দেশের (চীনের) প্রতি এখানকার লোকের খুব শ্রদ্ধা রয়েছে। এমন কি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি পর্যন্ত করছে "এ লোকটি আমাদের আগের সেই শাসকের দেশের লোক"।

রাজধানী থেকে পঞ্চাশ লি মতো দক্ষিণপূব দিকে যেতে আমরা একটি সংঘারামের দেখা পেলাম। এটির নাম তামসবন (তমসা বন ?) এখানে ৩০০ জনের মতো ভিক্ষু থাকেন। এরা সর্বাস্তিবাদ ধারার অনুগামী। তাদের চালচলন মনে সম্ভ্রম জাগায়, সদগুণাবলী সহজে চোখে পড়ার মতো, জীবনধারা পবিত্রতার বাহক। হীনযানের ধর্মীয় মতধারা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বেশ সুগভীর।

বুদ্ধের নির্বাণলাভের তিনশো বছর পর শাস্ত্রজ্ঞ কাত্যায়ন এখানে অভিধর্মজ্ঞান-প্রস্থান শাস্ত্র রচনা করেন।

তামসবন সংঘারামে দুশো ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ আছে। রাজা অশোক এটি তৈরী করেন। এখানে সারিবদ্ধভাবে অসংখ্য ছোট ছোট স্তূপ ও বড় বড় পাথরের বাড়ি মুখোমুখিভাবে রয়েছে। কল্পের আরম্ভ থেকে এখন পর্যন্ত যে সব ভিক্ষু অর্হত্ব অর্জন করে নির্বাণ লাভ করেছেন এগুলি তাদেরই স্মারক। এদের সকলের বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। তাদের দাঁত ও অস্থি এখনো বর্তমান। পর্বতকে ঘিরে ২০লি মতো আয়তনের এলাকা জুড়ে এই সংঘারাম ও স্তূপগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। বুদ্ধের দেহাবশেষ রয়েছে এমন স্তূপের সংখ্যাও অগণিত। এগুলি এমনভাবে ভীড় করে রয়েছে যে একটি অন্যটিকে ঢেকে ফেলেছে।

॥ ১৪ ॥ চে-লান-তো-লো : জালন্ধর

চীনাপতি থেকে উত্তর-পূবে ১৪০ বা ১৫০ লির কাছাকাছি পথ চলার পর জালন্ধর রাজ্যের দেখা পেলাম।

এ রাজ্যটি পূব-পশ্চিমে ১০০০ লি উত্তর-দক্ষিণে ৮০০ লি মতো। রাজধানীর আয়তন ১২ বা ১৩ লি। খাদ্যশস্য আবাদের পক্ষে জমি বেশ উপযোগী। প্রচুর

ধান হয়। অরণ্যগুলি ঘন ও ছায়া-অন্ধকার। ফুল ও ফল অফুরান। আবহাওয়া উষ্ণ ও ভিজেটে।

লোকেরা সাহসী ও আবেগ প্রবণ। কিন্তু তাদের চেহারা সাধারণ ও গেঁয়ো ধরনের। প্রত্যেকটি পরিবারই ধনী ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। এখানে পঞ্চাশটির মতো সংঘারাম আছে। সেখানে দু-হাজারের কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন। মহাযান ও হীনযান দুটি শাখারই উপাসক রয়েছেন তাদের মধ্যে। তিনটি দেব মন্দির আছে। সেখানে বিধর্মীদের সংখ্যা পাঁচশো মতো। তারা সকলেই পাশুপত।

॥ ১৫ ॥ কিউ-লু-তো ঃ কুলুত

এখান থেকে এবার আরো উত্তর-পুবে এগিয়ে চললাম। কতক প্রকান্ড পর্বতের গা-ঘেঁষে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে হেঁটে, কয়েকটি গভীর উপত্যকা পার হয়ে এক দুর্গম পথ পিছনে ফেলে এলাম। অনেক গিরিখাতও পার হতে হলো। এভাবে কম বেশি ৭০০ লি পথ ভাঙবার পর কুলুত রাজ্যে এসে উপস্থিত হলাম।

এ দেশটি আয়তনে ৩০০০ লির কাছাকাছি। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। প্রধান শহরটির ঘের চৌদ্দ থেকে পনের লির মধ্যে। জমি খুব সরস ও উর্বরা। ঠিকমতো চাষ-বাস করে যথেষ্ট ফসল ফলানো হয়। ফুল আর ফল অফুরন্ত। প্রচুর শাক-সবজি গাছপালা। তুষারাচ্ছন্ন পর্বত-সংকুল হবার জন্য বহু রকমের অতি মূল্যবান ওষধি গাছ ও মূল পাওয়া যায়। সোনা, রূপা, তামা, এসবও রয়েছে। স্ফটিক ও দেশি বা লাল তামাও আছে। আবহাওয়া অস্বাভাবিক ঠান্ডা। অনবরত শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাত লেগে রয়েছে। অধিবাসীরা অমার্জিত ও সাধারণ চেহারার। তাদের মধ্যেও গলগন্ড ও আব রোগের বেশ প্রকোপ। মেজাজ কঠোর ও উগ্র ধরনের। ন্যায় ও শৌর্যকে বিশেষ মর্যাদা দেয়।

এখানে কুড়িটির মতো সংঘারাম আছে। সেখানে এক হাজারের কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন। তাদের বেশিরভাগই মহাযানের উপাসক। অল্প কিছু অন্যান্য নিকায় বা শাখার অনুগামী। পনেরটি দেবমন্দির রয়েছে। কোনরকম বিচারভেদ না করে সব সম্প্রদায়ই সেখানে বাস করে।

পর্বতের খাড়াই অঞ্চলে পাহাড়ের মধ্যের একটি খাতে মুখোমুখিভাবে তৈরী অনেকগুলি পাথরের কক্ষ চোখে পড়লো। এখানে অর্হৎরা বাস করেন, মুনি ঋষিরা বিশ্রাম নেন।

দেশটির মাঝামাঝি অঞ্চলে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ দেখলাম।

এখান থেকে উত্তর দিকে গেলে লাহুল দেশ। সেখানে যেতে হলে এখান থেকে

প্রায় ১৮০০ থেকে ১৯০০ লি পথ হাঁটতে হবে। পথটি বেশ বিপদসঙ্কুল। বার বার খাড়া নিচে নেমে গেছে। তাছাড়া পুরো পথটাই যেতে হবে পর্বতমালা ও উপত্যকার বুক ভেঙ্গে।

দু-হাজার লির মতো উত্তর দিকে গেলে পাওয়া যাবে মো-লো-সো বা সান-পো-হো দেশ। কিন্তু সেজন্যও নানা জায়গায় খাড়া উৎরাই আর বিপদভরা পথ পার হতে হবে। তার উপর আছে হিমেল বায়ু-প্রবাহ ও তুষার প্রবাহ।

॥ ১৬ ॥ শে-তো-তু-লো : শতদ্রু

কুলুত দেশ থেকে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলাম। প্রায় ৭০০ লি পথ পার হয়ে শতদ্রু দেশে এসে পৌঁছলাম। এ পথেও একটি বিরাট পর্বত ডিঙাতে হলো। একটি চওড়া নদীও পার হলাম।

এ দেশটি পূব-পশ্চিমে ২০০০ লির মতো। একটি বিরাট নদীর উপকূল জুড়ে অবস্থিত। রাজধানীর আয়তন ১৭ বা ১৮ লি। প্রচুর খাদ্যশস্যের ফলন হয়। অফুরন্ত ফল রয়েছে। সোনা ও রুপা যথেষ্ট পরিমাণ মেলে। মূল্যবান সব পাথরও রয়েছে। আবহাওয়া উষ্ণ ও ভিজালো। এক ধরনের খুব ঝলমলে কৌষেয় (silk) কাপড় পরে এরা। পোষাক-আশাক খুব সুন্দর ও দামী। লোকজনের আচার-ব্যবহার রুচিপূর্ণ ও অমায়িক। এরা বেশ ভদ্র আর ধার্মিক। নিচু-উঁচু, ছোট-বড় সকলে নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথ পালন করে চলেছে। অতি নিষ্ঠার সঙ্গে তারা বুদ্ধের অনুশাসন মেনে চলে, তাকে গভীর সম্মান করে।

রাজধানী ও তার বাইরে দশটি সংঘারাম রয়েছে। তার মহাকক্ষগুলি এখন শূন্য, নিস্তব্ধ। মাত্র সামান্য কিছু ভিক্ষু সেখানে থাকেন। শহরের দক্ষিণ-পূবদিকে তিন বা চার লি হাঁটলে একটি স্তূপ চোখে পড়বে। দুশো ফুটের মতো উঁচু এই স্তূপটি রাজা অশোকের তৈরী। এখানে বিগত চার বুদ্ধের ওঠা-বসা, চলা-ফেরার চিহ্ন বর্তমান।

॥ ১৭ ॥ পো-লি-যে-তো-লো : পারিযাত্র

কুলুতে থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৮০০ লির কাছাকাছি পথ চলার পর আমরা পারিযাত্র দেশে এসে পৌঁছলাম।

এ দেশটি আয়তনে ৩০০০ লির মতো। রাজধানী প্রায় ১৪ বা ১৫ লি। এখানে শস্যের ফলন প্রচুর, বিশেষ করে দেরীতে বোনা গম। এ দেশে আশ্চর্য ধরনের এক জাতের ধান বোনা হয়—এগুলি মাত্র ৬০ দিনে পাকে। গরু ও ভেড়ার সংখ্যা প্রচুর। ফল ও ফুলের ফলন কম। আবহাওয়া গরম ও ঝলসানো। লোকেরা একরোখা ও উগ্র ধরনের। জ্ঞান-চর্চার দিকে বিশেষ ঝোঁক নেই। অন্য ধর্মের অনুরাগী।

রাজা জাতিতে বৈশ্য। স্বভাবের দিক থেকে তিনি সাহসী ও একরোখা ধরনের এবং খুব যুদ্ধবাজ।

এখানে আটটি সংঘারাম আছে। সব কটিই প্রায় ভাঙনের মুখে। খুব সামান্য কিছু ভিক্ষু আছেন। সকলেই হীনযানের অনুগামী। দশটি দেবমন্দির রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় এক হাজারের মতো অনুগামী সেখানে থাকেন।

॥ ১৮ ॥ মো-তু-লো ঃ মথুরা

পারিযাত্র থেকে এবার পূর্বদিকে রওনা হলাম। ৫০০ লির মত পথ চলার পর মথুরায় এসে পৌঁছলাম।

মথুরা রাজ্যটির আয়তন ৫০০০ লির কাছাকাছি হবে। রাজধানীর পরিধি ২০লির মতো। জমি সরস ও উর্বরা, খাদ্য-শস্য ফলনের উপযোগী। এরা সব থেকে বেশি মনোযোগ দেয় 'অন-ম়ো-লো' বা আমলক গাছ চাষের উপর। এগুলি ঝাঁক বেঁধে জন্মায় ও রীতিমত অরণ্য সৃষ্টি করে। এর গাছগুলির যদিও একটি মাত্র নাম তা হলেও এরা আসলে দুটি জাতের। যেটি ছোট প্রজাতির তার ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ, কিন্তু পাকার পর হলদে হয়ে যায়। যেটি বড়ো প্রজাতির তার ফল সব অবস্থাতেই সবুজ থাকে।

এ রাজ্যে এক রকম মিহি সুতার কাপড় বোনা হয়। হলদে সোনাও এখানে পাওয়া যায়। আবহাওয়া বেশ কিছুটা গরম। লোকদের আচার-ব্যবহার কোমল ও হাসিখুশী। পুণ্যফল সঞ্চয়ের দিকে তাদের ঝোঁক রয়েছে। তারা সদ্‌গুণের আদর করে, জ্ঞানচর্চাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

এখানে প্রায় কুড়িটির মতো সংঘারাম আছে। সেখানে প্রায় দু'হাজারের মতো ভিক্ষু থাকেন। মহাযান ও হীনযান দুয়েরই চর্চা রয়েছে তাদের মধ্যে। পাঁচটি দেবমন্দির আছে। সেখানে সব সম্প্রদায়ের অনুগামীরা থাকেন।

রাজা অশোকের বানানো তিনটি স্তূপ আছে এখানে। বিগত চার বুদ্ধের স্মারক চিহ্ন রয়েছে সেখানে। শাক্য তথাগতের মহান অনুগামীদের দেহাবশেষ সম্বলিত অনেক স্মৃতি-স্তূপও রয়েছে। যথা—সারিপুত্র, মুদ্‌গলপুত্র, পূর্ণ-মৈত্রায়ণিপুত্র, উপালি, আনন্দ, রাহুল, মঞ্জুশ্রী এবং আরো অনেক বোধিসত্ত্বের স্তূপ।

শহরের পূর্বদিকে ৫ বা ৬ লি গেলে একটি পর্বত কেটে তৈরী সংঘারাম দেখা যায়। পাহাড়ের গা কেটে ভিক্ষুদের থাকার জন্য কুঠুরী তৈরী হয়েছে। আমরা একটি উপত্যকা দিয়ে ফটক পার হয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করলাম। সম্মানাস্পদ উপগুপ্ত এটিকে তৈরী করিয়েছিলেন। এখানে একটি স্তূপ আছে। তাতে বুদ্ধের নখকণা রয়েছে।

সংঘারামের উত্তরদিকে একটি পাহাড়-খাতে কুড়ি ফুট উঁচু ও তিরিশ ফুট চওড়া পাথরের বাড়ি আছে। এটি চার ইঞ্চি লম্বা ছোট ছোট কাঠের স্মারককে বোঝাই। এখানে উপগুপ্ত ধর্মপ্রচার করতেন। যখনই তিনি কোন লোককে সস্ত্রীক বৌদ্ধের অনুগামী করতেন ও এর ফলে তারা অর্হতত্ব লাভ করতো, তিনি এখানে একখানি করে এই কাঠের স্মারক রাখতেন। অপর কোন শাখার অনুগামী অর্হতত্ব লাভ করে থাকলে তা তিনি এই হিসাবের মধ্যে আনেননি।

এই পাথরের বাড়িটির দক্ষিণ-পূবে চব্বিশ-পঁচিশ লি মতো গেলে একটি বিরাট শুকনো জলাভূমি রয়েছে। এর পাশে একটি স্তূপ আছে।

হ্রদের কাছাকাছি উত্তরদিকে একটি বনের মধ্যে বিগত চার বুদ্ধের পদচারণার চিহ্ন বর্তমান। পাশে অনেকগুলি স্তূপ আছে। এগুলি সারিপুত্র, মুদগলপুত্র প্রভৃতি ১২৫০ জন মহান অর্হৎ যে জায়গায় তাদের সমাধি অভ্যাস করেছিলেন ও তার স্মারক চিহ্ন রেখে গেছেন তাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তোলা হয়েছে।

তথাগত তাঁর জীবদ্দশা কালে প্রায়ই এ দেশে ধর্ম-প্রচার করে বেড়িয়েছেন। যে সব জায়গায় তিনি থেমেছিলেন সেখানে তার উল্লেখসহ স্মারকস্তম্ভ রয়েছে।

॥ ১৯ ॥ স-ত-নি-শি-ফ-লো ঃ স্থানেশ্বর

মথুরা থেকে ৫০০ লির মতো উত্তর-পূবে পথ চলে অবশেষে আমরা স্থানেশ্বরে এলাম।

এই রাজ্যটি আয়তনে ৭০০০ লির মতন। জমি সরস ও উর্বরা, শস্য-শ্যামল। আবহাওয়া যদিও গরম তবু বেশ আরামপ্রদ। লোকদের আচার-ব্যবহার শীতল ও আন্তরিকতা-শূন্য। পরিবারগুলি ধনী, বেশি মাত্রায় বিলাস-ব্যসনের দিকে আকৃষ্ট। ভোজবাজী ও জাদুকলার প্রয়োগের দিকে এদের প্রচন্ড ঝোঁক রয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও যারা বিশিষ্টতা অর্জন করে তাদের খুব সম্মান দেখায়। অধিকাংশ লোকই পার্থিব সম্পদের পিছনে ছোটে। সামান্য কিছু লোক চাষ-আবাদের দিকে মনোযোগী। নানা দুর্লভ ও মূল্যবান পণ্য চারিদিকে থেকে এসে এখানে স্তূপ স্তূপ জমা হয়।

এ দেশটিতে তিনটি সংঘারাম আছে। সেখানে সাতশোর কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন। তারা সকলেই হীনযানের উপাসক। কয়েকশো দেবমন্দির আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অসংখ্য অনুগামী সেখানে থাকে।

রাজধানীকে ঘিরে ২০০ লির মতো একটি অঞ্চলকে এখানকার লোক পুণ্যভূমি বলে (ধর্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্র নামেও অভিহিত হয়)।

শহরের উত্তর-পশ্চিমদিকে চার কি পাঁচ লি দূরে একটি স্তূপ আছে, তিনশো

ফুটের মতো উঁচু এই স্তূপটি রাজা অশোকের বানানো। এর ইটগুলি সব হলদেটে লাল রঙের, বেশ উজ্জ্বল ও চকচকে। এর মধ্যে এক পেকের সমান (দুই গ্যালন) বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে।

শহরের দক্ষিণ দিকে একশো লির মতো গেলে আমরা গোকণ্ঠ (?) নামে একটি সংঘারামে এসে হাজির হই। সামনে পর পর সারি বেঁধে অনেকগুলি বুরুজ আছে। একটি বুরুজ থেকে আরেকটিতে যাতায়াতের জন্য প্রত্যেক তলায় সংযোগ পথ রয়েছে। এখানকার ভিক্ষুরা ধর্মপ্রাণ, ভদ্র ও শান্ত-সুন্দর গাম্ভীর্য সম্পন্ন।

॥ ২০ ॥ সু-লো-কিন-ন : শ্রুঘ্ন

স্থানেশ্বর থেকে উত্তর-পূব দিকে ৪০০ লির মতো পথ চলে এবার শ্রুঘ্ন রাজ্যে আসা গেল।

এ দেশটির আয়তন ছ'হাজার লির মতো। পুব সীমানা বরাবর গঙ্গানদী বয়ে চলেছে। উত্তর সীমানায় বিরাট বিরাট পাহাড়মালার পাঁচিল। যমুনা নদী দেশের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। রাজধানীর পরিধি ২০ লির কাছাকাছি। তার পুব সীমানা যমুনা নদীর উপকূল। নগরটির ভিত এখনো বেশ মজবুত কিন্তু তবুও পুরোপুরি জন-মানব বর্জ্জিত।

ফসল ও আবহাওয়ার দিক থেকে স্থানেশ্বরের সঙ্গে এখানকার মিল রয়েছে। লোকজনের ব্যবহার আন্তরিক, স্বভাব সত্যনিষ্ঠ। তারা অন্য-ধর্মের অনুরাগী। তাকে তারা গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। জ্ঞানচর্চার উদ্যমকে বিশেষ প্রশংসার চোখে দেখে। তবে ধর্মীয় তত্ত্ব-জ্ঞানের দিকেই অনুরাগ বেশি।

এখানে পাঁচটি সংঘারাম আছে। তাতে এক হাজার জনের মতো ভিক্ষু থাকেন। তাঁদের বেশির ভাগই হীনযানের অনুগামী। সামান্য কিছু অন্য মতধারার উপাসক। তাঁরা সুষ্ঠু ভাষায় বক্তৃতা ও আলোচনা করেন। স্বচ্ছ আলোচনায় গভীর সত্যকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজেদের সন্দেহ দূর করার জন্য আসেন এখানে।

দেবমন্দিরের সংখ্যা একশোটি। সেখানে অগণিত বিধর্মী উপাসক।

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, যমুনা নদীর পশ্চিমে একটি সংঘারাম রয়েছে। এটির পূবদিকের ফটকের বাইরে অশোক রাজার বানানো একটি স্তূপ দেখলাম। এর কাছে আরো অনেকগুলি স্তূপ রয়েছে। তাতে বুদ্ধদেব এবং সারিপুত্র, মৌদগলায়ন প্রভৃতি অর্হৎগণের চুল ও নখকণা ইত্যাদি বর্তমান।

তথাগত নির্বাণ লাভের পর এ দেশ বিধর্মী-শিক্ষার পীঠভূমি হয়ে উঠেছিল। সত্য

ধর্মের প্রতি অনুরক্তদের মিথ্যা ধর্মমতের অনুগামী করে তোলা হয়। এখানকার সংঘারামগুলিতে বিভিন্ন দেশ থেকে সে সময় (বৌদ্ধ) শাস্ত্রজ্ঞরা আসতেন। বিধর্মী ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তারা বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন। এ জন্যেই এই সংঘারামগুলি এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

যমুনার পূর্বদিকে প্রায় ৮০০ লি গেলে গঙ্গা নদীর দেখা পাওয়া যাবে। নদীর প্রবাহ এখানে তিন থেকে চার লি চওড়া। দক্ষিণ-পূর্বদিকে বয়ে চলেছে। যেখানে সাগরের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে সেখানে দশ লি বা তারও বেশি চওড়া হবে। নদীটির জল সাগরের মতো নীলাভ। তরঙ্গ প্রবাহও সাগর তরঙ্গের মতো দীঘল। জলে অগুণতি আঁশালো দৈত্য (মৎস্য-দানব) রয়েছে। কিন্তু তারা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। জল বেশ মিষ্টি ও তৃপ্তিদায়ক। নদীর দুপার সূক্ষ্ম বালুকণায় ভরাট। এ দেশের চলিত ইতিহাসে এ নদীকে মহাভদ্রা বলা হয়—কেননা, সে অসংখ্য পাপ ধুয়ে মুছে দিতে পারে। যারা জীবনের উপর বিতৃষ্ণ তারা যদি এর কোলে জীবন বিসর্জন করে তবে স্বর্গে জন্ম নিয়ে সুখভোগ করে। লোকেরা মারা গেলে তাদের অস্থি এখানে যদি বিসর্জন দেয়া হয় তবে তারা আর নরকগামী হয় না।

॥ ২১ ॥ মতিপুর (মান্দোর)

গঙ্গানদী পার হয়ে পূব মুখে চলে এবার মতিপুর এলাম।

এ রাজ্যটি আয়তনের দিক থেকে ৬০০০ লির কাছাকাছি। রাজধানী ২০ লির মতো। জমিন খাদ্য-শস্য আবাদের উপযোগী। নানা রকম ফুল, নানা জাতের ফলে ভরপুর। আবহাওয়া স্নিগ্ধ ও কোমল। অধিবাসীরা আন্তরিকতাপূর্ণ ও সত্যনিষ্ঠ। জ্ঞান চর্চাকে বিশেষভাবে সম্মান দেয়। তন্ত্র-মন্ত্র ও ভোজবাজীর প্রয়োগে খুব দক্ষ। বুদ্ধের অনুরাগী ও বিপরীত মার্গীদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান।

রাজা শূদ্রবর্ণের লোক। তিনি বুদ্ধের অনুগামী নন। দেবতাদের ভক্তি ও পূজা করেন। এখানে কুড়িটির মতো সংঘারাম। ভিক্ষু সেখানে আটশোর কাছাকাছি। তাদের বেশীরভাগই হীনযানের চর্চা করে ও স্থবির শাখার অনুগামী। পঞ্চাশটির মতো দেবমন্দির আছে। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অনগামীরা সেখানে নির্বিচারে বাস করে।

রাজধানীর দক্ষিণ দিকে ৪ বা ৫ লি মতো গেলে একটি ছোট সংঘারাম চোখে পড়ে। এখানে পঞ্চাশ জনের কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন। অতীতে শাস্ত্রজ্ঞ গুণপ্রভ এখানে 'পিনচিন' ও আরো একশোখানির মতো গ্রন্থ রচনা করেন। অল্প বয়সেই তিনি শাস্ত্রজ্ঞরূপে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। পরিণত বয়সে বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের দিক

থেকে তাঁর সমকক্ষ ছিল না কেউ। মানবিক শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন ; তাঁর প্রখর উপলব্ধি ক্ষমতা ও জ্ঞান ছিল। অতি বিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি। মহাযানের চর্চা দিয়ে তিনি জীবন সুরু করেন। কিন্তু তার গভীর তত্ত্বধারার সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই তিনি বিভাষা শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ পান। এরপর মহাযান থেকে তিনি তার মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে হীনযানের চর্চায় ডুবে যান। মহাযানকে নির্মূল করার জন্য অনেকগুলি বই লেখেন ও এভাবে হীনযানের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। এ ছাড়া, অতীতের বিভিন্ন নামকরা আচার্যদের লেখার সমালোচনা ও বিরুদ্ধতা করেও তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ লেখেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি যদিও তিনি ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন তবুও হীনযান শাখার অনুগামী হওয়ার দরুন তার সবগুলি তত্ত্বকে ভেদ করতে পারেননি।

গুণপ্রভ যেখানে বাস করতেন সেই সংঘারামটির উত্তর দিকে তিন থেকে চার লি দূরে একটি বড় সংঘারাম রয়েছে। এটিতে দুশো জনের মতো ভিক্ষু থাকেন। এরা হীনযানের অনুগামী। শাস্ত্রজ্ঞ সংঘভদ্র এখানে মারা যান। তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বিরাট যোগ্যতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। অল্প বয়সেই তিনি অনন্য পণ্ডিত হয়ে ওঠেন এবং সর্বাস্তিবাদ শাখার সমস্ত বিভাষা শাস্ত্রের উপর দখল লাভ করেন।

এই সময়ে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব জীবিত ছিলেন। যে সব বিষয়ের ব্যাখ্যাদান ভাষার অতীত, তাকে তিনি গভীর সাধনার সাহায্যে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টায় মগ্ন ছিলেন। বিভাষক শাখার আচার্যদের মতবাদকে উড়িয়ে দেবার জন্য তিনি অভিধর্মকোষ শাস্ত্র রচনা করেন। তার রচনাশৈলী স্বচ্ছ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। যুক্তিবিস্তার ছিল খুব সূক্ষ্ম ও উঁচু দরের।

সংঘভদ্র বসুবন্ধুর লেখাগুলি পড়ে, একটানা ১২ বছর ধরে অতি গভীর গবেষণা চালিয়ে তার কোষকারকা শাস্ত্র রচনা করেন। এতে আট লক্ষ শব্দের পঁচিশ হাজার শ্লোক রয়েছে। পরে বসুবন্ধু এটির নাম পরিবর্তন করে ন্যায়ানুসার শাস্ত্র রাখেন।

সংঘভদ্র মারা গেলে তাকে দাহ করা হয় ও অস্থি সংগ্রহ করে সংঘারামের একটি স্তূপে রাখা হয়। সংঘারাম থেকে ২০০ পা-এর মতো উত্তর-পশ্চিমদিকে একটি আমবনে এখনো সে স্তূপটি রয়েছে।

আমবনের পাশে একটি স্তূপে শাস্ত্রজ্ঞ বিমলমিত্রের দেহাবশেষ রাখা আছে। ইনি কাশ্মীরের লোক ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মানুগামী হয়ে তিনি সর্বাস্তিবাদী শাখার উপাসক হন।

এ দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, গঙ্গানদীর পূব-কূলে মো-উ-লো বা মায়াপুর (বর্তমান হরিদ্বার) নামে একটি শহর আছে। এটির আয়তন ২০ লির মতো। জনসংখ্যা খুব বেশি। নদীর পবিত্র প্রবাহ এই শহরটির সব দিক দিয়ে বয়ে গেছে। এখানে দেশী তামা, নিখুঁত স্ফটিক মেলে। নানা রকম মূল্যবান পাত্র তৈরী হয়।

শহর থেকে একটুখানি দূরে গঙ্গার তীরে একটি বিরাট দেবমন্দির আছে। এটির মাঝখানে একটি জলাধার রয়েছে। অতি দক্ষভাবে পাথর জোড়া দিয়ে তার পাড়গুলি বাঁধানো। একটি কাটা খালের সাহায্যে এর মধ্য দিয়ে গঙ্গার জল প্রবাহিত করা হয়েছে। সারা ভারতের লোক একে 'গঙ্গা নদীর দ্বার' নাম দিয়েছে। এটি পুণ্য অর্জনের ও পাপ বিমোচনের ক্ষেত্র। নানা দূর দূরান্ত থেকে শত সহস্র লোক সব সময় এখানে আসে ও এর জলে স্নান করে। সদাশয় রাজা এখানে একটি 'পুণ্যশালা' বানিয়ে দিয়েছেন। বিধবা ও অসহায়, অনাথ ও পরিত্যক্তদের ভাল খাদ্য ও ওষুধপত্র দেবার জন্য এই সংস্থাকে অর্থ-বরাদ্দ করা হয়েছে।

॥ ২২ ॥ পো-লু-হিন-মো-পু-লো : ব্রহ্মপুর

এবার উত্তর দিকে যাত্রা করে তিনশো লির মতো পথ চলে ব্রহ্মপুর এসে পেঁছিলাম।

এ রাজ্যটির আয়তন ৪০০০ লির মতো। সবদিক পর্বত দিয়ে ঘেরা। প্রধান নগরীর ঘের ২০ লির কাছাকাছি। বেশ ঘন বসতিপূর্ণ শহর। পরিবারগুলিও দেখলাম ধনী।

এখানকার জমি সরস ও উর্বরা। ঋতু অনুসারে যথারীতি চাষ-আবাদ করা হয়। এখানে দেশী তামা ও স্ফটিক পাথর মেলে। আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে কিছুটা ঠান্ডা। লোকেরা পরিশ্রমী, কিন্তু কৃষ্টিবিহীন। খুব কম লোকই লেখাপড়া বা জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী। বেশির ভাগ মানুষই ব্যবসা-বাণিজ্য মধ্যে ডুবে রয়েছে।

লোকদের স্বভাব-চরিত্র কিছুটা বর্বর ধরনের। বুদ্ধের অনুগামী ও বিপরীত-মার্গী দুই-ই এখানে রয়েছে। পাঁচটি সংঘারাম আছে। কিন্তু তাতে অল্প কতক ভিক্ষু থাকেন। দশটি দেবমন্দির। সেখানে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক মিলেমিশে বাস করে।

এ দেশটির উত্তর সীমা তুষারাবৃত বিরাট পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা। এই পর্বত-মালার মাঝে সুবর্ণগোত্র দেশ। এদেশ থেকে উৎকৃষ্টমানের সোনা পাওয়া যায়। এজন্যই দেশটির এরকম নাম। দেশটি পূব-পশ্চিমে দীর্ঘল, উত্তর-দক্ষিণে সংকীর্ণ। এটিই হলো সেই 'প্রাচ্য রমণীদের' দেশ। বহুকাল ধরে রমণীই এর শাসক। এজন্য

একে 'রমণীরাজ্য' বা 'প্রমীলা রাজ্য' বলা হয়। রাজত্বকারী রমণীর স্বামীকে রাজা বলা হয়। তবে রাজ্যের ব্যাপার-স্যাপার তিনি কিছুই জানেন না। পুরুষেরা যুদ্ধবিগ্রহের দায়িত্ব পালন করে, চাষ-আবাদের কাজ করে—শুধু এই যা। এরাজ্যে শীতকালীন গম হয়। প্রচুর গোরু, ভেড়া ও ঘোড়া রয়েছে। জলবায়ু অতি হিমেল। অধিবাসীরা তড়বড়ে ও একরোখা ধরনের।

এ দেশের পূব সীমানা ফন রাজ্য (তিব্বত) দ্বারা ঘেরা। পশ্চিম সীমানা 'সন-পো-হো' (সম্পহ ?) ও উত্তর সীমানা খোটান রাজ্য দ্বারা ঘেরা।

॥ ২৩ ॥ কিউ-পি-শওঙ-ন ঃ গোবিসান

গোবিসান রাজ্যটি আয়তনের দিক থেকে দু'হাজার লির কাছাকাছি। রাজধানী ১৪ থেকে ১৫ লি। এবড়ো খেবড়ো খাড়াই পাহাড় পর্বত-এর চারিদিক ঘিরে থাকার দরুন প্রাকৃতিকভাবেই রাজ্যটি বেশ সুরক্ষিত। জনসংখ্যা বিপুল। যেদিকে চোখ ফেরানো যায় শুধু ফুল আর ফুল, ফল বাগান ও হ্রদ। এরা একের পর আর যেন সার সার ছড়িয়ে আছে। এখানকার জলবায়ু ও উৎপন্ন ফসল মতিপুরের মতোই। লোকজনের আচার-ব্যবহার নিখুঁত ও স্বভাব চরিত্র সৎ। জ্ঞানের চর্চা করতে তারা ভালবাসে, সৎ কাজের দিকে সব সময়ে মনোযোগী। বিধর্মীদের অনেক অনুগামী রয়েছে এখানে। তারা একমাত্র ঐহিক সুখই খোঁজে।

এরাজ্যে দুটি সংঘারাম রয়েছে। ভিক্ষু রয়েছেন সেখানে একশো জনের মতো। প্রায় সকলেই হীনযানের উপাসক। তিরিশটির মতন দেবমন্দির আছে। এগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। তারা সেখানে নির্বিচারে মেলামেশা ও বসবাস করে।

প্রধান শহরের পাশে একটি পুরানো সংঘারাম আছে। সেখানে রাজা অশোকের বানানো একটি স্তূপ দেখলাম ; প্রায় দুশো ফুটের মতো উঁচু। পাশেই দুটি ছোট স্তূপ। সেখানে তথাগতের চুল ও নখকণা রয়েছে। এ দুটি দশফুটের মত উঁচু।

॥ ২৪ ॥ ও-হি-ছি-ত-লো ঃ অহিক্ষেত্র

গোবিসান থেকে দক্ষিণ-পূব দিকে ৪০০ লি মতো পথ চলার পর অহিক্ষেত্র (অহিচ্ছত্র) রাজ্যে এসে উপস্থিত হলাম।

এ দেশটির আয়তন তিন হাজার লির কাছাকাছি। রাজধানীর আয়তন সতেরো বা আঠেরো লি। খাড়া পাহাড়শ্রেণী দিয়ে চারিদিক ঘেরা থাকার দরুন রাজ্যটি প্রাকৃতিক ভাবেই সুরক্ষিত। এখানে গমের চাষ হয়। অনেক বনানী ও হ্রদ রয়েছে। আবহাওয়া বেশ স্নিগ্ধ ও মনোরম। অধিবাসীরা আন্তরিকতায় ভরা, সত্যানুরাগী। তারা ধর্ম-পরায়ণ ও জ্ঞানচর্চার দিকে মনোযোগী। চালাক-চতুর এবং যথেষ্ট খোঁজখবরও রাখেন।

এখানে দশটির মতো সংঘারাম আছে। সেখানে এক হাজারের কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন। তারা সম্মতীয় শাখার হীনযান উপাসক।

নয়টির মতো দেবমন্দির দেখা যায়। তাতে তিনশো জনের মতো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিধর্মী অনুগামীরা থাকেন। তারা ঈশ্বরের নিকট বলিদান করেন ও পাশুপত মার্গী।

প্রধান শহরের বাইরে একটি নাগ-পুষ্করিণী আছে। এর পাশে অশোক রাজার বানানো একটি স্তূপ দেখা যায়। পাশে আরো চারটি স্তূপ। এগুলিতে বিগত চার বুদ্ধের উপবেশন ও চলাফেরার চিহ্ন বর্তমান।

॥ ২৫ ॥ পি-লো-শান-ন ঃ বীরসান

অহিক্ষেত্র থেকে এবার দক্ষিণ দিকে চলতে সুরু করলাম। তারপর পার হলাম গঙ্গানদী। এপারে এসে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে 'পি-লো-শান-ন' বা বীরসান এসে পেঁছিলাম। এজন্য পথ ভাঙতে হলো আমাদের প্রায় ২৬০ থেকে ২৭০ লির মতন।

এ দেশটি আয়তনে দুহাজার লির কাছাকাছি। রাজধানীর পরিধি ১০লির মতো। আবহাওয়া ও ফসলাদি অহিক্ষেত্রের মতোই। লোকজনের স্বভাব উগ্র ও রগচটা। জ্ঞান-চর্চা ও শিল্পকলা চর্চার প্রবণতা রয়েছে। এরা মুখ্যভাবে বিপরীত-মার্গীদের অনুগামী। বুদ্ধদেবের ধর্মমতে বিশ্বাসীদের সংখ্যা খুবই অল্প।

এখানে দুটি সংঘারাম আছে। তাতে ৩০০ জনের মতো ভিক্ষু দেখলাম। সকলেই মহাযান মতবাদের অনুগামী পাঁচটি দেবমন্দির রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামীরা সেখানে থাকেন।

প্রধান নগরীর মাঝখানে যে সংঘারামটি রয়েছে সেটি বেশ পুরোনো। সেখানে অশোক রাজার তৈরী একটি স্তূপও দেখলাম। স্তূপটির ভাঙন আরম্ভ হয়ে গেছে তবু এখনো ১০০ ফুটের বেশি উঁচু। তথাগত বুদ্ধ এখানে সাত দিন অবস্থান করেছিলেন। ওই সময়ে তিনি স্কন্দ-ধাতু-উপস্থান সূত্র ব্যাখ্যা করেন। এর পাশে বিগত চার বুদ্ধের উপবেশন ও বিচরণের চিহ্ন বর্তমান।

॥ ২৬ ॥ কিঅ-পি-থ ঃ কপিত্থ

'পি-লো-শান-ন' থেকে এবার দক্ষিণ পূর্বদিকে চলতে গুরু করলাম। প্রায় দুশো লি পার হয়ে 'কিঅ-পি-থ' বা কপিত্থ রাজ্যে এসে পেঁছিলাম।

এদেশটির আয়তন দু হাজার লির মতন। রাজধানীর পরিধি প্রায় ২০ লি। জলবায়ু ও চাষ আবাদের দিক থেকে 'পি-লো-শান-ন'র মতোই। লোকদের আচার ব্যবহার কোমল ও সুন্দর। জ্ঞান-অর্জনের দিকে বিশেষ প্রবণতা রয়েছে।

চারটি সংঘারাম আছে এখানে। তাতে একশোজনের মতো ভিক্ষু থাকেন। সকলেই

হীনযান শাখার সম্মতীয় উপশাখার অনুগামী। দশটি দেবমন্দির আছে। সেখানে সব রকম সম্প্রদায়ের অনুগামীরা থাকেন। তাঁরা সকলেই মহেশ্বরকে ভক্তি ও পূজো করেন।

নগরীর পূব দিকে ২০ লি মতো গেলে একটি বড় সংঘারাম চোখে পড়ে। এটির গঠনশৈলী চমৎকার। শিল্পী এর সর্বত্র তাঁর সর্বোচ্চ নৈপুণ্যের নিদর্শন রেখেছেন। পরম পুরুষের পবিত্র মূর্তিটিও অভাবনীয় রকমের অনুপম। এখানে একশো জনের মতো ভিক্ষু দেখলাম। সকলেই সম্নতীয় উপশাখার উপাসক। কয়েক অযুত পবিত্র লোক (বুদ্ধের অনুগামী) এই সংঘারামের কাছে বসবাস করেন।

সংঘারামের বিরাট সীমানার মধ্যে পূবমুখী হয়ে তিনটি অমূল্য সিঁড়ি আছে। তিনটি সিঁড়ি পর পর উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সাজানো। তেত্রিশতম স্বর্গ থেকে ফিরে আসার সময় তথাগত বুদ্ধ এখানেই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। পুরাকালে বুদ্ধ জেতবন থেকে স্বর্গে আরোহণ করেন। সেখানে সদ্ধর্ম মহাকক্ষে বাস করে তিনি তাঁর মাকে ধর্মব্যাখ্যা করে শোনান। তিন মাস কাল সেখানে থাকার পর তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসতে মন করলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর দৈব ক্ষমতাবলে এ তিনটি অমূল্য সিঁড়ি তৈরী করে দিলেন। মধ্যের সিঁড়িটি হলো সোনার। বাঁয়েরটি আসল স্ফটিকের। ডাইনেরটি সাদা রুপোর।

কয়েক শতাব্দী আগেও (মূল) সিঁড়ি তিনটি তাদের আসল জায়গায় খাড়া ছিল। এখন সেগুলি মাটিতে ডেবে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিবেশী রাজারা সিঁড়িটিকে আর দেখতে না পেয়ে দুঃখিত হয়ে তার অনুকরণে নতুন তিনটি সিঁড়ি বানিয়ে দেন। এগুলি ইট আর কারুকার্য করা পাথর দিয়ে তৈরী। রত্ন খচিত করা। মূল সিঁড়ি তিনটি যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই তৈরী করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রায় ৭০ ফুট উঁচু। সিঁড়ির মাথায় একটি বিহার বানানো হয়েছে। তার মধ্যে বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে। তার দুদিকে একটি সিঁড়িতে ব্রহ্মার ও অন্যটিতে ইন্দ্রের মূর্তি। বুদ্ধ পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় যে ভাবে তাঁরা প্রথম উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক সেইরকম মূর্তি।

সংঘারামটির বাইরে, একেবারে কাছে, ৭০ ফুট উঁচু একটি পাথরের স্তম্ভ আছে। এটি অশোক রাজার তৈরী। বেগুনীরঙা স্তম্ভটি স্যাঁতসেঁতে ভাবের দরুন চিকচিক করছে। পাথরগুলি বেশ মজবুত ও মিহি। স্তম্ভের মাথায় একটি সিংহের মূর্তি, কটিদেশে ভর দিয়ে সিঁড়িগুলির দিকে মুখ করে বসে আছে। স্তম্ভটির চারদিকে অতি সুন্দর ভাবে সব মূর্তি খোদাই করা রয়েছে।

সিঁড়ি তিনটি থেকে একটুখানি দূরে একটি স্তূপ রয়েছে। এখানে বিগত চার বুদ্ধের উপবেশন ও বিচরণের চিহ্নাদি রয়েছে।

এর পাশে আর একটি স্তূপ আছে। তথাগত এখানে অবস্থান করেছিলেন। এর পাশে, যেখানে তথাগত সমাধিমগ্ন হতেন, সেখানে একটি বিহার তৈরী করা হয়েছে। বিহারের পাশ দিয়ে একটি লম্বা প্রাচীর চলে গেছে। এটি পঞ্চাশ পা লম্বা ও সাত ফুট উঁচু। এখানে বুদ্ধ নিয়মিত পদচারণা করতেন। তিনি যে সব স্থানে তাঁর পা রেখেছিলেন সেখানে পদ্মফুলের প্রতিকৃতি রয়েছে। দেয়ালের ডান ও বাঁ দিকে দুটি ছোট স্তূপ রয়েছে। এ দুটি ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তৈরী করেন।

বড় স্তূপটির দক্ষিণ-পূর্বদিকে রয়েছে একটি নাগ-পুষ্করিণী।

॥ ২৭ ॥ 'কিএ-পো-কিও-শে' বা কন্যাকুব্জ

কপিত্থ থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে যাত্রা করা হলো। দুশো লি থেকে কিছু কম পথ পেরিয়ে (কন্যাকুব্জ বা আধুনিক কনৌজ) রাজ্যে এসে পেঁছিলাম।

আয়তনে এ রাজ্যটি চার-হাজার লির মতো। গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে এর রাজধানী। লম্বায় ২০ লির মতো। চওড়ায় ৪ বা ৫ লি। শহরটিকে ঘিরে একটি শুকনো পরিখা রয়েছে। মুখোমুখি ভাবে অনেকগুলি মজবুত আর বেশ উঁচু বুরুজ আছে। ফুলের গাছ, বন-বনানী, হ্রদ-পুকুর চারিদিকে সৌন্দর্য ছড়িয়ে চলেছে। নানা দেশ থেকে অঢেল দামী দামী পণ্য এখানে এসে জমা হয়। অধিবাসীদের অবস্থা স্বচ্ছল, মনে তৃপ্তির ভাব। বাড়িঘরের চেহারা সম্পন্ন, সুখ-সাচ্ছন্দ্যের সংকেত বহন করে। যেখানেই যাও ফুল আর ফলের প্রাচুর্য চোখে পড়বে। ঋতু অনুসারে সবখানে নিয়মমাফিক চাষ-আবাদ চলছে। আবহাওয়া মনোরম ও স্নিগ্ধ। লোকের আচার-ব্যবহার সততা ও আন্তরিকতা মাখা। চেহারার মধ্যে আভিজাত্য ও উদারতার ছাপ রয়েছে। পরনে বেশ ঝলমলে, নক্সা আঁকা পোষাক পরিচ্ছদ। জ্ঞানচর্চার দিকে খুব ঝোঁক রয়েছে। কোথাও বেড়াতে গেলে আলাচনায় মেতে ওঠে। ভাষার বিশুদ্ধতার জন্য তাদের খুব খ্যাতি। বুদ্ধের অনুগামী ও অন্যধর্মীদের সংখ্যা এখানে প্রায় সমান-সমান।

এখানে কয়েকশো সংঘারাম আছে। সেখানে ভিক্ষুর সংখ্যাও হাজার দশেকের মতো। হীনযান ও মহাযান দুয়েরই তা'রা চর্চা করে। মন্দিরের সংখ্যা দুশো। সেখানে কয়েক হাজার অনুগামী রয়েছে।

কন্যাকুব্জর পুরোনো রাজধানী হলো কুসুমপুর। রাজার নাম ছিল ব্রহ্মদত্ত। ধর্মপরায়ণতা, প্রজ্ঞা, পরাক্রম এসবের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

বর্তমান রাজা বৈশ্য বর্ণের। তার নাম হর্ষবর্ধন। একদল আমাত্য রাজ্যের প্রশাসনের কাজ চালান। দু'পুরুষের মধ্যে তিন জন রাজা সিংহাসনে বসেছেন। রাজার পিতার নাম প্রভাকরবর্ধন। বড় ভাইয়ের নাম রাজ্যবর্ধন।

বড় ভাই হিসাবে রাজ্যবর্ধন প্রথমে সিংহাসন লাভ করেন ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসনকার্য চালাতে থাকেন। এ সময়ে পূর্ব-ভারতের কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। তিনি রাজ্যবর্ধনের উপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি প্রায়ই তাঁর মন্ত্রীদের কাছে বলতেন, রাজ্যের পাশে কোন ন্যায়বান রাজা থাকলে তা রাজ্যে অমঙ্গল ডেকে আনে। এজন্য মন্ত্রীরা রাজ্যবর্ধনকে একটি আলোচনা-সভায় আমন্ত্রণ জানান ও সেই সুযোগে তাঁকে হত্যা করেন।

রাজার মৃত্যুতে রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মহামন্ত্রী ভন্ডীর প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। সবাই তাঁর মতামতের প্রতি মর্যাদা দিত। তিনি সব মন্ত্রীদের ডেকে বললেন—"জাতির ভাগ্য আজকের মধ্যেই ঠিক করে ফেলা দরকার। বৃদ্ধ রাজার বড় ছেলে মারা গেছেন। তাহলেও তাঁর ভাই আছেন। তিনি মানবিকতা ও মমতাপরায়ণ। স্বভাব-চরিত্রও দেবোপম। কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আনুগত্যও রয়েছে। রাজপরিবারের সকলের প্রতি তাঁর গভীর মায়ামমতা রয়েছে। অতএব প্রজারা সকলেই তাঁকে পছন্দ করবে। আমার প্রস্তাব—তাঁকেই রাজা হিসাবে নির্বাচন করা হোক। এবার আপনাদের কার কী মত বলুন।" সমবেত মন্ত্রীরা সকলেই হর্ষবর্ধনের গুণবত্তার কথা স্বীকার করলেন ও তাঁকে রাজা রূপে নির্বাচন করা নিয়ে মহামন্ত্রীর সঙ্গে একমত হলেন।

তখন মহামন্ত্রী ও আমাত্যরা সকলে মিলে হর্ষবর্ধনের কাছে গিয়ে তাঁকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, "রাজকুমার, শুনুন। বৃদ্ধ রাজা তাঁর পূর্ব সুকৃতি ও এ জন্মের সদগুণাবলীর জন্য এরূপ সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন যে তিনি সেজন্য অতি সহজে তাঁর রাজ্য সুশাসনে রাখতে পেরেছিলেন। রাজ্যবর্ধন যখন রাজা হলেন আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে তিনিও ঐভাবে দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শদাতাদের ত্রুটির জন্য তিনি নিজেকে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়েছেন। রাজ্যের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। পরামর্শদাতা মন্ত্রীরাই এজন্য দায়ী। গানের মাধ্যমে প্রজারা আপনার সম্পর্কে যে সব অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় যে সকলেই তারা আপনার গুণমুগ্ধ। অতএব আপনি এ রাজ্যের ভার গ্রহণ করুন, তাকে গৌরবের সঙ্গে শাসন করুন। আপনার বংশের শত্রুকে জয় করুন। রাজ্যের প্রতি, আপনার পিতার কার্যকলাপের প্রতি অপমানের প্রতিশোধ নিন। তাতে আপনার যশ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অনুরোধ আপনি যেন প্রত্যাখান করবেন না।"

রাজকুমার তখন উত্তর দিলেন—"রাজ্যশাসন এক গুরু দায়িত্ব। সব সময়েই

সমস্যার পর সমস্যা ভিড় করে থাকে। কর্তব্য সম্পর্কে রাজার সব সময় পূর্ব থেকে সজাগ থাকা প্রয়োজন। আমি সে দায়িত্ব পালনের মতো বিরাট লোক নই। তবে আমার পিতা ও ভাই বেঁচে নেই, এক্ষেত্রে রাজ্যের উত্তরাধিকারীত্ব অস্বীকার করা আমার পক্ষে সাজে না। তাতে প্রজাদের কোন মঙ্গলই হবে না। আমি নিজের অসম্পূর্ণতার কথা ভুলে গিয়ে এক্ষেত্রে অন্য সকলের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেব। তবে তার আগে আমাকে একবার গঙ্গার তীরে বিরাজিত অলৌকিক ক্ষমতাধারী অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের বিগ্রহের নিকটে যাবার সময় দিন। আমি এ বিষয়ে তাঁর উপদেশ চাইব।"

এরপর তিনি বোধিসত্ত্বের মূর্তির কাছে উপস্থিত হয়ে উপবাস করে প্রার্থনা জানাতে সুরু করলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে সশরীরে দেখা দিয়ে প্রশ্ন করলেন—"এমন আকুল হয়ে কেন আমায় ডাকছ? তুমি কি চাও?" তখন রাজকুমার তাঁকে সব কথা খুলে বলে তাঁর কাছে উপদেশ চাইলেন।

বোধিসত্ত্ব তখন বললেন—"পূর্বজন্মে এক সন্ন্যাসী হয়ে তুমি এই বনে কাটিয়েছিলে। সেই পুণ্যবলে এজন্মে তুমি রাজপুত্র হয়ে জন্মেছ। কর্ণসুবর্ণের রাজা বুদ্ধের ধর্মকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে চলেছে। তুমি সিংহাসনে আরোহণ করে তদনুপাতে এই ধর্মের প্রতি ভালবাসা ও করুণা দেখাও। যদি তুমি আর্তকে করুণা দেখাতে, তাদের দুঃখ দূর করতে যত্নবান হও তবে অল্পকাল মধ্যেই সারা ভারত তোমার পদানত হবে। যদি তুমি তোমার আধিপত্য বিস্তার করতে চাও তবে আমার নির্দেশ মেনে চলো। তবে, আমার আশীষবলে তুমি আরো বেশি দূরদর্শিতা লাভ করবে। তার ফলে কোন প্রতিবেশি রাজা তোমার উপর জয়ী হতে পারবে না। তুমি যেন সিংহাসনে বোসো না এবং নিজেকে যেন রাজা বলে ডেকো না।"

নির্দেশ লাভ করে হর্ষবর্ধন সেইমতো রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। নিজেকে তিনি রাজকুমার রূপে অভিহিত করলেন। তাঁর উপাধি শীলাদিত্য।

রাজ্যভার নিয়ে তিনি মন্ত্রীদের আদেশ দিলেন—"আমার ভাইয়ের হত্যাকারীরা এখনো শাস্তি পায়নি। প্রতিবেশী রাজারা এখনো অধীনে আসেনি। এ কাজ যতদিন না সম্পূর্ণ হবে ততদিন আমি দক্ষিণ হাত দিয়ে অন্ন গ্রহণ করবো না। প্রজারা ও রাজ-আমাত্যেরা সকলে এক হয়ে আপ্রাণ শক্তি দিয়ে এ কাজ বাস্তবে পরিণত করার প্রয়াস করুন।"

আদেশ অনুসারে রাজ্যের সকল সৈন্যকে একত্র করা হলো। অস্ত্রগুরুদের ডাক পড়লো। রাজ্যের সমর বাহিনীতে ৫০০ রণহস্তী, ২000 অশ্বারোহী ও ৫0,000 পদাতিক ছিল। সৈন্যরা অবিরাম গতিতে এগিয়ে চললো। পূব থেকে পশ্চিমের

সকলে তাঁর অধীনে এলো। ছ-বছরের মধ্যে সারা ভারতকে তিনি বশে আনলেন। নিজের রাজ্যসীমা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য বাহিনীও বেড়ে চললো। রণহস্তীর সংখ্যা ৬০,০০০ অশ্বারোহীর সংখ্যা ১০,০০,০০-তে দাঁড়াল। তিরিশ বছর পর তিনি অস্ত্র সংবরণ করলেন, সর্বত্র শান্তির পরিবেশের মধ্যে রাজ্য শাসন করে চললেন। এবার তিনি চরমভাবে মিতাচারের শাসন সুরু করলেন। চারিদিকে ধর্মের বীজ বপনের জন্য তিনি আহার নিদ্রা পর্যন্ত ভুলে গেলেন। সব রকম প্রাণী হত্যা ভারতময় নিষিদ্ধ করা হলো। এই নিষেধ অমান্যকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে ঘোষিত হলো। গঙ্গা নদীর দু-কূল জুড়ে তিনি কয়েক হাজার স্তূপ গড়লেন। প্রত্যেকটি স্তূপ দশ ফুট করে উঁচু। ভারতের প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামের প্রধান প্রধান রাস্তায় পুণ্যশালা করে দিলেন। অন্ন ও জল বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। চিকিৎসক নিয়োগ করলেন। স্থানীয় দুস্থ মানুষদের জন্য ও পর্যটকদের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করলেন। কোনরূপ কৃপণতা না করে সব কিছু বিতরণের আয়োজন করা হলো। বুদ্ধদেবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত সকল স্থানে তিনি সংঘারাম গড়ে দিলেন।

প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর তিনি বিরাট ভাবে সম্মেলনের আয়োজন করতেন। এই সম্মেলনকে মোক্ষ বলা হতো। পুরো রাজকোষ শূন্য করে ওই সময়ে তিনি দান করতেন। ভিক্ষাদানের যোগ্য নয় বলে একমাত্র সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্রই ঐ দান থেকে বাদ পড়তো। প্রত্যেক বছর সারা দেশ জুড়ে শ্রমণদের সমবেত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো। তৃতীয় ও সপ্তম দিনে তাদের তিনি খাদ্য, পানীয়, ঔষধ ও বস্ত্র এই চতুর্বিধ দান করতেন। ধর্ম-সিংহাসনকে তিনি ব্যাপকভাবে কারুকার্য মন্ডিত ও সুসজ্জিত করেছিলেন। ভিক্ষুদের প্রায়ই বিতর্ক সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাতেন ও তাঁদের যুক্তিসমূহের দোষগুণ বিচার করতেন। সৎকে পুরস্কৃত ও অসৎকে শাস্তি দিতেন। মন্দ লোকের পদাবনতি ও প্রতিভাবানদের পদোন্নতি ঘটাতেন। যে সব ভিক্ষু সদাচর ও জ্ঞান উভয়ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা লাভ করতেন তাঁদের নিয়ে তিনি ধর্ম-সিংহাসনে বসাতেন ও তাঁদের কাছ থেকে ধর্মোপদেশ শুনতেন। সদাচারের জন্য খ্যাতিবান কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে বিশিষ্ট নন এমন ভিক্ষুকে তিনি কেবলমাত্র শ্রদ্ধা জানাতেন, বিরাটভাবে সম্মান দিতেন না।

কোন লোক নৈতিক নীতিমালা উপেক্ষা করলে, ধর্মীয় প্রাধান্য অস্বীকার করে কুখ্যাত হয়ে উঠলে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হতো। তিনি তার মুখদর্শনও করতে চাইতেন না, কোন কথা শুনতেও চাইতেন না। কোন প্রতিবেশী রাজা বা মহামন্ত্রী ধর্মপরায়ণ ও সদগুণসম্পন্ন হলে তাঁকে তিনি হাত ধরে অতি সমাদরে পাশে

টেনে একাসনে বসাতেন, মহান বন্ধু বলে সম্বোধন করতেন। যারা বিপরীত চরিত্রের তাদের মুখদর্শন করতেও তিনি চাইতেন না।

রাজকার্যের প্রয়োজনে সংবাদ আনা-নেয়ার জন্য তিনি সংবাদবাহক নিযুক্ত করেছিলেন। তারা সব সময়ে সংবাদ নিয়ে যাওয়া-আসা করতো। প্রজাদের আচরণে কোনরকম বিপরীত ভাব দেখা দিলে তিনি নিজে তাদের কাছে যেতেন। রাজ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সব সময় একটি রাজনিবাস যেতো। এই নিবাসেই তখন তিনি বাস করতেন। অতি বর্ষার মাস-তিনটিতে তিনি ভ্রমণে যেতেন না। তাঁর ভ্রমণ নিবাস থেকে সর্বক্ষণ সকল সম্প্রদায়ের লোকদের সুখাদ্য বিতরণ করা হতো। এক হাজারের কাছাকাছি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পাঁচশোর মতো ব্রাহ্মণকে এভাবে রোজ খাওয়ানো হতো।

কাজকর্মের জন্য দিনকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। দিনের প্রথম ভাগ কাটাতেন শাসনকার্য নিয়ে। দ্বিতীয় ভাগ কাটাতেন অবিরাম ধর্মকার্য করে।

(কামরূপের) কুমার-রাজার কাছ থেকে যেবার আমি আমন্ত্রণ পেলাম ঠিক করলাম মগধ হয়ে কামরূপ যাব। শীলাদিত্য রাজা এ সময়ে তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে চলছিলেন। কিই-মি-ওউ-কি লো'তে তাঁকে দেখার সুযোগ পেলাম। তিনি কুমার রাজাকে বললেন—'তুমি তোমার অতিথি এই বিদেশী শ্রমণকে নিয়ে এক্ষুনি নালন্দা বিহারে আসো—এই আমার ইচ্ছা। তাঁর কথায় কুমার রাজা ও আমি দুজনে গিয়ে অধিবেশনে যোগ দিলাম। যাত্রার ক্লান্তি দূর হবার পর রাজা শীলাদিত্য আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার দেশ কোথায় ? কেন এখানে বেড়াতে এলেন ?"

উত্তরে আমি বললাম—"বিশাল তাঙদেশ থেকে আমি এসেছি। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনার কাছে অনুমতি চাইছি।"

রাজা শুনে প্রশ্ন করলেন—"তাঙ নামের এই বিরাট দেশটি কোথায় ? আপনারা কোন পথ দিয়ে আসেন ? সে দেশ এখান থেকে কাছে না দূরে ?"

আমি বললাম : "আমার দেশ উত্তর-পূবে। এখান থেকে কয়েক অযুত লি দূরে। ভারতের লোকেরা তাকে মহাচীন বলে।"

রাজা বললেন—"মহাচীনের ৎসিন নামে এক রাজার কথা আমি শুনেছি। আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দেখিয়ে অল্প বয়সেই তিনি ঈশ্বর-পুত্র রূপে বিখ্যাত হন। বৃদ্ধ বয়সে 'স্বর্গীয় যোদ্ধা' নামে খ্যাতি লাভ করেন। রাজা হবার আগে পুরো সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত অবস্থায় ছিল। প্রত্যেক জায়গায় দলাদলি, মারামারি। সৈন্যেরা বিমূঢ়। সাধারণ লোক দুর্দশার মধ্যে। তখন ঈশ্বরের পুত্র রাজা ৎসিন মহান

উদ্দেশ্যর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আপনার ভালবাসা ও মহানুভবতা দিয়ে সকলের হৃদয় জয় করে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনলেন, সবাইকে শান্ত ও সুশৃঙ্খল করলেন। তাঁর বিধান ও নির্দেশাবলী সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়লো। অন্য যে সব দেশের লোকদের তিনি নিজের অধীনে এনেছিলেন তারাও তাঁর শাসন মেনে নিল। তিনি প্রজাদের মঙ্গল সাধন করেছেন বলে তারা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর পরাক্রম ও যশোগাথা গায়। অনেককাল আগে আমি শুনেছি তাঁর প্রশংসা নাকি গানের আকারে লোকের মুখে মুখে ফেরে। —তাঁর মহান গুণাবলীর প্রশংসাগীতি কি সত্যিই খুব প্রচলিত? যে বিরাট তাঙ দেশের কথা তুমি বলছো ইনি কি তাঁরই রাজা?"

উত্তরে আমি জানালাম—"চীন আমাদের পূর্ববর্তী রাজাদের রাজ্যের নাম। কিন্তু বিরাট তাঙ বা মহাতাঙ আমাদের বর্তমান রাজবংশের রাজ্য। এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবার পূর্বে আমাদের রাজাকে ৎসিন-এর রাজা বলা হতো। এখন তাঁকে সম্রাট বা 'স্বর্গের রাজা' বলা হয়। আগেকার রাজবংশের পতন হবার পর দেশে কোন শাসক ছিল না। চারিদিকে গণ-সংগ্রাম সুরু হলো, বিশৃংখলা দেখা দিল, লোকের জীবন বিপদগ্রস্ত হলো। তখন ৎসিন-এর রাজা তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে আপন হৃদয়ের ভালবাসা ও মমতা সকলের উপর বিস্তার করলেন। তাঁর ক্ষমতাবলে দেশ থেকে দুষ্ট ব্যক্তিদের লোপ হলো, রাজ্যের চারিদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। দশ হাজার রাজ্য তাঁর অধীনতা স্বীকার করে নিল। তিনি প্রত্যেক প্রাণীকে পালন করলেন। ত্রি-রত্নের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য দেখালেন। সাধারণ মানুষের বোঝা হালকা করে দিলেন, শাস্তির কঠোরতা কমিয়ে দিলেন। রাজ্য যাতে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারে সে ব্যবস্থা নিলেন, লোকেদের বিশ্রামের সুযোগও করে দিলেন। তিনি দেশে অনেক পরিবর্তন এনেছেন, সব কথা বিশদভাবে বলা আমার পক্ষে কষ্টকর।"

শীলাদিত্য রাজা শুনে বললেন—"খুব ভাল খবর নিঃসন্দেহে। এমন একজন মহান রাজার রাজত্বে সবাই সুখে আছে শুনে ভালো লাগলো।"

কন্যাকুব্জ ফিরে যাবার আগে শীলাদিত্য রাজা এক ধর্ম-সম্মেলন ডাকলেন। কয়েক লক্ষ লোক সঙ্গে নিয়ে তিনি গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে এসে ঠাঁই নিলেন। অন্যদিকে কয়েক অযুত লোক নিয়ে কুমার রাজা আস্তানা গাড়লেন উত্তর তীরে। তারপর দুজনে নদীর দুপারে থেকে জল ও হাঁটাপথ ধরে এগিয়ে চললেন। দুই রাজার সঙ্গেই সুসজ্জিত চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী। কতক চলেছে নৌকায়। কতক বা হাতির পিঠে। বেজে চলেছে শিঙা, দামামা, বাঁশী ও বীণাযন্ত্র। নব্বই দিন চলার পর সবাই কন্যা-কুব্জে এসে পৌঁছলেন। সেখানে গঙ্গানদীর পশ্চিমতীরে ফুলে ফুলে রঙীন এক

বনানী মধ্যে শিবির গড়লেন।

শীলাদিত্যের আমন্ত্রণ পেয়ে কুড়িজন রাজা এই ধর্ম-সম্মেলনে যোগ দিতে এলেন। তাঁরা, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণরা, দেশের সব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, সৈন্য ও আমাত্যরা সকলে এক জায়গায় সমবেত হলেন। রাজা আগে থেকেই গঙ্গার পশ্চিমতীরে একটি সংঘারাম তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন। এটির পূবভাগে তৈরী করিয়েছিলেন একটি মূল্যবান স্তূপ। এটি ১০০ ফুটের মতো উঁচু। এর মাঝখানে বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এটি রাজার সমান উঁচু। স্তূপের দক্ষিণদিকে বুদ্ধের বিগ্রহকে স্নান করাবার জায়গায় একটি মূল্যবান বেদী তৈরী করা হয়েছে। ১৪ বা ১৫ লি উত্তর-পূবে তিনি আর একটি বিশ্রামাগার বানিয়েছেন। বসন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাস তখন। মাসের প্রথম থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের জন্য চমৎকার ভোজন ব্যবস্থা হয়েছিল। সাময়িক রাজপ্রাসাদ থেকে সংঘারাম পর্যন্ত খুব সুন্দর করে সাজান মণ্ডপ তৈরী হয়েছে, সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য স্থানে স্থানে আসর বানানো হয়েছে। তারা নানারকম যন্ত্রে সঙ্গীত বাজিয়ে চলেছেন।

রাজার সাময়িক প্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা বার করা হলো। অতি জমকালোভাবে সাজান একটি বড় হাতির পিঠে তুলে ধরা বুদ্ধদেবের একটি তিনফুট উঁচু মূর্তি। তার বাঁদিকে ইন্দ্রের মতো সাজসজ্জায় রাজা নিজে একটি মূল্যবান ছত্র ধরে চলেছেন। ডানদিকে ব্রহ্মার মতো সাজপোষাকে কুমার রাজা একটি শ্বেত চামর হাতে চলেছেন। দুই রাজার এক একজনের দেহরক্ষী হিসাবে চলেছে ৫০০টি করে বর্ম সাজ পরা রণ-হাতি। বুদ্ধের মূর্তির আগে ও পিছে একশোটি বড় হাতি। তাদের পিঠে গায়ক ও বাদকের দল গান বাজনা করে চলেছে। রাজা শীলাদিত্য যাবার বেলা চারিদিকে অসংখ্য মুক্তা, নানা দামি দামি জিনিষ, সোনা ও রূপা দিয়ে তৈরী ফুল ছড়িয়ে চলেছেন ত্রি-রত্নের সম্মানে। মূর্তিকে প্রথমে স্নানের বেদীতে নিয়ে সুবাসিত জলে স্নান করানো হলো। তারপর তাকে রাজা নিজের কাঁধে বসিয়ে নিয়ে চললেন পশ্চিম সংঘারামে। সেখানে মূর্তির কাছে দশ লক্ষ রেশমের পোষাক নিবেদন করা হলো। প্রত্যেকটি পোষাক দামী রত্ন খচিত। এ সময়ে ২০ জনের মতো শ্রমণ শোভাযাত্রার অনুসরণ করলেন। বিভিন্ন দেশের রাজারা দেহরক্ষীরূপে তাঁদের অনুগমন করে চললেন। উৎসবের শেষে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাবেশ সুরু হলো। তাঁরা উদ্দীপ্ত ভাষায় নানা উচ্চ তত্ত্বমূলক বিষয়ের আলোচনা করলেন। আঁধার নেমে এলে রাজা তাঁর সাময়িক প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

প্রত্যেক দিন এভাবে তিনি সোনার মূর্তিটি বয়ে নিয়ে চললেন। শেষের দিন

হঠাৎ স্তূপের মধ্যে বিরাট অগ্নিকান্ড হলো। এমন কি সংঘারামের ফটকের উপরকার মন্ডপও জ্বলে উঠলো।

রাজা তা দেখে বললেন—"আগেকার রাজাদের দৃষ্টান্ত মতো আমি আমার রাজ্যের সমস্ত ধন-সম্পদ দান করেছি, এ সংঘারামটি তৈরী করে দিয়েছি ও সব রকম মহৎ কাজের দ্বারা নিজেকে আদর্শরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার সে চেষ্টা সার্থক হলো না। এরকম দুর্বিপাকের পর আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কী?"

ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে রাজা প্রার্থনা নিবেদন করলেন—"পূর্ব পুণ্যবলে আমি সারা ভারতের উপর আধিপত্য লাভ করেছি। আমার (এ জন্মের) ধর্মীয় সুকৃতি বলে এ আগুন নিভে যাক, নয়তো আমি মৃত্যুবরণ করবো।"

প্রার্থনা শেষ করে ফটকের দিকে ছুটে চললেন। আর ঠিক তখুনি, যেন এক ফুঁয়ে সব আগুন নিভে গেল।

এ দৃশ্য দেখে রাজার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু মুখের ভাব অথবা বাচনভঙ্গীর কোনরূপ পরিবর্তন না করে রাজাদের দিকে চেয়ে বললেন—"ধর্মার্জিত সবটুকু পুণ্য আমার আগুনে নষ্ট হয়ে গেল। কী বলো তোমরা?"

রাজারা সকলে তাঁর পায়ে ধূলি-লুণ্ঠিত হয়ে সজল চোখে বললেন "যে কীর্তি আপনার অশেষ পুণ্য কর্মের চরম নিদর্শন হয়ে বিরাজ করছিল, যা যুগ যুগ অক্ষয় থাকবে বলে আমরা আশা করেছিলাম তা নিমিষে ভস্ম হয়ে গেছে। এ আমরা কী করে সহ্য করি। আরো অসহ্য বোধ হয়, যখন দেখি বিধর্মীরা এতে উল্লাসে ফেটে পড়ছে, একে অন্যের সঙ্গে আনন্দে কোলাকুলি করে চলেছে।"

রাজা উত্তর দিলেন—"এ থেকে প্রমাণ হলো যে বুদ্ধের কথা কত সত্য। বিধর্মী ও অন্যান্যরা বস্তুর নিত্যতার উপর জোর দেয়। কিন্তু আমাদের মহান দ্রষ্টার মতে সব বস্তুই অনিত্য। যদি আমার কথা বলো তবে আমার ধর্মবাদ আমার অভীষ্ট মতো পূর্ণ হয়েছে। বরঞ্চ এই ধ্বংসলীলা তাথাগতের মতবাদের যথার্থতার উপর আমার বিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘটনা এক আনন্দকর ঘটনা, দুঃখকর নয়।

এরপর রাজাদের সঙ্গে নিয়ে পূর্বদিকে গিয়ে তিনি স্তূপটিতে চড়লেন। চূড়ায় উঠে সেখান থেকে চারিদিকের দৃশ্য দেখলেন। যখন নেমে আসলেন তখন একজন বিধর্মী ছুরিকা হাতে তাঁর দিকে ধেয়ে এলো। আচমকা আক্রমনে রাজা চকিত হয়ে, পিছিয়ে, সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপরে উঠে গেলেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে লোকটিকে তিনি ধরে ফেললেন ও আমাত্যদের হাতে তুলে দিলেন। আমাত্যরা এতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে কি করবে না করবে কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছিল না।

রাজারা সকলে লোকটিকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলতে বললেন। কিন্তু রাজা শীলাদিত্য একটুও ভয় না পেয়ে, অপরিবর্তিত মুখভাব নিয়ে তাকে হত্যা না করার আদেশ শোনালেন। তারপর তাকে প্রশ্ন করলেন—"আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি যে এমন চেষ্টা করলে ?"

অপরাধী উত্তরে বললো—"মহারাজ! আপনার ধর্মকীর্তির আলোক-দীপ্তির কোন তুলনা নেই। দেশে বিদেশে সব জায়গায় তা প্রশংসিত হয়। আমি নেহাৎই একজন মূর্খ ও অন্ধ পশু। কোনরকম মহৎ কাজের অযোগ্য। বিধর্মীদের কথায় বিপথচালিত হয়ে, তাদের প্ররোচনায় কান্ডজ্ঞান হারিয়ে আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।"

রাজা প্রশ্ন করলেন—"বিধর্মীরা কেন এমন হীন কাজে প্ররোচিত করলো ?"

সে উত্তরে বললো—"মহারাজ! আপনি বিভিন্ন দেশের লোককে এখানে সমবেত করেছেন। শ্রমণদের সেবা-আপ্যায়নের জন্য আপনার কোষাগার শূন্য করে দিয়েছেন। বুদ্ধের ধাতুমূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেছেন। অথচ যে সব বিধর্মী দূর দেশ থেকে এসেছেন তাদের প্রতি কোন মনোযোগ দেননি। এতে তারা খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাই আমাকে তারা এই হীন কাজ করার জন্য যোগাড় করেছে।"

সেখানে ৫০০ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই অনন্য প্রতিভাধর। রাজার কাছে সবাইকে ডেকে আনা হলো। রাজা সোজাসুজি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। জানা গেল, রাজা বিশেষভাবে শ্রমণদের শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর জন্য শ্রমণদের উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা জ্বলন্ত তীরের সাহায্যে মহার্ঘ তোরণটিতে আগুন লাগিয়েছিল। তারা ভেবেছিল, আগুনে ভয় পেয়ে জনতা বিভ্রান্তভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর সেই সুযোগে তারা রাজাকে হত্যা করবে। কিন্তু তা ভেস্তে যাওয়ায় তারা এই লোকটিকে অর্থ দিয়ে প্রলুব্ধ করে। রাজাকে হত্যা করার জন্য সে একটি সরু পথের মাঝে লুকিয়ে ছিল।

মন্ত্রীর দল ও রাজারা সকলে তখন বিধর্মীদের নির্মূল করার দাবী তুললেন। রাজা কেবলমাত্র তাদের প্রধানকে শাস্তি দিলেন ও বাকি সবাইকে ক্ষমা করলেন। সেই ৫০০ জন ব্রাহ্মণকে ভারতের সীমানা রাজ্যগুলিতে নির্বাসনে পাঠানো হলো। তারপর তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন।

রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমদিকে যেতে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ দেখতে পেলাম। তথাগত সাতদিন এখানে থেকে তাঁর মহান ধর্মের বাণী প্রচার করেন। আগের চার বুদ্ধের বসা ও চলাফেরার সব চিহ্ন এই স্তূপের পাশে বর্তমান রয়েছে।

তাছাড়া আরো একটি স্তূপ আছে যেখানে বুদ্ধের চুল ও নখকণা রাখা হয়েছে। ঠিক যে জায়গাটিতে তিনি ধর্মের বাণী শুনিয়েছিলেন সেখানেও একটি স্তূপ বর্তমান।

দক্ষিণদিকে, গঙ্গার কাছে, তিনটি সংঘারাম আছে। সে তিনটি একটিমাত্র দেয়াল দিয়ে ঘেরা। তবে প্রত্যেকটিতে যাবার জন্য আলাদা আলাদা ফটক আছে। তার প্রত্যেকটিতে অতি সুন্দর কারুকার্যময় বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। ভিক্ষুরা ভক্তি ও শ্রদ্ধা-পরায়ণ। কয়েক হাজার অনুগামী তাঁদের সেবাকর্মের ভার বহন করে থাকে। একটি বিহারের মধ্যে এক মূল্যবান আধারে বুদ্ধদেবের একটি দাঁত রয়েছে। এটি দেড় ইঞ্চি মতন লম্বা, বেশ চকচকে ও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক এক সময়ে এক এক রঙ ধারণ করে। শুধু কাছ থেকে নয়, দূর থেকেও ভক্তরা এখানে আসে। প্রচুর গণ্যমান্য ব্যক্তিও জমা হন। সকলে একাত্ম হয়ে পূজা-নিবেদন করে। প্রতিদিন শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে লোক হয়। দেহাবশেষ (দাঁতটি) রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর তারা প্রচণ্ড ভিড়, কোলাহল ও বিশৃংখলার জন্য বাধ্য হয়ে বুদ্ধের এই দাঁত দর্শনের জন্য এক বড় স্বর্ণ-খণ্ড দর্শনী ধার্য করেছেন। এ সত্ত্বেও অতি প্রচন্ড ভিড়। লোকে খুশীমনে এই দর্শনী দেয়। প্রত্যেক উৎসবের দিনে এটিকে এনে একটি উঁচু সিংহাসনের উপর রাখা হয়। অসংখ্য লোক এসে ধূপ জ্বালায়, ফুল ছড়ায়। কিন্তু, এই ফুল স্তূপাকার হয়ে উঠলেও দাঁতের আধারটি কখনো তাতে ঢাকা পড়ে না।

সংঘারামের সামনে ডাইনে ও বাঁয়ে দুটি বিহার। প্রত্যেকটি একশো ফুটের মতো খাড়া। ভিত পাথরের, দেয়াল সব ইটের। মাঝে বুদ্ধমূর্তি শোভা পাচ্ছে। রত্নাদি দিয়ে মূর্তিটি বিশেষভাবে কারুকার্য মণ্ডিত। একটি বিগ্রহ সোনা ও রূপা দিয়ে বানানো, অন্যটি দেশী তামা দিয়ে। প্রত্যেক বিহারের সামনে একটি করে ছোট সংঘারাম।

সংঘারাম-ত্রয়ের দক্ষিণ-পূবে একটুখানি হাঁটতেই একটি বড় বিহারের দর্শন পাওয়া গেল। ভিত পাথরের, দেয়াল ইটের তৈরী। দুশো ফুটের মতো উঁচু। বুদ্ধের মূর্তিটি দাঁড়ানো, তিরিশ ফুটের কাছাকাছি লম্বা। দেশী তামা দিয়ে মূর্তিটি বানানো হয়েছে, দামী দামী রত্ন খচিত করা হয়েছে। বিহারের চারদিকের দেয়ালে ভাস্কর্য-চিত্র খোদাই করা। বুদ্ধ যখন বোধিসত্ত্বরূপে জন্ম নিয়ে চলছিলেন সে সময়কার নানা ঘটনা এইসব চিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে।

এই বিহারটি থেকে দক্ষিণদিকে অল্প একটুখানি যেতে সূর্যদেবের একটি মন্দির চোখে পড়লো। এর আর একটু দক্ষিণে একটি মহেশ্বর মন্দির। দুটি মন্দিরই বেশ ঝকমকে এক ধরনের নীলরঙা পাথর দিয়ে বানানো। নানারকম উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য মণ্ডিত। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এ দুটি বুদ্ধের বিহারটির সমান। প্রত্যেকটি মন্দিরে

একশো জন লোক রয়েছে তাকে ধোয়ামোছা পরিষ্কার রাখার জন্য। ঢাকের বাজনা, যন্ত্রাদি সহযোগে গান কি দিন কি রাত্রি অষ্টপ্রহর ধরে চলেছে।

এই বিরাট নগরীর দক্ষিণ-পূর্বদিকে ৬ বা ৭ লি মতো গেলে গঙ্গার দক্ষিণ দিকে অশোক রাজার তৈরী ২০০ ফুটের কাছাকাছি উঁচু একটি স্তূপের দর্শন মেলে।

এর পাশে একটি জায়গায় বিগত চার বুদ্ধের বসা ও চলাফেরার চিহ্ন রয়েছে। বুদ্ধদেবের চুল ও নখকণার স্তূপও একটি আছে।

রাজধানীর দক্ষিণ পূর্বদিকে একশো লির মতো পথ চলার পর আমরা 'ন-পো-তি-পো-কু-লো' বা নবদেবকুল শহরে পেঁছিলাম। গঙ্গার পূব-পারে এ শহরটি গড়ে উঠেছে। আয়তন এখন কুড়ি লির কাছাকাছি। এখানে অনেক ফুলের কুঞ্জ রয়েছে। হ্রদও আছে কয়েকটি। টলটলে জলে গাছের ছায়া শিহরণ তুলে চলে।

এ শহরের উত্তর-পশ্চিমদিকে, গঙ্গানদীর পূব-পারে একটি দেবমন্দির চোখে পড়লো। এর গম্বুজগুলি, থাকথাক চূড়াগুলি নিপুণ কারুকার্যের জন্য উল্লেখ করার মতো। শহরের পূর্বদিকে ৫ লি দূরে তিনটি সংঘারাম। তিনটিই এক ঘের-দেয়ালের মধ্যে। তবে ফটক আলাদা। ৫০০ জনের কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন। সকলেই হীনযানের সর্বাস্তিবাদী শাখার অনুগামী।

সংঘারামের সামনের দিকে ২০০ পায়ের মতো দূরে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ দেখলাম। ভিত দেবে গেছে, তবু এখনো ১০০ ফুটের মতো উঁচু।

সংঘারামের উত্তরে তিন বা চার লি গেলে গঙ্গানদীর তীর ঘেঁষে একটি স্তূপ আছে। দুশো ফুটের মতো উঁচু এই স্তূপটি অশোক রাজার বানানো। তথাগতের চুল ও নখকণার স্তূপও একটি আছে।

॥ ২৮ ॥ 'ও-যু-তো' বা অযোধ্যা

নবদেবকুল থেকে প্রায় ৬০০ লি দক্ষিণ-পূর্বদিকে পথ ভাঙলাম। গঙ্গা পার হয়ে দক্ষিণ দিকে চলার পর দর্শন পেলাম 'ও-যু-তো' বা অযোধ্যা রাজ্যের।

দেশটি আয়তনে পাঁচ হাজার লির কাছাকাছি। রাজধানী ২০ লির মতো। এখানে প্রচুর খাদ্যশস্য আবাদ হয়। অনেক ফুল আর ফলের চাষ হয়। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ ও মনোরম। লোকের স্বভাব-চরিত্র সদগুণ সম্পন্ন ও অমায়িক। ধর্মকর্মের দিকে বেশ ঝোঁক রয়েছে। জ্ঞানচর্চার দিকেও অধ্যাবসায়ী।

এরাজ্যে এক কোটির মতো সংঘারাম আছে। ভিক্ষু তিন হাজারের কাছাকাছি। মহাযান ও হীনযান দুয়েরই চর্চা করে থাকেন। দশটি দেবমন্দির রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিধর্মীরা সেখানে থাকে। তবে সংখ্যায় তারা খুব কম।

রাজধানীতে একটি পুরোনো সংঘারাম চোখে পড়লো। বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব এখানে কয়েক দশক ধরে প্রবাসজীবন কাটিয়েছেন। সে সময় তিনি মহাযান ও হীনযান দুই শাখারই নানা শাস্ত্র বই লেখেন। এর পাশে কয়েকটি ভাঙাচোরা ভিত রয়েছে। এখানে একটি মহাকক্ষ ছিল। বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব এখানেই বিভিন্ন দেশের রাজা, পৃথিবীর গণ্যমাণ্য লোক, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের কাছে নীতি ও ধর্মের ব্যাখ্যান করেন।

শহর থেকে চল্লিশ লি উত্তরদিকে গঙ্গানদীর কাছে একটি বিরাট সংঘারাম আছে। সেখানে অশোক রাজার বানানো ২০০ ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ দেখলাম।

সংঘারামের চার পাঁচ লি পশ্চিমে একটি স্তূপ আছে। এখানে বুদ্ধের চুল ও নখকণা রাখা হয়েছে। এর উত্তরদিকে একটি ভাঙাচোরা সংঘারামের অবশেষ দেখা যায়। সৌতান্তিক শাখার এক শাস্ত্রাচার্য শ্রীলব্ধ এখানে তাঁদের শাখার বিভাষা শাস্ত্র রচনা করেন।

শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ৫ বা ৬ লি গেলে একটি বেশ বড়োসড় আমবনের মধ্যে একটি পুরোনো সংঘারামের দেখা পাওয়া যাবে। অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব (বসুবন্ধুর বড় ভাই) এখানে তাঁর জ্ঞানসাধনায় মগ্ন থেকে তাঁর সমকালীন লোকদের ধর্মনির্দেশ করে গেছেন।

আম-বনানীর উত্তর-পশ্চিমদিকে একশো পা খানেক এগোলে একটি স্তূপ দেখা যাবে। এটিতে বুদ্ধের চুল ও নখকণা রাখা হয়েছে। এর পাশে কতক পুরোনো ভিত রয়েছে। বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব তুষিত সর্গ থেকে নেমে এসে এখানে অসঙ্গ বোধিসত্ত্বকে দেখা দেন। অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব কাশ্মীরের লোক ছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্বাণ থেকে দশম শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল। অল্পকালের মধ্যেই তিনি বুদ্ধদেবের মতধারাকে আয়ত্ত করেন। প্রবজ্যা নিয়ে প্রথমে তিনি হীনযানের মহিশাসক শাখার উপাসক হন ও পরে মতের বদল করে মহাযানের অনুরক্ত হন। তাঁর ভাই বসুবন্ধু সর্বাস্তিবাদী শাখার অনুগামী ছিলেন ও বিরাট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তা, গভীর জ্ঞান ও বিশেষ সুক্ষ্ম-দর্শিতার অধিকারী ছিলেন। অসঙ্গের শিষ্য ছিলেন বুদ্ধসিংহ। তাঁর আচরণ ছিল অপার রহস্যময়। তিনিও উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ও বিরাট খ্যাতিমান লোক ছিলেন।

অসঙ্গের উপদেশ-মহাকক্ষের শেষ নিদর্শন থেকে উত্তর-পশ্চিমদিকে ৪০ লি মতো যাবার পর একটি পুরোনো সংঘারামের দেখা মেলে। এটি গঙ্গার ঠিক উত্তর-কূলে। এখানে ইট দিয়ে গড়া একশো ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ আছে। এই স্থানটিতে বসেই বসুবন্ধুর মনে প্রথম মহাযান মতধারা অনুশীলনের ইচ্ছা দেখা দেয়। উত্তর

ভারত থেকে তিনি এখানে আসেন। অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আসছিলেন। এখানে পৌঁছে তাঁদের মধ্যে দেখা ও আলাপ আলোচনা হয়। ওই সময়েই বসুবন্ধুর মনে এই ইচ্ছা জাগে।

॥ ২৯ ॥ 'ও-য়ে-মো-খি' বা হয়মুখ

অযোধ্যা থেকে গঙ্গার উত্তর তীর ধরে পূর্বদিকে কমবেশি ৩০০ লি পথ চলবার পর 'ও-য়ে-মো-খি' বা হয়মুখ রাজ্যে এসে পেঁছিলাম।

এ রাজ্যটির বিস্তার ২৪০০ থেকে ২৫০০ লির মতো হবে। প্রধান নগরীটি গঙ্গার একেবারে কূলে। পরিধি ২০ লির কাছাকাছি হবে। ফসল ও জলবায়ুর দিক থেকে অযোধ্যার সঙ্গে এখানকার খুব মিল রয়েছে। লোকজনের স্বভাব বেশ সরল ও সৎ গোছের। জ্ঞান ও ধর্মচর্চার দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে।

এখানে পাঁচটি সংঘারাম আছে। সেখানে প্রায় হাজার খানেক ভিক্ষু থাকেন। তারা হীনযানের সম্মতীয় শাখার অনুগামী। দেবমন্দির আছে মোট দশটি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামীরা সেখানে থাকে।

নগরীর দক্ষিণ-পূর্বদিকে, গঙ্গার প্রায় তীর ঘেঁষে একটুখানি গেলেই রাজা অশোকের বানানো একটি স্তূপ চোখে পড়বে। এটি ২০০ ফুটের মতো উঁচু।

এছাড়া আরো একটি পাথরের স্তূপ সেখানে রয়েছে। এটিতে বুদ্ধদেবের চুল ও নখকণা রাখা আছে।

কাছেই একটি সংঘারাম দেখলাম। সেখানে ২০০ জনের মতো ভিক্ষুর বাস। নানা মূল্যবান রত্ন-শোভিত একটি বুদ্ধমূর্তি এখানে দর্শন করলাম। মূর্তিটি এমন মহান ভাব-ব্যঞ্জনাময় যে দেখলে মনে হবে যেন সত্যিই জীবন্ত। সংঘারামটির গম্বুজ ও কুলবারান্দাগুলি চমৎকারভাবে তৈরী ও কারুকাজ করা। এগুলি তার চেহারাকে যেন বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত করে তুলেছে।

শাস্ত্রাচার্য বুদ্ধদাস অতীতকালে এখানে থেকে সর্বাস্তিবাদ শাখার মহাবিভাষা শাস্ত্র রচনা করেন।

॥ ৩০ ॥ 'পো-লো-য়ে-কিয়া' বা প্রয়াগ

হয়মুখ থেকে গঙ্গানদী পার হয়ে, নদীর দক্ষিণ কূল ধরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে এগিয়ে গেলাম। প্রায় ৭০০ লি মতো পথ চলার পর 'পো-লো-য়ে-কিয়া' বা প্রয়াগ রাজ্যের দেখা পেলাম।

এ দেশটির পরিধি ৫০০০ লির কাছাকাছি। গঙ্গানদীর দুটি শাখানদীর মাঝে ২০ লি মতো অঞ্চল জুড়ে এর রাজধানী গড়ে উঠেছে।

এখানে প্রচুর খাদ্যশস্যের ফলন হয়। ফল গাছেরও ছড়াছড়ি। আবহাওয়া উষ্ণ ও মনোরম। লোকজনের আচার-ব্যবহার ভদ্র ও মার্জিত। জ্ঞানচর্চা করতে ভালবাসে। বিপরীত ধর্মের দিকে এদের প্রবল অনুরাগ।

এ রাজ্যে দুটি মাত্র সংঘারাম। সেখানে অল্পকতক ভিক্ষু রয়েছেন। সকলেই হীনযানের উপাসক।

বেশ কয়েকটি দেবমন্দির আছে। বিধর্মীদের সংখ্যা সেখানে খুবই বেশি।

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে এবং চাঁপাবনের মধ্যে রাজা অশোকের গড়া একটি স্তূপ দেখলাম। এর ভিত দেবে গেছে। তবু এর দেয়ালগুলি এখনো একশো ফুটের বেশি খাড়া। এর পাশে একটি স্তূপে বুদ্ধদেবের চুল ও নখকণা রাখা হয়েছে।

শেষে যে স্তূপটির কথা বললাম তার পাশে একটি পুরোনো সংঘারাম আছে। দেব বোধিসত্ত্ব এখানে থেকে 'কোয়াঙ পিহ' বা শতশাস্ত্র বৈপুল্যম বইটি লেখেন। এ বইতে তিনি হীনযান শাখার মূলতত্ত্বকে খণ্ডন করার সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মীদের মতবাদের অসারত্বও প্রমাণ করেন। তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে প্রথমে এখানে আসেন।

নগরীর মধ্যে একটি দেবমন্দির রয়েছে। এটি অতি সুন্দরভাবে কারুকার্য করা। এর খুব নামডাক। বিধর্মীদের পুঁথিপত্তর অনুসারে এটি সকল জীবের পুণ্য সঞ্চয়ের একটি প্রধান পীঠ।

অন্য কোন মন্দিরে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা দান করলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয় এই মন্দিরে একটি কড়ি দান করলে তার চেয়ে নাকি বেশি পুণ্য হয়। যদি কোন লোক এখানে প্রাণবিসর্জন দেয় তবে সে নাকি স্বর্গে গিয়ে অনন্ত সুখভোগ করে।

মন্দিরের মূল দেব-কক্ষের বাইরে অনেক ঝুড়ি ও ডালপালামেলা বিরাট একটি গাছ আছে (অক্ষয় বট)। গাছটির নিচে বেশ ঘন ছায়া। অনেক লোক আত্ম-বিসর্জন করার দরুণ প্রচুর নরমাংস মেলে বলে এখানে এক নরমাংস ভোজী রাক্ষস থাকে। এ জন্য গাছটির ডাইনে বাঁয়ে তাকালে যে কেউ বিরাট হাড়ের স্তূপ দেখতে পারে। কেউ মন্দিরে এলে তার মনে নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়ে আত্ম-বিসর্জনে উদ্দীপ্ত করার জন্য এখানে সব রকম ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু বিধর্মীরাই নয়, অশুভ আত্মারাও এ ব্যাপারে তাকে প্ররোচিত করে। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে এই অপরীতি এখানে চলে আসছে।

রাজধানীর পূর্বদিকে দুই নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে দশ লি মতো অঞ্চল বেশ উঁচু ও মনোরম। পুরো জায়গাটি মিহি বালির আস্তরণে ঢাকা। রাজা-রাজড়া ও গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা কেউ কোন কিছু দান করতে চাইলে এই জায়গাটিতে এসে তা করে

থাকেন। প্রাচীনকাল থেকেই এই রীতি চলে আসছে। এজন্য এ জায়গাটি 'মহাদানক্ষেত্র' নামে খ্যাতি লাভ করেছে। পূর্ব-পুরুষদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অধুনা রাজা শিলাদিত্য এখানে এসে তাঁর পাঁচ বছরের সঞ্চয় একদিনে দান করে যান। এই ক্ষেত্রটিতে এসে সব ধনরত্ন স্তূপ সাজিয়ে প্রথমদিন তিনি খুব সমারোহের সঙ্গে বুদ্ধের পূজাঅর্চনা করে তাকে অতি মূল্যবান রত্নাদি নিবেদন করলেন। তারপর দান করা শুরু হল। প্রথমে স্থানীয় ভিক্ষুরা দান পেলেন। তারপর দূরে থেকে আসা ভিক্ষুরা। এরপর রাজ্যের বিশিষ্ট সব গুণীজনদের দেওয়া হল। এরপর এল, স্থানীয় ভিন্নধর্মীদের পালা। সবার শেষে বিধবা, অসহায়, অনাথ, পরিত্যক্ত, গরিব আর ভিখারিরা দান পেলো।

এ ভাবে দান করে ধনাগার ও খাদ্যশস্যাদি শেষ করার পর তিনি তাঁর রাজমুকুট, ইত্যাদি সব খুলে নিয়ে তাও বিলিয়ে দিলেন। প্রথম থেকে শেষ অবধি এজন্য তাঁর কোন রকম দুঃখ বা কাতরতা দেখা গেল না। বরং সব শেষ হয়ে যাবার পর আনন্দে উচ্ছলভাবে চেঁচিয়ে উঠে বললেন 'চমৎকার! আমার সব কিছু এখন অজয় অক্ষয় ধনাগারে জমা পড়ল।

এ রকম দানের পর বিভিন্ন দেশের রাজারা তাঁদের রত্ন ও পরিচ্ছদাদি রাজাকে দিতেন। উদ্দেশ্য, যাতে আবার তাঁর কোষাগার ভরে উঠতে পারে।

দানক্ষেত্রের পূর্বদিকে দুই শাখানদীর সঙ্গমস্থলে প্রত্যেকদিন শত শত লোক স্নান করে বা জীবন বিসর্জন দেয়। এ দেশের লোকেরা মনে করে স্বর্গবাসী হবার জন্য পুরো উপোস থেকে এখানে প্রাণ বিসর্জন করা উচিত। এখানকার জলে স্নান করলে জীবনের যতো পাপ ধুয়ে মুছে যায়। এজন্য বিভিন্ন দেশের নানা সুদূর অঞ্চল থেকে লোকেরা দল বেঁধে এখানে আসে ও বিশ্রাম নেয়। সাতদিন ধরে কোন খাবার না খেয়ে, উপোষ থেকে, প্রাণ বিসর্জন দেয়। এমন কি বানর ও পাহাড়ী হরিণরাও এই নদীর কাছে এসে জমা হয়। তাদের কতক স্নান করে ফিরে যায়, কতক আবার উপোস করে প্রাণত্যাগ করে।

এখানকার নদীর ধারে এক গাছের নিচে একটি বানর থাকত। একবার শীলাদিত্য রাজা যখন এখানে দান ধ্যানের জন্য এলেন ওই সময়ে এই বানরটি না খেয়ে উপোস করে রইলো ও কিছুদিনের মধ্যেই এ জন্য মারা পড়লো।

যেসব ভিন্ন ধর্মীরা সন্ন্যাসজীবন যাপন করে তারা নদীর মধ্যে একটি উঁচু স্তম্ভ তুলেছে। সূর্য অস্ত যাবার আগে তারা এতে চড়ে। তারপর এক হাত ও এক পা দিয়ে স্তম্ভটিকে আঁকড়ে থেকে বিস্ময়করভাবে বাকি দেহটা বাইরের দিকে বার করে

দেয়। এ ভাবে দেহকে শূন্যে প্রসারিত করে তারা সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে। সূর্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথাটিও ধীরে ধরে ডানদিকে হেলে চলে। আঁধার ঘনিয়ে এলে তারা সেখান থেকে নেমে আসে। প্রচুর সন্ন্যাসী এরূপ অভ্যাস করে। তারা আশা করে যে এর ফলে তারা জন্ম-মৃত্যুর বাঁধন কাটতে পারবেন। অনেক সন্ন্যাসী কয়েক দশক ধরে এ অভ্যাস পালন করে চলেছে।

॥ ৩১ ॥ কিয়াউ-শাঙ-মি বা কৌশম্বী

প্রয়াগ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গেলে এক বিশাল অরণ্যের দেখা পাওয়া যাবে। এটি নানারকম হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও বুনো হাতিতে ভরাট। এরা দল বেঁধে চলাফেরা করে, যাত্রীদের নানা বিপদ ঘটায়। এজন্য বিরাট দল বেঁধে এ পথে যাওয়া আসা না করলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। এই পথ ধরেই আমাদের এগোতে হলো। ৫৩০ লির মতো পথ চলে আমরা কিয়াউ-শাঙ-মি বা কৌশম্বী এলাম।

এ দেশটির আয়তন ৬০০০ লির মতন। রাজধানী তিরিশ লির কাছাকাছি। উর্বরা শক্তির জন্য এখানকার মাটির সুনাম রয়েছে। শাক-সবজী ও ফসল ক্ষেতে গাছের বাড় অবাক হয়ে চেয়ে দেখার মতো। চাল আর আখের ফলন খুবই ভালো। গরম একটু বেশিই পড়ে। লোকদের আচার-ব্যবহার কঠোর ও রুক্ষ। জ্ঞানচর্চার দিকে ঝোঁক রয়েছে। ধর্মকর্ম ও সদগুণাবলীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহও দেখলাম।

এখানে দশটি সংঘারাম আছে। সেগুলির এখন ভাঙাচোরা পোড়োবাড়ীর অবস্থা। মাত্র তিনশোখানেক ভিক্ষু থাকেন। সবাই তারা হীনযানের উপাসক। পঞ্চাশটি দেব মন্দির রয়েছে। অসংখ্য ভিন্ন ধর্মীর বাস সেখানে।

নগরে, একটি পুরোনো রাজপ্রাসাদের মধ্যে ৬০ ফুটের মতো উঁচু একটি বড়ো বিহার আছে। তার মধ্যে পাথরে গড়া ছত্রতলে চন্দন কাঠে তৈরী একটি বুদ্ধমূর্তি দেখলাম। এটি রাজা উদয়নের বানানো। এখন পর্যন্ত অনেক দেশের রাজাই এ মূর্তিটিকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও এখান থেকে একে নড়াতে পারেনি। তাই তারা এর অনুকৃতি পূজা করে। এ রকম মিথ্যা প্রচারও অনেকে করে যে তাদেরটিই হল আসল মূর্তি, অন্য সব তারই নকল।

তথাগত প্রথম বুদ্ধত্ব লাভের পর মায়ের কাছে ধর্ম-ব্যাখ্যানের জন্য তিনমাস কাল স্বর্গে গিয়ে থাকেন। তাঁর অদর্শনে আকুল হয়ে রাজা একটি মূর্তি বানানোর মন করেন। মুদগলায়ন-পুত্রকে এজন্য তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি বলে একজন শিল্পীকে স্বর্গে পাঠাতে অনুরোধ জানান। শিল্পী যাতে বুদ্ধের বিশেষ শরীরলক্ষণগুলি দেখে নিয়ে চন্দন কাঠে তার একটি সঠিক প্রতিমূর্তি তৈরী করতে পারেন সে জন্যই

এ অনুরোধ করা হয়। স্বর্গলোক থেকে বুদ্ধ যখন ফিরে এলেন তখন কাঠের মূর্তিটি উঠে দাঁড়িয়ে জগৎপতিকে প্রণাম করলো। জগৎপতি বুদ্ধ তখন তাকে লক্ষ্য করে করুণামাখা কণ্ঠে বললেন—'বিধর্মীদের মত পরিবর্তন করিয়ে ভবিষ্যতকালে তাদের ধর্মের পথে চালিত করাই হবে তোমার একমাত্র কাজ। শুধু এই আশাই আমি তোমার কাছ থেকে করি।'

এই বিহারের পূর্বদিকে ১০০ পায়ের মতো গেলে বিগত চার বুদ্ধের বসা ও চলাফেরার পদচিহ্ন দেখা যাবে। এর পাশে, অল্প খানিকটা এগিয়ে তথাগতের ব্যবহৃত একটি কুয়া ও স্নানের ঘর আছে কুয়াটিতে এখনো জল আছে, কিন্তু স্নানের ঘরটি অনেককাল আগেই নষ্ট হয়ে গেছে।

নগরের ভিতরে দক্ষিণ-পূব কোণে একটি পুরোনো বসতবাড়ির অবশেষ আছে। এটিই অভিজাত ঘোশিরের বসত ভিটে। এর মাঝে একটি বুদ্ধ-বিহার রয়েছে। চুল ও নখকণার একটি স্তূপও আছে। এখানেও বুদ্ধের স্নানঘরের অবশেষ রয়েছে।

নগরের উত্তর-পূবে অল্প খানিকটা গেলে একটি পুরোনো সংঘারাম চোখে পড়বে। এখানে আগে ঘোশিরের বাগান ছিল। এখানে রাজা অশোকের গড়া একটি স্তূপ দেখলাম। এটি ২০০ ফুটের মতো উঁচু। বুদ্ধের চুল ও নখকণার একটি স্তূপও আছে।

সংঘারামের দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটি দোতালা বুরুজের উপরে একটি ইটের তৈরী পুরোনো ঘর আছে। এখানে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব বাস করতেন। এই ঘরে বসে তিনি বিদ্যামাত্র সিদ্ধি শাস্ত্রবইটি রচনা করেন। এ বইতে তিনি হীনযান ও ভিন্ন-ধর্মীদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন।

সংঘারামটির পূর্বদিকে, আমবনানীর মধ্যে একটি পুরোনো ভিটে দেখা যায়। এখানে অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব 'হিন-যাঙ-শিঙ-কিয়াউ' শাস্ত্রবইটি লেখেন।

নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ৮-৯ লি মতো যাবার পর এক বিষধর নাগের আবাস দেখা যাবে। এই নাগরাজকে বশ করে তথাগত এখানে তার ছায়া রেখে যান। স্থানটি সম্পর্কে এরকম প্রবাদ চালু থাকলেও এখানে ছায়ার কোন চিহ্নবর্ণ দেখলাম না।

এর পাশে রাজা অশোকের গড়া দুশো ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ চোখে পড়লো। কাছে বুদ্ধদেবের চলাফেরার চরণ-চিহ্ন রয়েছে। চুল ও নখকণার স্তূপও একটি রয়েছে।

শাক্যের ধর্ম যখন লোপ পাবে তখন এই একটিমাত্র দেশেই তা টিঁকে থাকবে। এজন্য শাক্য বুদ্ধের অনুগামী ছোট বা বড়ো যে-ই এ দেশে আসে তার হৃদয় গভীর আবেগে উতল হয়ে ওঠে, চোখ জলে ভরে আসে, তাড়াতাড়ি ফিরে চলে যায়।

নাগ-আবাসের উত্তর-পূবে একটি বিরাট অরণ্য রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ৭০০ লি মতো পথ চলার পর আমরা গঙ্গা পার হলাম। তারপর উত্তরমুখো গিয়ে 'কিয়া-শি-পো-লো' বা কশপুর শহর পেলাম। এটির আয়তন দশ লি মতন। অধিবাসীরা ধনী ও সচ্ছল।

শহরটির কাছে একটি সংঘারাম ছিল। এখন তার বনিয়াদটুকুই মাত্র টিঁকে আছে। ধর্মপাল বোধিসত্ত্ব এখানে বিধর্মীদের মতবাদ খণ্ডন করেছিলেন।

এর পাশে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ আছে। এর দেয়ালগুলিতে ভাঙন ধরেছে। তবু এখনো এটি ২০০ ফুটের মতো উঁচু। চুল ও নখকণার একটি স্তূপও রয়েছে।

॥ ৩২ ॥ 'পি-সো-কিয়' বা বিশাখা

এবার উত্তর দিকে পথ চলা শুরু করলাম। ১৭০ থেকে ১৮০ লি পার হবার পর 'পি-সো-কিয়' বা বিশাখা রাজ্যে এলাম।

বিশাখা রাজ্যটির বিস্তার প্রায় চার হাজার লি মতো। রাজধানীর ঘের ১৬ লির কাছাকাছি। এখানে খাদ্যশস্যের প্রচুর ফলন হয়। ফুল আর ফলেরও ছড়াছড়ি। লোকেরা সাধু ও সৎ। জ্ঞানচর্চার দিকে বেশ উৎসাহ ও যত্ন রয়েছে। পুণ্য অর্জনের দিকেও অশেষ চেষ্টা রয়েছে।

এখানে কুড়িটির মতো সংঘারাম আছে। সেখানে তিন হাজারের মতো ভিক্ষু থাকেন। তারা সম্মতীয় শাখানুসারে হীনযানের অনুগামী। দেবমন্দির পঞ্চাশটির কাছাকাছি। সেখানে অসংখ্য বিধর্মীর বাস।

শহরের দক্ষিণ দিকে, রাস্তার বাঁ পাশে একটি বড়ো সংঘারাম আছে। অর্হৎ দেবশর্মা এখানে বসে বিজ্ঞানকায় শাস্ত্রবইটি লেখেন। এই বইতে তিনি দেখান যে ব্যক্তিরূপে 'আমি'র অস্তিত্ব নেই।

অর্হৎ গোপ এখানে থেকে 'শিঙ-কিয়াউ-ইউ-শিহ-লুন' বইটি লেখেন। সে বইতে তিনি দেখান যে ব্যক্তি হিসাবে 'আমি'র অস্তিত্ব রয়েছে।

এই মতবাদ বিরাট তর্ক-বিতর্কের ঝড় তোলে। আবার, ধর্মপাল বোধিসত্ত্ব এখানেই সাতদিনকাল থেকে হীনযানের শত (১০০) আচার্যকে পরাজিত করেন।

সংঘারামটি পাশে দু'শো ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ চোখে পড়লো। এটি রাজা অশোকের তৈরী। এই স্তূপটির পাশে একটি আশ্চর্য গাছ আছে। এটি মাত্র ৬ বা ৭ ফুট উঁচু। বহু বছর ধরে এটি ওই এক অবস্থায় আছে—একটুও বাড়েনি বা কমেনি। অতীতে, দাঁত পরিষ্কার করে তথাগত একবার এখানে তাঁর দাঁতনের টুকরোটি

ফেলে দেন। সেটি শিকড় ছড়িয়ে ডালপালা মেলে। এটিই সেই গাছ। অন্যধর্মী ও ব্রাহ্মণরা মিলে এটিকে প্রায়ই কেটে ফেলে। কিন্তু আবার এটি আগের মতো গজায়।

এই জায়গাটি থেকে অল্প একটুখানি গেলেই একটি জায়গায় বিগত চার বুদ্ধের বসা ও চলা ফেরার নিদর্শন রয়েছে। চুল ও নখকণার একটি স্তূপও আছে।

এখানে একের পর এক সার সার স্মারক মন্দির রয়েছে। যেদিকে যাও, যেখানে যাও এই একই দৃশ্য চোখে পড়বে। হ্রদের বুকে তাদের ছায়া ঝিলমিল করে, ঘন বনানীর মধ্যেও তারা তাদের ছায়া ফেলে খাড়া হয়ে আছে।

॥ ৩৩ ॥ শি-লো-ফু-শি-তি বা শ্রাবস্তী

বিশাখা থেকে এবার উত্তর-পূব দিকে যাত্রা করলাম। ৫০০ লির কাছাকাছি পথ ভাঙার পর 'শি-লো-ফু-শি-তি' বা শ্রাবস্তীতে এসে হাজির হলাম।

শ্রাবস্তী রাজ্যটির আয়তন ৬০০০ লির কাছাকাছি। প্রধান শহরটি জনমানব বর্জিত। এটির আয়তন যে কত সে বিষয়ে তথ্য না থাকায় তা আর জানা গেল না। শহরের রাজপুরী অঞ্চলটির ঘের দেয়ালের যে ভাঙা চিহ্ন রয়েছে তার মাপ প্রায় ২০ লি হবে। এই অঞ্চলটির পুরোটাই বলতে গেলে এখন ভগ্নস্তূপ। সামান্য কিছু বাসিন্দা এখনো সেখানে রয়েছে।

এ দেশটিতে খাদ্য শস্যের অঢেল ফলন। আবহাওয়া স্নিগ্ধ ও মনোরম। লোক-জনের হাবভাব, স্বভাব-চরিত্র সৎ ও নির্মল। জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা রয়েছে। ধর্ম-কর্মের দিকে অনুরাগ আছে।

কয়েকশো সংঘারাম আছে এ রাজ্যটিতে। তবে বেশির ভাগই এখন ভাঙাচোরা। নামমাত্র কিছু অনুগামী আছে। তারাও আবার হীনযানের সম্মতীয় শাখার উপাসক। দেব মন্দির ১০০টি। অনুগামীদের সংখ্যাও অতি বিরাট।

তথাগত বুদ্ধের সময়ে এ রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রসেনজিত। রাজকীয় শহরের পুরোনো বসতি মধ্যে কিছু পুরোনো ভিতের অবশেষ দেখলাম। এগুলিই রাজা প্রসেনজিতের রাজপ্রাসাদের শেষ নিদর্শন।

এখান থেকে অল্প কিছুটা দূরে পূবদিকে একটি ভাঙাচোরা ভিত দেখা গেল। এর উপরে একটি ছোট স্তূপ তোলা হয়েছে। এই ভাঙা ভিতটিই এককালে সদ্ধর্ম মহাকক্ষ (সদ্ধর্ম মহাশালা) ছিল। বুদ্ধদেবের জন্য রাজা প্রসেনজিত এটি তৈরী করে দিয়েছিলেন।

সদ্ধর্ম মহাকক্ষ থেকে একটুখানি এগিয়ে গেলে একটি ধ্বংসাবশেষ। তার উপরেও একটি স্তূপ বানান হয়েছে পরে। বুদ্ধদেবের মাসী প্রজাপতি ভিক্ষুণীর জন্য রাজা

প্রসেনজিত যে বিহারটি বানিয়ে দিয়েছিলেন সেটি এখানেই ছিল।

আরো পূবে এগিয়ে গেলে একটি স্তূপ চোখে পড়বে। এখানে সুদত্তের আবাস ছিল। স্তূপটি এখন তারই স্মারক।

সুদত্তের ভিটের পাশে একটি বড় স্তূপ আছে। অঙ্গুলিমালা এখানেই তাঁর অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ ছেড়ে বৌদ্ধ ধর্মের শরণ নেন। অঙ্গুলিমাল্য সম্প্রদায় শ্রাবস্তীর এক নিন্দিত অপরাধী গোষ্ঠী ছিল।

শহরের দক্ষিণে ৫ বা ৬ লি মতো গেলে জেতবনের দর্শন পাওয়া যাবে। এখানেই রাজা প্রসেনজিতের প্রধান মন্ত্রী অনাথপিন্ডদ, যাঁর মূল নাম সুদত্ত, বুদ্ধদেবের জন্য একটি বিহার বানিয়ে দেন। আগে এখানে একটি সংঘারাম ছিল। এখন শুধু তার ভাঙাচোরা কাঠামোটাই পড়ে আছে।

পূব ফটকের ডাইনে-বাঁয়ে দু'দিকে দু'টি ৭০ ফুট খাড়া স্তম্ভ বানানো হয়েছে। বাঁদিকের স্তম্ভের নিচে একটি চক্র খোদাই করা। ডানদিকের স্তম্ভের মাথায় একটি ষাঁড়ের মূর্তি। দু'টিই রাজা অশোকের তৈরী। ভিক্ষুদের আবাস পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেবল ভিতটুকুই যা পড়ে আছে। ব্যতিক্রম বলতে শুধু একটি ইটে গাঁথা বাড়ি। পুরো ভাঙা-চোরা পরিবেশের মধ্যে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে বুদ্ধদেবের একটি মূর্তি বুকে নিয়ে।

পুরাকালে তথাগত যখন মায়ের কাছে ধর্ম ব্যাখ্যানের জন্য তেত্রিশতম স্বর্গে যান তখন রাজা উদয়ন যে চন্দন কাঠ দিয়ে বুদ্ধদেবের একটি মূর্তি বানান একথা আগেই বলেছি। রাজা প্রসেনজিতের কানে সে খবর এলে তিনিও একটি মূর্তি গড়েন। প্রসেনজিতের গড়া সেই মূর্তিটিই এই।

অভিজাত সুদত্ত একজন মানবিক হৃদয়সম্পন্ন প্রতিভাবান লোক ছিলেন। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ রোজগার করেন। আবার উদারভাবে দানও করতেন। তিনি গরীব ও সহায়-সম্বলহীন লোকদের সাহায্য দিতেন। অনাথ ও অথর্বদের প্রতিও তাঁর গভীর মমতা ছিল। তাঁর এই সব মহৎ গুণের জন্য তাঁর গুণমুগ্ধরা তাঁকে অনাথ-পিন্ডদ নাম দেয়। বুদ্ধদেবের ধর্ম-প্রতিভার জন্য তিনি তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন ও একটি বিহার বানিয়ে দেবেন বলে সংকল্প করে। এ দান গ্রহণের জন্য বুদ্ধকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন। সারিপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধ শ্রাবস্তী এলেন। বিহারের জন্য নানা জায়গা দেখার পর জেত রাজার এই উদ্যানটি তাঁদের পছন্দ হলো। বিহার গড়ার জন্য রাজা যাতে জমিটি দেন সেজন্য তাঁকে অনুরোধ জানাতেও তাঁরা রাজি হলেন। রাজা শুনে ব্যঙ্গ করে বললেন যদি ভূমির আয়তনের সমান স্বর্ণখন্ড

দেন তবে আমি এটি বেচতে রাজী।

সুদত্ত সে কথা শুনে সানন্দে রাজী হলেন। সর্ত পূরণের জন্য কোষাগার থেকে স্বর্ণখণ্ড এনে ভূমির উপর বিছিয়ে দিলেন। এ সত্বেও অল্প একটুখানি জায়গা ফাঁকা থাকল। রাজা বললেন, এটুকু কম হলেও চলবে। কিন্তু সুদত্ত বললেন 'বুদ্ধের ধর্ম সঠিক, আমিও এখানে সঠিক বীজ রোপণ করতে চাই।' শেষে সেই ফাঁকা জায়গাটিতেই তিনি বিহার গড়েন।

বুদ্ধদেব আনন্দকে বললেন—এখানকার গাছপালা 'জেত' রাজার দেয়া। আর জমি দিয়েছে সুদত্ত। দুজনেই মহান, দুজনেই সমান ধার্মিক। সেই থেকে একে জেতবন ও অনাথপিণ্ডদের বাগান দুই-ই বলা হতো।

এ বাগানের উত্তর-পূব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে দু'টি স্তূপ আছে। খানিক দূরে একটি কুয়া।

তথাগত এই কুয়াটির জল ব্যবহার করতেন। এর পাশে রাজা অশোকের গড়া একটি স্তূপ। এতে বুদ্ধদেবের দেহাস্থি রাখা আছে। এখানে অনেকগুলি জায়গা রয়েছে—যেখানে তথাগতের চলাফেরা ও ধর্ম ব্যাখ্যানের স্মৃতি চিহ্ন বর্তমান। এ দুই স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজা (অশোক) একটি স্তম্ভ ও এই স্তূপটি গড়ে গেছেন। এই স্থানটিকে ঘিরে যেন এক বিস্ময় ও রহস্য-মহান পরিবেশ বিরাজমান।

অনাথপিণ্ডদের বিহারটির পিছন দিকে একটুখানি এগিয়ে গেলে একটি জায়গা চোখে পড়বে। বুদ্ধের উপর নারী হত্যার কলঙ্ক চাপাবার জন্য ব্রাহ্মণরা ষড়যন্ত্র ক'রে এখানে একজন বারবনিতাকে হত্যা ক'রে মাটির নিচে পুঁতে রাখে।

সংঘারামটির (=বিহারটির) পূবদিকে একশো পা মত এগিয়ে গেলে একটি গভীর খাত দেখা যায়। বুদ্ধদেবকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করার দরুন দেবদত্ত এখান থেকে নরকগামী হন। ইনি ছিলেন দ্রোণোদন রাজার ছেলে।

এর দক্ষিণদিকে আরো একটি বিরাট খাত রয়েছে। এখানে কুলাকী ভিক্ষুণী বুদ্ধদেবকে অপবাদ দেবার পাপে জীবন্ত নরকগামী হয়।

কুলাকী খাতের দক্ষিণে ৮০০ পায়ের মত যাবার পর আর একটি বেশ বড়ো আর গভীর খাতের দেখা পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণ কন্যা চনশ্চা পেটে কাঠ বেঁধে নকল গর্ভবতী সেজে তথাগতের উপর কলঙ্ক আরোপ করতে গিয়ে এখান থেকে জীবন্ত নরকে যায়।

এই তিনটি খাত ভয়ানক গভীর। গ্রীষ্ম ও শরৎকালের বন্যায় সব হ্রদ ও পুকুর যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে তখনো এই খাত-তিনটিতে জল জমার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

জেতবনের অনাথপিণ্ডদ সংঘারামটি থেকে ৬০-৭০ পা হেঁটে গেলে ৬০ ফুটের মতো উঁচু একটি বিহার দেখা যাবে। এখানে পূবমুখী হয়ে বসে থাকা ভঙ্গিমায় বুদ্ধদেবের একটি মূর্তি রয়েছে। বুদ্ধদেব তাঁর জীবদ্দশাকালে এখানে বিধর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এটি থেকে আরো পূবে এই বিহারটির সমান আকারের একটি দেবমন্দির আছে। সূর্য্য ওঠার আগে এ মন্দিরের ছায়া বিহারের গায়ে পড়ে না, অথচ অস্তকালে বিহারটির ছায়া দেবমন্দিরটিকে ঢেকে ফেলে।

এই বিহারটি থেকে পূব দিকে তিন-চার লি মতো গেলে একটি স্তূপ দেখা যাবে। এখানে সারিপুত্র বিধর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। রাজা জেত-এর বাগানটি সুদত্ত যখন বুদ্ধদেবকে বিহার করে দেবার জন্য প্রথম কেনেন, তখন সারিপুত্র তাঁর পরিকল্পনা পরিদর্শন ও রূপায়নে সাহায্য করার জন্য তাঁর (সুদত্ত) সঙ্গে এখানে আসেন। এ সময়ে ৬ জন বিধর্মী আচার্য তাঁকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাচ্যুত করতে উদ্যোগী হয়। সারিপুত্র যুক্তির দ্বারা তাদের বশ করেন। এই স্তূপের পাশে একটি বিহার আছে। বিহারটির ঠিক সামানেই একটি স্তূপ তোলা হয়েছে। এখানে তথাগত বুদ্ধ বিধর্মীদের (ধর্ম-বিতর্কে) পরাস্ত করেন ও (একটি বিহার বানিয়ে দেয়া নিয়ে) বিশাখার প্রস্তাবে মত দেন।

ওই বিহার ও স্তূপের দক্ষিণ দিকে গেলে বিরূধক রাজা শাক্যদের হত্যা করার জন্য যেখানে সৈন্য সমাবেশ করেন সেই জায়গাটির দেখা পাওয়া যাবে। পরে বুদ্ধদেবকে দেখে তিনি তাঁর সব সৈন্য সরিয়ে নেন।

সৈন্য সমাবেশের জায়গাটির পাশেই একটি স্তূপ আছে। এখানেই শাক্য মেয়েদের মেরে ফেলা হয়েছিল। বিরূধক রাজা শাক্যদের পতন ঘটিয়ে তার জয়ের নিদর্শনরূপে ৫০০ শাক্য মেয়েকে নিজের মহলে নিয়ে আসেন। রাগে ও ঘৃণায় মেয়েরা জানাল যে তারা রাজাকে মোটেও মানবে না। তারা রাজাকে গালাগালি করে মহলের মধ্যে বিশৃঙ্খলার ঝড় তোলে। রাজা রেগে গিয়ে সকলকে মেরে ফেলার আদেশ দেন। আদেশ মতো এই শাক্য মেয়েদের সবাইকে হাত-পা কেটে খাতের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়।

শাক্য মেয়েদের হত্যার স্মারক স্তূপটির পাশে একটি বড় হ্রদ আছে। এটি এখন পুরোপুরি শুকনো। এখানেই বিরূধক রাজা সশরীরে নরকগামী হন।

সংঘারামটি থেকে তিন-চার লি উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলে আমরা আপ্তনেত্র বনে এসে পোঁছাই। তথাগতের নিয়মিত ভ্রমণ ও চলাফেলার নিদর্শনাদি এখানে রয়েছে। এছাড়া আরো অনেক পবিত্র পুরুষ এখানে গভীর সাধনা করে গেছেন। এই সব স্থানে কোথাও বা বিবরণ খোদাই করা স্তম্ভ, কোথাও বা স্তূপ গড়ে তোলা হয়েছে।

রাজধানী থেকে ১৬ লির মতো উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি পুরোনো শহর রয়েছে। যে কালে প্রত্যেক মানুষ ২০,০০০ বছর বেঁচে থাকতো, ভদ্রকল্পের সেই যুগে কাশ্যপ বুদ্ধ এই শহরে জন্মেছিলেন। শহরের দক্ষিণ ভাগে একটি স্তূপ আছে। এখানেই বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রথম কাশ্যপ বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর পিতার দেখা হয়।

এই শহরের উত্তর ভাগে একটি স্তূপ চোখে পড়বে। এটিতে কাশ্যপ বুদ্ধের পুরো দেহাবশেষ রাখা হয়েছে। এ দু'টি স্তূপই রাজা অশোক বানিয়ে গেছেন।

॥ ৩৪ ॥ 'কিএ-পি-লো-ফ-সু-সে-তি' বা কপিলাবস্তু

কাশ্যপ বুদ্ধের জন্মস্থান থেকে এবার দক্ষিণ-পূব দিকে যাত্রা করা হলো। ৫০০ লির মত পথ ভাঙবার পর 'কিএ পি-লো-ফ সু-সে-তি' বা কপিলাবস্তু এসে পেঁছিলাম।

এদেশটির বিস্তার চার হাজার লির কাছাকাছি। এখানে দশটি জন-মানবহীন শহর চোখে পড়লো। এগুলি পুরোপুরি জন-বসতি শূন্য ও ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। রাজধানীটিও তার রাজধানীর গৌরব খুইয়ে ভেঙেপড়া চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আয়তন কত তা সঠিকভাবে মাপার উপায় নেই। শহরের মধ্যে থাকা রাজপুরীর ঘের ১৪ থেকে ১৫ লি হবে। সেটি পুরোপুরি ইট দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। দালানগুলির ভিত এখনো বেশ মজবুত আর উঁচু। অনেক কাল ধরে এখানে কোন মানুষজন বাস করে না। বসতি থাকা গ্রাম মাত্র গুটিকয়েক। তাও হতশ্রী চেহারা।

এ রাজ্যে কোন সর্বোচ্চ শাসক নেই। প্রত্যেকটি শহরেই আলাদাভাবে নিজ নিজ শাসনকর্তা রয়েছে। জমি সরস ও উর্বরা। ঋতু অনুসারে নিয়মমাফিক চাষ-আবাদের কাজ হয়। আবহাওয়ার মধ্যে সমতার ভাব রয়েছে। মানুষজনের স্বভাব-চরিত্র, চালচলন বেশ বিনীত ও ভদ্র।

সারা দেশ জুড়ে এক হাজার কি তারো বেশি সংঘারাম আছে। প্রায় সবগুলিই ভাঙাচোরা বা ভাঙো-ভাঙো অবস্থায় এসে ঠেকেছে। রাজ বসতির পাশে এখনো একটি সংঘারাম টিঁকে আছে জনতিরিশেক ভিক্ষু নিয়ে। এরা সকলেই হীনযানের সম্মতীয় শাখার উপাসক।

দু'টি দেবমন্দির আছে। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামীরা বসবাস ও সাধন-ভজন করেন। রাজবসতির মধ্যে কয়েকটি ভাঙাচোরা দালানের ভিত আছে। এগুলি রাজা শুদ্ধোদনের মূল রাজপ্রাসাদের অবশেষ। এই ভিতের ওপর একটি বিহার গড়ে তোলা হয়েছে। তাতে রাজা শুদ্ধোদনের মূর্তি আছে। এর অদূরে

একটি দালানের ধ্বসে পড়া ভিত। এইটাই এককালে রাণী মহামায়ার শোবার মহল ছিল। এখানেও একটি বিহার গড়া হয়েছে। তাতে রাণীর প্রতিমূর্তি রাখা আছে।

পাশে আর একটি বিহার। এখানেই বোধিসত্ত্ব আধ্যাত্মিক ভাবে মাতৃগর্ভে প্রবেশের জন্য অবতরণ করেন। বিহার মধ্যে তারই দৃশ্য আঁকা রয়েছে। মহাস্থবির শাখার অনুগামীরা বলেন, বোধিসত্ত্ব উত্তরাষাঢ়া মাসের তিরিশ তারিখের রাতে গর্ভে সঞ্চারিত হয়েছিলেন। আমাদের চীনা পঞ্জিকা অনুসারে এ ঘটনাকাল পঞ্চম মাসের পনেরো তারিখ। অন্যান্য শাখার অনুগামীরা এই ঘটনার কাল এই একই মাসের ২৩ তারিখ বলে ধরে। আমাদের পঞ্জিকা অনুসারে পঞ্চম মাসের ৮ তারিখ।

গর্ভাধান মহল থেকে উত্তর-পূব দিকে একটি স্তূপ আছে। অসিত ঋষি এখানে এসেই রাজকুমার সম্পর্কে ভবিষ্যত-বাণী করেন।

শহরের দক্ষিণ ফটকে একটি স্তূপ দেখলাম। এখানেই রাজকুমার অন্য শাক্য কুমারদের সঙ্গে শিল্পকলা প্রতিযোগিতা থেকে ফেরার পথে দেবদত্তের মারা হাতিটিকে দেখেন। হাতিটির মৃতদেহ সরিয়ে সকলের যাতায়াতের পথ করে দেবার জন্য সেটিকে তুলে ওই সময়ে তিনি শহরের পরিখা মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেন। হাতিটির দেহ মাটিতে সজোরে পড়ার জন্য যে গভীর ও বড়ো গর্তটি সৃষ্টি হয় তাকে সেকাল থেকেই লোকেরা 'হাতি খাত' (হস্তীগর্ত্ত) বলে আসছে।

এর পাশেই একটি বিহার আছে। এটিতে রাজকুমারের মূর্তি রয়েছে। পাশে আবার আরেকটি বিহার। এখানে রাজবধূ ও রাজকুমারের শোবার মহল ছিল। এই বিহারে যশোধরা ও রাহুলের প্রতিকৃতি রয়েছে। রাজবধূ মহলের পাশে একটি বিহার আছে। তাতে পাঠরত একটি ছাত্রের মূর্তি রয়েছে। এটি রাজকুমারের বিদ্যালয় গৃহের অবস্থান ক্ষেত্রের স্মারক।

শহরের দক্ষিণ-পূব কোণে একটি বিহার দেখলাম। এখানে উঁচু লাফ দেয়া একটি সাদা ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায় রাজকুমারের মূর্তি রয়েছে। এখান থেকেই তিনি শহর ছেড়ে চলে যান। শহরের চার ফটকের বাইরে একটি ক'রে বিহার রয়েছে। তাতে যথাক্রমে একজন জরাগ্রস্ত, একজন মৃত ও একজন সন্ন্যাসীর মূর্তি আছে। শহরে ঘুরে বেড়ানোর সময় এই জায়গাগুলিতে রাজকুমার এদের দেখেন। এথেকেই পার্থিব ভোগ-বাসনার দিকে তার মনে বিরাগ দেখা দেয় ও সত্য-অন্বেষণের গভীর বাসনা জাগে।

শহর থেকে পঞ্চাশ লি মতো দক্ষিণ দিকে পথ চলার পর একটি পুরোনো শহরের দেখা পেলাম। এখানেও একটি স্তূপ আছে। ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ এই স্থানটিতেই জন্ম

নিয়েছিলেন। সে হলো ভদ্রকল্পের কথা। সে যুগে লোকেরা ৬০,০০০ বছর বাঁচতেন।

শহর থেকে একটুখানি এগিয়ে দক্ষিণে একটি স্তূপ আছে। বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রথম এখানেই ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর পিতার দেখা হয়।

শহরের দক্ষিণ-পূব দিকে একটি স্তূপ দেখা যাবে। এখানে তথাগত বুদ্ধের দেহাবশেষ রাখা হয়েছে। স্তূপটির সামনে ৩০ ফুটের মতো খাড়া একটি স্তম্ভ। তার মাথায় একটি সিংহমূর্তি খোদাই করা। এর পাশে বুদ্ধের নির্বাণ লাভ বিবরণ লেখা একটি খোদাই লিপি রয়েছে। এটি রাজা অশোকের কীর্তি।

শহরের উত্তর-পূবে ৩০ লি মতো যাবার পর আমরা আর একটি পুরোনো রাজধানী শহরে পেঁছিলাম। এখানে ভদ্রকল্পে কনকমুনি বুদ্ধ জন্ম নিয়েছিলেন। সে সময়ে লোকেরা ৪০,০০০ বছর বাঁচতেন। তাঁর জন্মস্থানটিকে চির-স্মরণীয় করে রাখার জন্য সেখানে একটি স্তূপ গড়া হয়েছে।

এই শহরের উত্তর-পূব দিকেও একটি স্তূপ আছে। বুদ্ধত্ব লাভের পর কনকমুনির সঙ্গে এখানে প্রথম তাঁর পিতার দেখা হয়।

আরো উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে একটি স্তূপের দেখা মিলবে। এই স্তূপটিতে কনকমুনির দেহাবশেষ রাখা আছে। সামনেই কুড়ি ফুট খানেক উঁচু একটি স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় সিংহের মূর্তি খোদাই করা। স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা রয়েছে তাঁর নির্বাণ বিবরণ। এটি রাজা অশোকের তৈরী।

শহরটির উত্তর-পূব দিকে ৪০ লি মতো যাবার পর একটি স্তূপ চোখে পড়বে। হলকর্ষণ উৎসব দেখার জন্য রাজকুমার এখা ন একটি গাছের নিচে বসেছিলেন। এখানে গভীর ভাবমগ্ন অবস্থায় বসে থাকার সময়েই তাঁর মধ্যে কামনার নিবৃত্তি ঘটে।

রাজধানীর উত্তর-পশ্চিম দিকে হাজার হাজার স্তূপের দেখা মিলবে। বিরুধক রাজা শাক্যদের জয় করার পর তাদের গোষ্ঠীর ৯৯৯ লক্ষ লোককে বন্দী করে তাদের কেটে মেরে ফেলার আদেশ দেন। এখানেই তাদের ওই ভাবে মেরে ফেলা হয়। স্তূপগুলি তারই স্মারক চিহ্ন।

এই নরমেধের জায়গাটি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে চারটি স্তূপ রয়েছে। এই জায়গাটিতে চারজন শাক্যবংশীয় বিরুধকের এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। প্রসেনজিত যখন প্রথম সিংহাসনে বসেন তখন তিনি শাক্যদের সঙ্গে বিবাহের বাঁধন দিয়ে মিতালি গড়ে তুলতে চান। অন্য বংশীয় হবার জন্য শাক্যরা তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতো। তাই এক দাস কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাঁকে তারা ঠকায়। এই কন্যা রাজা প্রসেনজিতের প্রধানা মহিষী হলেন। তার গর্ভে রাজার একটি পুত্র হলো।

ছেলের নাম রাখা হলো বিরূধক। সে এক সময়ে মামার বাড়ি এসে রথে চড়ে বেড়াবার সময়ে দক্ষিণ দিকে একটি নতুন তৈরী প্রচার মহাকক্ষ দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে সেখানে এলো। শাক্যরা সে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললো—'নিচজন্মা হয়ে তোমার এতো সাহস যে বুদ্ধের জন্য শাক্যদের তৈরী এই আবাসে তুমি এসেছ?'

বিরূধক রাজা হবার পর এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে এখানে এলেন। চারজন শাক্য এই সময়ে মাঠে লাঙ্গল চষছিল। তারা সৈন্যবাহিনী দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তাদের বাধা দিল এবং তাদের পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ করে শহরে ফিরে এলো। কিন্তু শাক্যরা তাদের বীরের সম্মান দিল না। যে বংশে দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীপতি (বুদ্ধ)-রা জন্ম নিয়েছেন সেই বংশের লোক হয়ে তারা এরূপ ক্রূর ও হিংসাত্মক কাজ করে শাক্যবংশের মুখে কালি মাখিয়েছে, এই মত প্রকাশ করে তারা তাদের শহর থেকে তাড়িয়ে দিল।

বিতাড়িত হয়ে এই চার শাক্য তুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা ঘেরা উত্তরাঞ্চলে চলে গেল। প্রত্যেকেই সেখানে এক একটি দেশের রাজা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। একজন বামিয়ান (Bamyan) দেশের, আর একজন উদ্যান দেশের, তৃতীয় জন হিমতাল দেশের ও চতুর্থ জন শাম্বি (কৌশাম্বী?) দেশের। তাদের বংশধরেরা সেখানে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করে চলেছে।

শহরের দক্ষিণ দিকে ৩ বা ৪ লি দূরে একটি বটকুঞ্জ মধ্যে রাজা অশোকের বানানো একটি স্তূপ আছে। বুদ্ধত্ব লাভের পর তাথাগত প্রথম যখন জন্মস্থানে ফিরে এলেন তখন সেখানে পিতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় ও সেখানেই তিনি ধর্ম ব্যাখ্যান করেন।

সংঘারামটি থেকে অল্প কিছু দূরে একটি স্তূপ আছে। এখানেই বুদ্ধ বিরাট একটি গাছের নিচে পূবমুখী হয়ে বসে তাঁর মাসী প্রজাপতির কাছ থেকে সোনার সুতো দিয়ে তৈরী কষায় পরিচ্ছদ গ্রহণ করেছিলেন। সেখান থেকে একটুখানি এগিয়ে গেলে আরেকটি স্তূপ। সেখানে বসে তথাগত আট রাজকুমার ও ৫০০ জন শাক্যকে আপন ধর্মে দীক্ষিত করেন।

শহরের পূব ফটকের ভেতর দিকে, রাস্তার বাঁ পাশে একটি স্তূপ রয়েছে। এই জায়গাটিতে সিদ্ধার্থ খেলাধুলা করতেন।

ফটকের বাইরের দিকে ঈশ্বর দেবের (মহেশ্বর?) মন্দির। দেব বিগ্রহটি পাথর দিয়ে তৈরী। মূর্তিটি নিচ থেকে উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গীতে গড়া। রাজকুমার যখন শিশু তখন তিনি এই মন্দিরটিতে আসেন। রাজকুমারকে দেখে শুদ্ধোধন তখন লুম্বিনী উদ্যান থেকে ফিরে আসছিলেন। মন্দিরটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন,

"এই মন্দিরটি নানা অলৌলিককতার জন্য বিখ্যাত। শাক্য শিশুরা এখানে এসে কোনরকম দৈবানুকুল্য প্রার্থনা করলে সব সময় তা পূরণ হতে দেখা যায়। রাজকুমারকে নিয়ে একদিন এসে পুজো দিতে হবে।" এই সময়ে কুমারের ধাই-মা তাঁকে নিয়ে মন্দির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। পাথরের মূর্তিটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে রাজকুমারকে প্রণাম জানালো। রাজকুমার চলে গেলে মূর্তিটি আবার বসে পড়লো।

শহরের দক্ষিণ দিকে রাস্তার বাঁদিকে একটি স্তূপ আছে। রাজকুমার অন্যান্য শাক্য কুমারদের সঙ্গে এখানে খেলাধুলো ও অস্ত্রশিক্ষা করতেন। এখানেই তিনি একদিন তাঁর ধনুঃশর দিয়ে লোহার তৈরী লক্ষ্য বস্তুটিকে ভেদ করেন।

এখান থেকে ৩০ লি মতো দক্ষিণ-পূর্বদিকে গেলে একটি ছোট স্তূপ নজরে পড়বে। এখানে একটি ঝরণা আছে। তার নির্মল জল আয়নার মতো স্বচ্ছ। ধনুক নিয়ে প্রতি-যোগিতাকালে কুমার যে তীর ছোঁড়েন সে তীরটি লোহার লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে এখানে এসে মাটিতে পালক পর্যন্ত বিঁধে যায়। আর তার ফলে মাটি ফুঁড়ে একটি ঝরণাধারা বইতে শুরু করে। এজন্য লোকেরা এটিকে 'শরকূপ' বলে। অসুস্থ লোকেরা এই ঝরণার জল পান করলে স্বাস্থ্য ফিরে পায়। বহু দূর থেকে লোকেরা এসে এখানকার কাদামাটি নিয়ে যায়। শরীরের কোথাও বেদনা বোধ করলে সেখানে এই মাটির প্রলেপ দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা সেরে ওঠে।

শরকূপের উত্তর-পূবে আশি-নব্বই লির মতো যাবার পর লুম্বিনী-উদ্যানের দর্শন মেলে। এখানেই শাক্যদের স্নানের পুকুরটি রয়েছে। তার জল টলটলে ও আয়নার মতো স্বচ্ছ। পুকুরের বুক নানারকম ফুলে ঢাকা।

এর উত্তরে ২৪-২৫ পা গেলে অশোক ফুল গাছ। এটি এখন আর নেই। এখানেই বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের ৮ তারিখ ছিল সেদিন। আমাদের চীনা পঞ্জিকা মতে বছরের তৃতীয় মাসের ৮ তারিখ। স্থবির শাখার অনুগামীদের মতে সে দিনটি ছিল বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের পনেরো তারিখ। আমাদের পঞ্জিকা অনুসারে তৃতীয় মাসের পনেরো তারিখ।

এর পূব দিকে, যেখানে দু'জন নাগ রাজকুমারকে স্নান করিয়ে দিয়েছিল সেখানে অশোক রাজা একটি স্তূপ বানিয়ে গেছেন।

এই স্তূপের পূর্বদিকে দু'টি স্বচ্ছ স্রোত বয়ে চলা প্রস্রবণ রয়েছে। তার পাশে দু'টি স্তূপ বানানো হয়েছে। এখানেই নাগ দু'টি মাটির নিচ থেকে উঠে এসেছিল। বোধিসত্ত্ব যখন জন্ম নেন তখন নবজাতকের জন্য জলের খোঁজে পরিচারিকা ও আত্মীয়-স্বজনেরা চারিদিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। এই সময় রাণীর ঠিক পাশে মাটি

ফুঁড়ে প্রস্রবণ দুটি দেখা দেয়। একটি ঠাণ্ডা জলের, আর একটি গরম জলের। এই জল দিয়ে নাগেরা নবজাতককে স্নান করিয়ে দিল।

প্রস্রবণ দু'টির দক্ষিণ দিকে গেলে একটি স্তূপ দেখা যাবে। এখানেই দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্ব জন্মাবার পর তাকে কোলে তুলে নিয়ে স্বর্গের তৈরী মনোরম পোষাক পরিয়ে দেন।

এর কাছেই চারিটি স্তূপ আছে। স্বর্গলোকের চার জন রাজা এখানে বোধিসত্ত্বকে কোলে নিয়েছিলেন।

এই স্তূপগুলির পর খানিকটা এগিয়ে একটি বড় পাথরের স্তম্ভ দেখা যাবে। তার ওপরে একটি ঘোড়ার মূর্তি রয়েছে এটি অশোক রাজার বানানো। পরবর্তীকালে একটি দুষ্ট নাগের দুরন্তপনায় এটি মাঝখান থেকে ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়। এর পাশ দিয়ে একটি ছোটনদী দক্ষিণ-পূব দিকে বয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেরা একে তেল নদী বলে। পুত্রের জন্মের পর রাণীর স্নানের জন্য দেবতারা এটিকে স্বচ্ছ ও (তেল) ঝলমলে জলে ভরা পুষ্করিণী রূপে গড়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে এটি একটি নদীর রূপ নিয়েছে। এর জল এখনো আগের মতো তেলতেলে।

॥ ৩৫ ॥ লান-মোঃরাম বা রামগ্রাম

লুম্বিনী থেকে এবার পূবদিকে চললাম। হিংস্র জন্তু জানোয়ার থাকা ঘন বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে এবার আমাদের পথ চলতে হলো। প্রায় তিনশো লি যাবার পর আমরা 'লান-মো' বা রামরাজ্যে এসে পেঁছিলাম।

এই রাজ্যটি বহুকাল চাষ-আবাদহীন ও জনমানব শূন্য অবস্থায় পড়ে ছিল। রাজ্যটির আয়তন ঠিক কিরূপ তার কোন হিসাব নেই। শহরগুলির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। অধিবাসীর সংখ্যা সামান্য।

পুরোনো রাজধানী থেকে দক্ষিণ-পূব দিকে ইট দিয়ে বানানো একটি স্তূপের দেখা পেলাম এটি একশো ফুটের মতো উঁচু। পুরাকালে বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের পর, এখানকার রাজা তার দেহাবশেষের ভাগ পান। তা সসম্মানে নিজ রাজ্যে নিয়ে এসে এই স্তূপটি বানিয়ে এর মধ্যে রেখে দেন।

এই স্মারকটির পাশেই একটি স্বচ্ছ জলাধার রয়েছে। কাছেই একটি খোদাই লিপি।

এই স্তূপটির পরিবেশ থেকে অল্প দূরে একটি সংঘারাম দেখতে পেলাম। নামমাত্র কয়েকজন ভিক্ষু সেখানে। তাদের আচার-আচরণ মনে সম্ভ্রম জাগায়। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে তারা নিখুঁত। মাত্র একজন 'শ্রমণের' সংঘের সমস্ত কাজ একা

দেখাশোনা করেন। দূর দেশ থেকে কোন ভিক্ষু এলে তাকে পরম সৌজন্য ও উদারতার সঙ্গে আদর আপ্যায়ণ করা হয়। তিনদিনকাল তারা তাকে সংঘের অতিথিরূপে রাখে ও প্রয়োজনীয় চতুর্বিধ জিনিষই জোগায়।

এই সংঘারামটি থেকে পূর্বদিকে ১০০ লি মতো গেলে একটি বিরাট অরণ্য মধ্যে রাজা অশোকের বানানো একটি স্তূপ দেখা যাবে। সারথিকে বিদায় দিয়ে এখান থেকেই যুবরাজ (সিদ্ধার্থ) অনিত্যতার হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে যাত্রা করেন।

স্তূপের পূর্বদিকে, যেখান থেকে সারথি চন্ডক ফিরে গিয়েছিল সেখানে একটি জাম গাছ আছে। এটির পাতা, ডালপালা সব নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু গুঁড়িটি এখনো খাড়া দাঁড়িয়ে। এর পাশে একটি ছোট স্তূপ আছে। এখানে যুবরাজা তাঁর মূল্যবান রাজ পোষাক ও আভরণ ছেড়ে মৃগচর্ম পরিধান করেন।

এই স্তূপটি থেকে অল্প একটুখানি দূরে রাজা অশোকের গড়া আরেকটি স্তূপ দেখা যাবে। এখানে রাজপুত্র তাঁর মাথার চুল কামিয়ে ফেলেন।

রাজকুমার কোন বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন তা ঠিক ভাবে জানা যায় না। কেউ বলে তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর ছিল। কেউ বলে ২৯ বছর। দিনটি বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের ৮ তারিখ। আমাদের চীনা পঞ্জিকা মতে তৃতীয় মাসের ১৫ তারিখ।

মাথা কামানোর স্মারক স্তূপটি থেকে দক্ষিণ-পূব দিকে ১৮০ থেকে ১৯০ লি মতো পথ ভাঙার পর একটি মরুভূমির মাঝে আমরা একটি বটকুঞ্জে এসে হাজির হলাম। এখানে তিরিশ ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ রয়েছে দেখলাম। পুরাকালে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর যখন তাঁর দেহাবশেষ ভাগবাঁটোয়ারা হলো তখন ব্রাহ্মণেরা তার কোন ভাগ পেল না। তাই তারা দাহস্থলে এসে চিতার কাঠ কয়লা ও ছাই তাদের দেশে নিয়ে গেল। তার ওপরেই তারা এই স্তূপটি গড়ে পূজা অর্চ্চনা করে চলেছে।

চিতাভস্ম-স্তূপটির কাছে একটি পুরোনো সংঘারাম আছে।

তার ডাইনে বাঁয়ে কয়েকশো স্তূপ দেখা যাবে। এর মধ্যে একটি বড়ো স্তূপ। সেটি রাজা অশোকের বানানো। যদিও সেটির ভাঙা অবস্থা, তবু একশো ফুটের মতো উঁচু এখনো।

॥ ৩৬ ॥ 'কিউ-শি-ন-কি'য়ে-লো' বা কুশীনগর

এখান থেকে উত্তর-পূব দিকে এবার চলতে থাকলাম। বিরাট এক বনের মধ্য দিয়ে পুরোটা পথ যেতে হলো। এ পথ যে রীতিমত কন্টকর আর বিপদজনক তা নিশ্চয়ই

বুঝিয়ে বলার দরকার করে না। কোথাও বুনো ষাঁড়, কোথাও বা হাতির পাল। এর ওপর আবার ডাকাত আর শিকারীর দলও রয়েছে। এদের সকলের কাছ থেকেই যে কোন মুহূর্তে সমান বিপদের সম্ভাবনা। এই দুর্গম অরণ্য পার হবার পর আমরা 'কিউ শি-ন-কি'য়ে-লো' বা কুশীনগর পেঁছিলাম।

এদেশের রাজধানীটি বর্তমানে চাকচিক্যহীন ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। সব শহর আর গ্রামগুলিও প্রায় চাষ-আবাদ শূন্য ও জন-মানব বর্জিত। পুরোনো রাজধানীর ইটের ঘের-দেয়ালের মাপ ১০ লি মতন হবে। সামান্য কিছু জনবসতি রয়েছে। শহরের রাস্তাঘাট জনশূন্য, ভাঙাচোরা ও আবর্জনায় ভরা।

শহরের ফটকের উত্তর-পূব কোণে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ চোখে পড়লো। এটি চন্দের পুরোনো আবাস। এর মাঝখানে একটি কুয়া আছে। বুদ্ধকে খেতে দেবার সময় এটি সে খুঁড়েছিল। যদিও অনেক অনেক কাল পার হয়েছে তবু এখনো এর জল পরিষ্কার ও মিষ্ট।

শহরের উত্তর-পশ্চিমদিকে ৩ বা ৪ লি মতো গিয়ে অজিতবতী নদী পার হয়ে, নদীর পশ্চিম তীরে খানিকটা এগিয়ে যেতেই আমরা শালবনের দর্শন পেলাম। শাল গাছ দেখতে অনেকটা আমাদের হু (Huh) গাছের মতোই। সবুজাভ সাদা বাকল। পাতা তেল-তেলে মসৃণ। বনের মধ্যে চারিটি অসম্ভব উঁচু শাল গাছ আছে। তথাগত কোথায় মারা গেছেন এরাই সে কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

এখানে ইটে গড়া একটি বিরাট বিহার রয়েছে। তার মধ্যে বুদ্ধের নির্বাণ অবস্থার মূর্তি আছে। উত্তরদিকে মাথা রেখে তিনি শুয়ে আছেন—বুঝি বা ঘুমিয়ে আছেন। বিহারের কাছাকাছি অশোক রাজার তৈরী একটি স্তূপ। এটির এখন ভাঙা দশা। তবু এর উচ্চতা এখনো ২০০ ফুটের মতো। সামনে বুদ্ধের নির্বাণ বিবরণ লেখার জন্য গড়া পাথরের স্তম্ভ। তাতে বিবরণ খোদাই করা থাকলেও তার মধ্যে ঘটনার বছর মাস দিনের কোন উল্লেখ নেই।

চলতি মত অনুসারে বুদ্ধদেবের বয়স হয়েছিল তখন আশি বছর। বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের ১৫ তারিখ তিনি নির্বাণ লাভ করেন। চীনা পঞ্জিকা অনুসারে বছরের তৃতীয় মাসের ১৫ তারিখ। কিন্তু সর্বাস্তিবাদীরা বলেন যে এ দিনটি কার্তিক মাসের দ্বিতীয় পক্ষের ৮ তারিখ। চীনা পঞ্জিকা অনুসারে তাহলে বছরের নবম মাসের ৮ তারিখ। বুদ্ধের মৃত্যু কতো বছর আগে হয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠী সে কথা বিভিন্ন রকম বলে। কেউ বলে তাঁর মৃত্যুর পর ১২০০ বছরেরও বেশি পার হয়ে গেছে। কেউ বলে, ১৩০০ বছরেরও বেশি। আবার কেউ বলে, ১৫০০ বছরেরও

বেশি। কেউ কেউ আবার বলে যে ৯০০ বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু ১০০০ বছর ডিঙোয়নি।

বিহারটির কাছাকাছি দুটি স্তূপ। তার পশ্চিম দিকে একটুখানি গেলেই আবার একটি স্তূপ দেখা যাবে। এখানে সুভদ্র মারা যান। তিনি মূলতঃ ব্রাহ্মণ পন্ডিত ছিলেন। তাঁর তখন ১২০ বছর বয়স হয়েছিল। এরূপ দীর্ঘকাল বাঁচার দরুন তিনি অনেক জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ পান। বুদ্ধ মৃত্যুমুখে—এ সংবাদ পেয়ে তিনি শালবৃক্ষ দুটির কাছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এই সময়ে তিনি বুদ্ধের অনুগামী হন। আবার বুদ্ধের মৃত্যুর আগেই অর্হত্ব লাভ করে মারা যান। তাই তিনিই বুদ্ধের দ্বারা শেষ দীক্ষিত অথচ প্রথম নির্বাণ প্রাপ্ত শিষ্য।

সুভদ্রের নির্বাণ স্তূপের পাশে আর একটি স্তূপ আছে। এখানে বজ্রপাণি মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন। পরম করুণাময় জগৎপিতা বুদ্ধ, পৃথিবীর বুকে মানুষের মতি পরিবর্তনের কাজ শেষ করে দুটি শাল গাছের মাঝে নির্বাণের আনন্দলোকে প্রয়াণ করলেন। উত্তর দিকে মাথা রেখে তিনি সেখানে শেষ শয়ানে শায়িত হলেন।

বুদ্ধদেবকে মারা যেতে দেখে দেবোপম অথচ রহস্যভরা চরিত্রের মল্লরা হীরকদন্ড হাতে নিয়ে কান্নার আবেগে ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁরা বলতে থাকলেন—“তথাগত চির-কালের মতো আমাদের ছেড়ে মহানির্বাণ-লোকে চলে যাচ্ছেন। আমাদের পরম আশ্রয় আমরা হারাতে বসেছি। আমাদের বুক খানখান হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যথার আগুন কিছুতে নেভার নয়।” হীরকদন্ড ফেলে দিয়ে তাঁরা অনেকক্ষণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রইলেন। পরে উঠে বসে গভীর ব্যথা ও ভালবাসার আবেগ মাখা সুরে বলাবলি করতে থাকলেন —“জন্মমৃত্যুর অথৈ পারাবার কে এখন আমাদের তার নৌকা নিয়ে পার করবে। কে এবার আমাদের অজ্ঞানতার অপার তিমির মধ্যে আলোকশিখা দেখাবে।”

হীরকদন্ডগুলি মাটিতে যে জায়গায় ফেলা হয়েছিল সেখানে একটি স্তূপ গড়া হয়েছে। বুদ্ধ মারা যাবার পর সাতদিন ধরে মল্লরা এখানে তাঁর মরদেহ পুজা-অর্চ্চনা করেন।

তথাগতের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে চারিদিক এক পরম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মানুষ ও দেবতা সবাই এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। নিজেদের মধ্যে তাঁরা বলাবলি করতে থাকলেন—“জগৎ পিতা মহান বুদ্ধ এবার মহাপ্রয়াণে চলেছেন। মানুষের সুখ শান্তি এবার গেল। নির্ভর করার মতো জগতে কেউ আর রইলো না।” একথা শুনে তথাগত তাঁর বিছানায় ডান পাশ ফিরে বিরাট সমাবেশের দিকে তাকিয়ে বললেন—“মারা যাচ্ছি বলে একথা বলোনা যে তথাগত চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছে।

ধর্ম-শরীর অমর। অপরিবর্তনীয়। সব আলস্য ত্যাগ করে বন্ধন মোচনের সাধনা কর।"

তথাগত বুদ্ধ মারা গেলে ভিক্ষুরা গভীর শোকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চললেন। তাই দেখে দেবতারাও পাছে ভেঙ্গে পড়ে সেই ভয়ে অনিরুদ্ধ ভিক্ষুদের শোক করতে বারণ করলেন।

মল্লরা তাদের পূজা-অর্চ্চনা শেষ করে সোনার কফিনটিকে শ্মশান ঘাটে বয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন করলো। অনিরুদ্ধ তাদের থামিয়ে দিয়ে জানালেন যে দেবতারাও সাত দিন ধরে বুদ্ধের মরদেহ পূজা অর্চ্চনা করতে চান।

দেবতাগণ নানারকম স্বগীয় ফুল আঁজলে নিয়ে স্বর্গ থেকে বুদ্ধের মহিমা কীর্তন করে চললেন। সকলে অন্তর দিয়ে পূজার্ঘ নিবেদন করলেন।

যেখানে শবাধারটি আটকে দেয়া হয়েছিল সেখানে একটি স্তূপ বানান হয়েছে। এখানেই (স্বর্গ থেকে নেমে এসে বুদ্ধের মা) রাণী মহামায়া বুদ্ধের (মৃত্যু শোকে তাঁর) জন্য কেঁদেছিলেন।

শহরটির উত্তর দিকে নদী পার হয়ে তিনশো পা মতো গেলে একটি স্তূপ চোখে পড়বে। এই জায়গাটিতেই বুদ্ধের মরদেহ দাহ করা হয়। এখানকার মাটি এখন কালচিটে হলদে ধরনের। মাটি আর কাঠকয়লা মিশে এই রকমটি হয়েছে। কোন লোক সত্যিকারের বিশ্বাস নিয়ে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানিয়ে খুঁজলে এখনো এখানে অবশ্যই বুদ্ধের কোন না কোন পূতাস্থি পাবে।

বুদ্ধের দাহ স্থানটির কাছে একটি স্তূপ আছে। এখানে তথাগত কাশ্যপের জন্য নিজের চরণ প্রকটিত করেন। দাহ করার জন্য তথাগতের মরদেহ থাকা সোনার শবাধারটির উপরে তেল ঢালা হলো। কাঠ স্তূপ করা হলো। কিন্তু শত চেষ্টা করেও আগুন জ্বালানো গেল না। সকল দর্শকের মন ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো। অনিরুদ্ধ তাই দেখে বললেন—কাশ্যপের জন্য একটু অপেক্ষা করা যাক্।

এমন সময়ে ৫০০ অনুগামী নিয়ে কাশ্যপ বনের ভেতর দিয়ে কুশীনগর এসে হাজির হলেন। আনন্দকে তিনি বললেন—"তথাগতকে একবার শেষ দেখা দেখতে পারি কি?" আনন্দ বললেন—"হাজার টুকরো কাপড় দিয়ে জড়ানো হয়ে তাঁর দেহ এখন একটি ভারী শবাধারের মধ্যে বন্ধ। ওপরে চন্দন কাঠ স্তূপ করা হয়েছে। তাতে আগুন লাগানোর আয়োজন চলেছে।"

এই সময়ে শবাধারের ভেতর থেকে বুদ্ধ তাঁর পা দুটি বাইরে বাড়িয়ে দিলেন।

যেখানে বুদ্ধ তাঁর পা প্রকটিত করেন তার কাছেই রাজা অশোকের বানানো একটি

স্তূপ আছে। আট রাজা এখানেই বুদ্ধের দেহাবশেষ ভাগ করে নেন। সামনেই একটি পাথরের স্তম্ভ। তাতে এই ঘটনার বিবরণ খোদাই করা রয়েছে।

দেহাবশেষ বাটোয়ারার স্তূপটি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ২০০ লির কাছাকাছি পথ চলার পর একটি বেশ বড়োসড় গ্রামের দেখা পেলাম। এ গ্রামে এক ব্রাহ্মণ থাকতেন। তিনি বেশ ধনী ও নাম করা লোক ছিলেন। সকল ধর্ম শাস্ত্রের উপর তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। ত্রিপিটকের উপরেও। পঞ্চ বিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁর বাড়ীর পাশে ভিক্ষুদের জন্য একটি আবাস গড়েন। আবাসটিকে সুন্দর করে গড়ার জন্য তিনি তাঁর সব ধন-সম্পদ খরচ করেন। যদি কোন ভিক্ষু ঘুরতে ঘুরতে এ গ্রামে এসে হাজির হতেন তিনি তাকে তাঁর সেই আবাসে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাতেন। তাকে আদর আপ্যায়নের জন্য সব রকম চেষ্টা করতেন। তা তিনি এক রাতই থাকুন আর সাত দিন সাত রাতই থাকুন।

তারপর, শশাঙ্ক রাজা বৌদ্ধ ধর্ম উৎখাত শুরু করলেন। ভিক্ষুরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো ও অনেক বছর ধরে পালিয়ে বেড়াল। তা সত্ত্বেও তাদের প্রতি ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধার এতটুকু চিড় ধরলো না। একদিন ভোরবেলা বেড়াতে বেড়াতে তিনি হঠাৎ এক শ্রমণকে দেখতে পেলেন। দুটি ভুরু মোটা, কামানো মাথা, হাতে যষ্ঠি বা হিক্কাল নিয়ে এদিকেই আসছিলেন। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁর ভিক্ষু আবাসে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। শ্রমণ তাঁর অনুরোধ রাখল। ব্রাহ্মণ সকালের দিকে তাঁকে খানিক পায়স খেতে দিলেন। শ্রমণ তা থেকে একটুখানি খেয়ে, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাকি পায়স সহ ভিক্ষা পাত্র নামিয়ে রাখলেন। তাই দেখে ব্রাহ্মণ বিনীতভাবে বললেন "ভদন্ত। এমন কিছু কারণ ঘটেছে কি যে জন্য আপনি একটি রাতও আমার এখানে থাকতে চাইছেন না? যে খাবার দিয়েছি তাকি আপনার ভালো লাগে নি?" শ্রমণ করুণাঝরা কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"পুণ্য দিন দিন ক্ষীণ হয়ে চলেছে দেখে আমি মর্মাহত। যাই হোক, আমায় আগে খাওয়া শেষ করতে দাও তারপর তোমাকে সব বলব।" খাওয়া শেষ হলে তিনি তাঁর পোষাক পত্তর গুছিয়ে নিলেন—যেন এখুনি চলে যাবেন আর কি। ব্রাহ্মণ তা দেখে বললেন—"আপনি আমায় সব কথা বলবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তবে চুপ করে রইলেন কেন?" শ্রমণ উত্তরে বললেন—"আমি ভুলিনি। তবে তোমাকে সে কথা বোঝান কঠিন। তবুও তোমাকে অল্প কথায় বলছি। তুমি আমায় যে অন্ন দিয়েছ সেজন্য আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিনি। সত্যি বলতে কি কয়েকশো বছরের মধ্যে এমন সুস্বাদু অন্ন আমি খাইনি। তথাগত যখন বেঁচে ছিলেন ও রাজগৃহের কাছে

বেণুবন বিহারে থাকতেন তখন আমি তাঁর শিষ্যত্ব নেই। সেখানে একদিন আমি নদীর নির্মল জলে তাঁর পাত্রটি ধুয়ে, তাঁর কুঁজায় জল ভরে, তাকে মুখ ধোবার জন্য, জল দেই। কিন্তু হায়! তুমি আমায় আজ যে পায়স খেতে দিলে তার স্বাদ, পুরানো দিনের সেই মিষ্টি জলের কাছাকাছিও নয়। এর কারণ আর কিছুই নয়। দেবতা ও মানুষের পুণ্যবল, আগের চেয়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে।" ব্রাহ্মণ তখন বললেন—"আপনি নিজের চোখে বুদ্ধদেবকে জীবিত দেখেছেন এ কী করে সম্ভব?" শ্রমণ উত্তর দিলেন—"তুমি কি কখনো বুদ্ধের আপন ছেলে রাহুলের নাম শোননি? আমিই সে। সত্য ধর্মকে রক্ষার বাসনায় আমি এখনো পর্যন্ত নির্বাণ যাই নি।" এ কথা বলে সহসা তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ব্রাহ্মণ তখন সে ঘরটিকে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে সেখানে রাহুলের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। সে মূর্তিটিকে তিনি এরূপ সম্মান জানাতেন যেন ঠিক রাহুল-ই তাঁর চোখের সামনে।

॥ ৩৭ ॥ 'পো-লো-নি-সুসি' বা বারাণসী

বিরাট অরণ্যের মধ্য দিয়ে এবার আমরা একটানা পথ ভেঙে চলেছি। ৫০০ লির মতো পেরিয়ে আসার পর পো-লো-নি-স্সি বা বারাণসী পেঁছিলাম।

দেশটি আয়তনে চার হাজার লি মতো হবে। রাজধানীটি গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে। শহরটি লম্বায় ১৮ থেকে ১৯ লি, চওড়ায় ৫ থেকে ৬ লি। এর ভিতরের ফটকগুলি ছোট দাঁতওয়ালা চিরুনীর মতো। জনবসতি বেশ কম। পরিবারগুলি বেশ ধনী বলে মনে হলো। বসতবাড়িগুলি চোখ ঝলসানো ও রীতিমতো ও পয়সা খরচ ক'রে তৈরী। লোকজনের আচার-আচরণ কোমল ও মানবিক বোধ সম্পন্ন। জ্ঞানচর্চার দিকে প্রবল স্পৃহা। তাদের বেশির ভাগই বিধর্মী, নামমাত্র কিছু বুদ্ধের অনুগামী।

এ রাজ্যের আবহাওয়া স্নিগ্ধ। ফসল অফুরান। ফল ফলাদির গাছপালায় চারি-দিক ভরাট। যে-দিকে তাকানো যায় মাটির বুক খাটো ঝোপঝাড় লতাগুল্মে সবুজ।

এখানে তিরিশটির মতো সংঘারাম আছে। সেখানে তিন হাজারের কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন। তাঁরা হীনযানের সম্মতীয় শাখার উপাসক।

প্রায় একশোটির মতো দেবমন্দির রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দশ হাজারের মতো অনুগামী থাকেন। তাঁরা প্রধানভাবে শিব ভক্ত। কতক অনুগামী তাদের চুল কেটে ফেলে। কতক আবার তাকে জটা বেঁধে রাখে ও পুরো নগ্ন থাকে। সারা গায়ে তারা ছাই মাখে ও সবরকম কঠোর সাধনা ক'রে জন্ম ও মৃত্যুর বাঁধন থেকে মুক্তিলাভের উপায় খোঁজে।

রাজধানীর মধ্যে কুড়িটি দেবমন্দির দেখলাম। তার চূড়া ও মন্ডপগুলি কারুকাজ করা কাঠ ও ভাস্কর্য খোদাই করা পাথর দিয়ে বানানো। সার সার গাছের ঘন পাতায় চারিদিক ছায়া-ঘেরা। নদীতে বয়ে চলা বিমল জলধারা যেন গাছের সারিগুলিকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। দেশী তামা দিয়ে তৈরী শিব মূর্তিটি ১০০ ফুটের চেয়ে কিছুটা কম উঁচু। চেহারা ভাবগম্ভীর ও মহিমাব্যঞ্জক। দেখে মনে হলো যেন সত্যিই জীবিত।

রাজধানীর উত্তর-পূবে বরণা নদীর পশ্চিম পাড়ে একটি স্তূপ দেখলাম। একশো ফুটের মতো উঁচু। এটি রাজা অশোকের বানানো। সামনে একটি পাথরের স্তম্ভ রয়েছে। এটি বেশ চকচকে ও আয়নার মতো ঝলমলে। এর সারা গা তেলতেলে ও বরফের মতো মসৃণ। স্তম্ভটির গায়ে সব সময় ছায়ার মতো বুদ্ধের মূর্তি দেখা যায়।

উত্তর-পূর্বদিকে বরণা নদী পেরিয়ে ১০ লি মতো গেলে 'লু ঈ' বা মৃগদাব সংঘারামের দেখা পাওয়া যায়। এর সীমানা আট ভাগে বিভক্ত, একটি ঘের-দেয়াল দিয়ে সবগুলি যোগ করা। তল বিশিষ্ট বুরুজগুলি থেকে বেরিয়ে আসা ঝুল বারান্দা ও ছাঁচগুলি অতি নিপুণ হাতের কাজ। এই সংঘারামটিতে ১৫০০ মতো ভিক্ষু আছেন। তাঁরা হীনযানের সম্মতীয় শাখার উপাসক। বিরাট সীমানার ভিতরে দুশো ফুটের মতো উঁচু একটি বিহার দেখলাম। ছাতের শীর্ষে একটি সোনায় মোড়া আমের প্রতিকৃতি রয়েছে। দালানের ভিত পাথরের। সিঁড়িও পাথরের। কিন্তু বুরুজ ও কুলুঙ্গিগুলি ইটের তৈরী। কুলুঙ্গিগুলি চারিদিকে একশোটি সারিতে সাজানো ও তার প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সোনার বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। বিহারের মধ্যে দেশী তামা দিয়ে তৈরী একটি বুদ্ধমূর্তি। ধর্ম-ব্যাখ্যানে রত এই মূর্তিটির আকার স্বাভাবিক মানুষের সমান।

বিহারটির কাছাকাছি গুটিসাতেক স্তূপ দেখা গেল।

এখান থেকে একটুখানি দক্ষিণে গেলে বিগত চার বুদ্ধ যেখানে স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত পায়চারি করতেন সে জায়গাটি দেখা যাবে। এটি প্রায় ৫০ পায়ের মতো লম্বা ও ৭ ফুটের মতো উঁচু। নীল রঙা পাথর গাদা ক'রে এটি বানানো হয়েছে। এর উপর হেঁটে যাবার ভঙ্গিমায় তথাগতের একটি মূর্তি আছে। মূর্তিটি মহান করুণা ভাব ও সৌন্দর্য ব্যঞ্জক। নাভি থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত একটি বিনুনীর মতো পাকানো তন্ত্রী বিস্ময়কর ভাবে প্রবাহিত। মূর্তিটিতে তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে অতি সহজভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দৈব প্রতিভা ও সাধন ক্ষমতার পরিপাটি সমন্বয় দেখানো হয়েছে।

সংঘারামটির পরিসরের পশ্চিম দিকে তিনটি সরোবর রয়েছে। শেষ সরোবরটি

থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলে একে একে তিনটি স্তূপের দেখা পাওয়া যাবে।

সংঘারামটির দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ২ বা ৩ লি এগিয়ে গেলে তিনশো ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ চোখে পড়বে। এর নিচের ভিত বেশ চওড়া ও দালানগুলি উঁচু। এটি বিভিন্ন ধারার কারু ও শিল্পকাজ করা এবং দামী দামী বস্তু দিয়ে সুন্দর ক'রে সাজানো। এটিকে কুলুঙ্গিসহ স্তরে স্তরে সাজিয়ে গড়া হয়নি। গম্বুজের উপরে শীর্ষদণ্ড থাকলেও তার ঘণ্টার ঘেরগুলো নেই। এর পাশে আরেকটি ছোট স্তূপ।

মৃগবনের পূর্বদিক দু-তিন লি মতো গেলে আমরা একটি স্তূপের দেখা পাই। এর পাশেই একটি শুকনো পুকুর রয়েছে। এটির আয়তন ৮০ পায়ের মতো হবে। তার পশ্চিমে আর একটি স্তূপ।

॥ ৩৮ ॥ 'চেন-চু'-গর্জপুর বা ঘাজিপুর

এদেশ ছেড়ে গঙ্গা নদীর প্রবাহ ধরে পূর্বদিকে এগিয়ে চললাম। প্রায় ৩০০ লি পথ চলার পর 'চেন চু' অর্থাৎ গর্জপুর বা ঘাজিপুর এলাম।

এ রাজ্যটির আয়তন ২০০০ লির কাছাকাছি হবে। রাজধানীটি গঙ্গা নদীর কূলে ১০ লি মতো পরিধি জুড়ে গড়ে উঠেছে। লোকেরা ধনবান ও সমৃদ্ধ। শহর ও গ্রামগুলির গা ঘেঁষাঘেষি হয়ে রয়েছে। জমি সরস ও উর্বর। নিয়মিতভাবে চাষবাসের কাজ চলে। আবহাওয়া স্নিগ্ধ ও নাতিশীতোষ্ণ। লোকজনেরা আচার-আচরণের দিক থেকে সৎ ও নিষ্ঠাবান। মূল প্রকৃতি সহজাতভাবেই উগ্র। একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে অন্যধর্মী ও সত্যধর্মী দুই গোষ্ঠীর লোকই রয়েছে।

এখানে দশটির মতো সংঘারাম আছে। সেখানে ভিক্ষুর সংখ্যা হাজারের কিছু কম হবে। সকলেই হীনযানের অনুগামী। দেবমন্দির কুড়িটি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামীরা সেখানে থাকে।

রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে একটি সংঘারাম আছে। সেখানে রাজা অশোকের গড়া একটি স্তূপ আছে দেখলাম।

এর কাছেই একটি জায়গায় বিগত চার বুদ্ধের ওঠা-বসা, চলাফেরার স্মারক বর্তমান। কাছেই মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের একটি মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটি ছোটখাট।

প্রধান শহরটি থেকে পূর্বদিকে ২০০ লি মতো যাবার পর একটি সংঘারামের দর্শন পেলাম। এটির নাম 'অবিদ্ধ কর্ণ'। এর পরিসর বিরাট না হলেও দালানের কারুকাজগুলি উচ্চাঙ্গের শিল্প নিদর্শন। চারিদিকে ফুটে থাকা ফুল, গম্বুজ শিখর ও কুলুঙ্গির পর পর লেগে থাকা ছবি, হ্রদগুলির জলে প্রতিফলিত হয়ে এক অপূর্ব পরিবেশ গড়ে তোলে। ভিক্ষুরা ভাবগম্ভীর ও রুচিবোধ সম্পন্ন। প্রতিটি করণীয়

কাজ ঠিক ঠিক মতো ক'রে চলে।

অবিধ্বকর্ণ থেকে দক্ষিণ-পূবদিকে ১০০ লি মতো এগিয়ে গঙ্গা নদী পার হয়ে দক্ষিণ দিকে গেলে মো-হো-শ-লো-বা মহাসার শহরের দেখা পেলাম। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই ব্রাহ্মণ (হিন্দু ধর্মী)। বুদ্ধের ধর্মকে তারা ভাল চোখে দেখে না। আমাকে দেখতে পেয়ে প্রথমেই তারা আমার বিদ্যা বুদ্ধির খোঁজ খবর নিল। যখন মেপেজুপে বুঝতে পারল যে এ লোকটির সত্যই বেশ পাণ্ডিত্য রয়েছে তখন খুব আদর অভ্যর্থনা, সম্মান দেখাল।

গঙ্গার উত্তর কূলে একটি বিষ্ণু মূর্তি রয়েছে। মন্দিরটির ঝুলবারান্দা ও তলাবিশিষ্ট গম্বুজগুলি চমৎকারভাবে নানারকম ভাস্কর্য ও কারুকার্য করা। যতগুলি দেব বিগ্রহ সেখানে দেখলাম সবগুলিই পাথরের তৈরী। সেগুলি শিল্পকর্মের সেরা নিদর্শন সব।

এই মন্দিরটি থেকে পূবদিকে তিরিশ লি কাছাকাছি গেলে রাজা অশোকের বানানো একটি স্তূপ চোখে পড়বে। এর অর্ধেকেরও বেশি মাটির মধ্যে বসে গেছে। সামনে ২০ ফুট খানেক একটি পাথর স্তম্ভ। তার মাথায় সিংহমূর্তি। বুদ্ধ এখানে কতক মরুদানবকে বশ করেন। স্তম্ভের গায়ে তারই খোদাই করা বিবরণ রয়েছে।

মরুদানবদের হৃদয় পরিবর্তনের স্থানটি থেকে একটুখানি এগিয়ে অনেকগুলি সংঘারাম দেখতে পেলাম। বেশিরভাগই ভাঙাচোরা অবস্থায় পৌঁছেছে। তবু সেখানে কিছু ভিক্ষু রয়েছেন দেখলাম। তারা সকলেই মহাযানের উপাসক।

এখান থেকে একশো লি মতো দক্ষিণ-পূবে পথ চলার পর আমরা একটি ভেঙেপড়া স্তূপের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভগ্নদশা হলেও এখনো এটি বেশ উঁচু (কয়েক দশ ফুট)। তথাগত নির্বাণলোকে চলে যাবার পর, আটটি বড়ো বড়ো দেশের রাজা তাঁর দেহাবশেষ ভাগ ক'রে নেন। যে ব্রাহ্মণ তাদের দেহাবশেষ ভাগ করে দেন, তিনি তার মধ্য থেকে কিছুটা সরিয়ে নিয়ে মধু মাখা কলসে ভরে রাখেন ও তা নিজের দেশে নিয়ে আসেন। তারপর সেই পূতাস্থির উপর এখানে একটি স্তূপ গড়েন। কলসটির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য তিনি সেটিকেও স্তূপের মধ্যে রাখেন। এজন্য স্তূপটির নাম দ্রোণ (কলস) স্তূপ দেয়া হয়। পরে অশোক রাজা সে স্তূপটি খুঁড়ে দেহাবশেষ বার করে নেন। কলসটিকেও নিয়ে যান। পুরানো স্তূপটির জায়গায় একটি বড়ো স্তূপ গড়েন।

॥ ৩৯ ॥ 'ফেই-শে-লি' বা বৈশালী

গর্জপুর থেকে উত্তর-পূবদিকে যাত্রা করলাম। এজন্য (আবার) গঙ্গানদী পার হলাম। প্রায় ১৪০ থেকে ১৫০ লি পথ চলার পর ফেই-শে-লি বা বৈশালী রাজ্যে এসে পৌঁছলাম।

এ রাজ্যটির আয়তন প্রায় ৫০০০ লি হবে। জমি সরস ও উর্বরা। ফুল আর ফল গাছের ছড়াছড়ি। 'আম্র' (আম) ও 'মোচা'র (কলা) ফলন খুবই বেশি। এদুটি ফলের প্রচুর আদর। আবহাওয়া মোটামুটি ভালই, না বেশি শীত না বেশি গরম। আচার ব্যবহারের দিক থেকে লোকেরা সৎ ও নিষ্ঠাবান প্রকৃতির। ধর্মকর্মের দিকে অনুরাগ রয়েছে, জ্ঞানচর্চার প্রতিও পরম শ্রদ্ধা রয়েছে। বৌদ্ধধর্মী ও অন্যান্য ধর্মীরা মিলেমিশে বাস করছে।

এখানে কয়েকশোর মতো সংঘারাম আছে। বেশিরভাগই ভাঙা বা ভাঙো ভাঙো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গুটি তিন পাঁচ যা এখনো খাড়া আছে তাতে সামান্য কিছু ভিক্ষু বাস করেন। বেশ কিছু (কয়েক দশ) দেবমন্দির রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্য ধর্মীরা সেখানে বসবাস করেন। নির্গ্রন্থ অনুগামীদের সংখ্যাই এখানে সব থেকে বেশি।

এ রাজ্যের রাজধানী শহর বৈশালীর এখন প্রায় ভাঙাচোরা দীন দরিদ্র অবস্থা। এর পুরানো পরিসরের ঘের ৬০ থেকে ৭০ লি হবে। রাজপুরীর ঘের চার থেকে ৫ লি। এখন সেখানে সামান্য কিছু লোক বাস করে। রাজপুরী থেকে ৫ বা ৬ লি উত্তর-পশ্চিমে একটি সংঘারাম দেখলাম। এটিতে সামান্য কয়েকজন ভিক্ষু থাকেন। তারা হীনযানের সম্মতীয় শাখা মার্গী।

এর কাছে একটি স্তূপ রয়েছে। এখানে তথাগত বিমলকীর্তি সূত্র ব্যাখ্যান করেন। এ ছাড়া এখানকার এক গৃহস্থ পরিবারের ছেলে রত্নাকর ও আরো কতকে মিলে এখানে বুদ্ধদেবকে কয়েকটি মূল্যবান রোদ নিবারণী ছাতা উপহার দেন। এর পূর্বদিকে আর একটি স্তূপ আছে। এখানে সারিপুত্র ও আরো অনেকে অর্হত্ব লাভ করেন।

শেষ জায়গাটির দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটি স্তূপ দেখা যায়। এটি বৈশালীর এক রাজা তৈরী করেন। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পরে তাঁর দেহাবশেষের একটি ভাগ এখানকার এক রাজা পেয়েছিলেন। সেই দেহাবশেষকে পরম সম্মান সহকারে নিয়ে এসে এখানে তিনি এই স্তূপটি তোলেন।

ভারতীয় ইতিহাস পুঁথি থেকে জানা যায় যে, আদিতে এই স্তূপটির মধ্যে দশ পেক (১ হোহ hoh) এর সমান দেহাবশেষ ছিল। অশোক রাজা এটিকে খুঁড়ে তা থেকে নয়-দশমাংশ নিয়ে নেন। এরপর এ দেশের আর একজন রাজা আবার এটিকে খুঁড়তে মন করেন। কিন্তু খোঁড়া শুরু হবার মুহূর্তে ভূমিকম্প দেখা দিল। তাই তিনি আর সে কাজ করতে সাহসী হলেন না।

উত্তর-পশ্চিমদিকে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ দেখলাম। তার পাশে ৫০ থেকে ৬০ ফুট খাড়া একটি পাথর স্তম্ভ। তার মাথায় একটি সিংহমূর্তি রয়েছে।

পাথর স্তম্ভের দক্ষিণদিকে একটি পুকুর। তার দক্ষিণদিকে দুটি স্তূপ।

সংঘারামটি থেকে ৩ বা ৪ লি উত্তর-পূবে গেলে একটি স্তূপ দেখা যাবে। ওখানেই এককালে বিমলকীর্তির ভিটে ছিল।

এর অদূরে একটি যক্ষনিবাস রয়েছে। এটির আকার গাদা করা ইটের পাঁজার মত। চলিত মতে, গৃহস্থ বিমলকীর্তি অসুস্থ থাকাকালে যেখানে ধর্মের ব্যাখ্যান করেছিলেন সেখানেই এই পাথর গাদা বর্তমান।

এখান থেকে একটুখানি এগিয়ে গেলে আর একটি স্তূপ দেখা যাবে। এখানে এককালে রত্নাকরের ভিটে ছিল।

এই জায়গাটি থেকে আবার একটু এগোলে একটি স্তূপ। এখানে এককালে আম্রপালীর আবাস ছিল। বুদ্ধদেবের মাসী অন্যান্য ভিক্ষুণীরা এখানেই নির্বাণগত হন।

সংঘারামটি থেকে তিন-চার লি উত্তরে একটি স্তূপ রয়েছে। মরণের জন্য কুশীনগর যাবার আগে বুদ্ধদেব এখানে থেমেছিলেন। এই সময় নর ও কিন্নরেরা তার সঙ্গ নেয়। এখান থেকে একটুখানি উত্তর-পশ্চিমে একটি স্তূপ আছে। এখানে দাঁড়িয়েই তথাগত শেষবারের মতো বৈশালী শহরের দিকে ফিরে তাকান। এর অল্প কিছু দক্ষিণে একটি বিহার দেখা যাবে। তার সামনে একটি স্তূপ রয়েছে। এটি এককালে আম্রপালীর বাগান ছিল। বুদ্ধদেবকে এটি তিনি দান করেন।

বাগানটির কাছাকাছি আরো গুটি চারেক স্তূপ। তারপর খানিকটা এগিয়ে গেলেই বুদ্ধ যেখানে বসে 'সমন্তমুখ ধরণি' ও অন্যান্য সূত্রাবলী প্রকাশ করেছিলেন। সেই গম্বুজবিশিষ্ট প্রচার মহাকক্ষটির ভাঙ্গা অবশেষের দেখা মেলে।

প্রচার মহাকক্ষের পাশে, কিছুটা এগিয়ে গেলে একটি স্তূপ চোখে পড়বে। এটিতে আনন্দের দেহাবশেষের অর্ধেক রাখা আছে।

এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলে অনেক স্তূপ দেখা যাবে। এর প্রকৃত সংখ্যা কতো তার হিসাব নেই। বৈশালী নগরীর ভিতরে ও বাইরে এবং এর সব দিক ঘিরে এতো পবিত্র স্মারক রয়েছে যে তা বর্ণনা করা অসম্ভব ব্যাপার। এক পা এগোলেই একটি ক'রে বিশেষ স্মরণীয় জায়গা এবং পুরানো এক একটি স্মারক চোখে পড়বে। এই সব পুরোনো স্মারকের বেশির ভাগই কালের সুদীর্ঘ প্রভাবে ও ঝড় বাতাসের দাপটে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। বন-বনানী নির্মূল, অগভীর হ্রদগুলি মজে ওঠা, দুর্গন্ধে ভরা। শুধু মন খারাপ ক'রে তোলা ভাঙ্গাচোরা অবশেষের আখ্যান ছাড়া আর কিছুই শোনানোর মতো নেই।

প্রধান নগরটি থেকে ৫০ বা ৬০ লি উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে আমরা একটি বড় স্তূপের

দেখা পাই। এখান থেকেই লিচ্ছবিরা বুদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নেয়। ঐ সময়ে বুদ্ধ তার স্মৃতির নিদর্শনরূপে নিজের ভিক্ষা পাত্রটি তাদের দেন।

বৈশালী নগরী থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ২০০ লির কাছাকাছি পথ চলে আমরা একটি পুরানো শহরে এসে পড়লাম। বহুকাল হলো লোকজন এ শহরটি ছেড়ে চলে গেছে। সামান্য কিছু মানুষ যা বাস করছে। এই শহরের মধ্যে একটি স্তূপ আছে।

শহরটি থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে ১৪-১৫ লি এগিয়ে গেলে একটি বড় স্তূপ দেখা যাবে। এখানেই সাত শত বৌদ্ধ মুনি-ঋষিদের সম্মেলন হয়েছিল (দ্বিতীয় মহা-সম্মেলন)। বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের ১১০ বছর পর বৈশালীর কতক ভিক্ষু বুদ্ধের নীতিসমূহ ভাঙেন ও শৃঙ্খলার বিধিনিয়ম বিকৃত ক'রে তোলেন। আয়ুষ্মত যশদা এই সময়ে কোশলে থাকতেন। আয়ুষ্মত সমবোধ মথুরায়। আয়ুষ্মত রেবত হান-জো (কান্যকুব্জ) তে। আয়ুষ্মত সাল বৈশালীতে। আয়ুষ্মত পুজসুমির (?) শ-লো-লি-ফো (শলঋভু ?) তে। এরা সকলেই নামকরা অর্হৎ ছিলেন। প্রত্যেকের স্বাধীন স্বকীয় ক্ষমতা ছিল। সকলেই ত্রি-পিটকের একান্ত অনুগামী। প্রত্যেকেই ত্রি-বিদ্যায় পারদর্শী ও অতি বিখ্যাত ছিলেন। যা যা জানা উচিত সবই তারা জানতেন। আবার সকলেই ছিলেন আনন্দের শিষ্য।

এই সময়ে যশদা বৈশালী নগরীতে মহাসম্মেলনের আয়োজন করলেন। যে সব ভিক্ষু বিনয় পিটকের নীতি-নিয়ম ভঙ্গ করেছেন, তাদের এই সম্মেলন দোষী সাব্যস্ত করলেন। যে-সব বিধি-নিয়ম ভাঙা হয়েছে সেগুলিকে নতুন ক'রে বাঁধলেন। বুদ্ধের পবিত্র ধর্ম-মতবাদের প্রতি সমর্থন জানালেন।

এই জায়গাটি থেকে ৮০-৯০ লি মতো দক্ষিণদিকে যাবার পর আমরা শ্বেতপুর সংঘারামে এসে পেঁছিলাম। এর গোলাকার ও দ্বিতল বুরুজগুলি যেন আকাশ ছুঁয়েছে। ভিক্ষুরা শান্তশিষ্ট ও ভদ্র। সকলেই মহাযানের উপাসক। এই দালানের পাশেই এক জায়গায় বিগত চার বুদ্ধের বসা ও চলাফেরার নিদর্শন রয়েছে।

এগুলির পাশে রাজা অশোকের গড়া একটি স্তূপ আছে। বুদ্ধ তাঁর জীবিত কালে মগধদেশ থেকে দক্ষিণ দিকে এসে এই জায়গাটিতে উত্তরমুখী হয়ে বৈশালীর দিকে তাকান। ঠিক যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে এখনো তার নিদর্শন রয়েছে।

শ্বেতপুর সংঘারাম থেকে দক্ষিণ-পূব দিকে ৩০ লি খানেক যাবার পর গঙ্গার দক্ষিণ ও উত্তর দুই কূলেই দু'টি স্তূপ দেখা যাবে। শ্রদ্ধেয় আনন্দ এখানেই দুই রাজ্যের মধ্যে আপনার দেহ ভাগ করে দেন। (মগধ ও বৈশালীর মধ্যে ভাগ করেছেন) আনন্দ তথাগতের ভাইপো ছিলেন।

॥ ৪০ ॥ 'ফো-লি-শি'

এবার উত্তর-পূর্বদিকে রওনা হওয়া গেল। ৫০০লি মতো পথ ভাঙবার পর আমরা 'ফো-লি-শি' বা বৃজি রাজ্যে এসে গেলাম।

এ রাজ্যটির আয়তন ৪০০০ হাজার লির কাছাকাছি। পূব-পশ্চিম দিকে লম্বা, উত্তর দক্ষিণে সরু। জমি সরস ও উর্বরা। ফল ও ফুল প্রচুর। আবহাওয়া একটু যেন ঠাণ্ডা। লোকেরা চটপটে ও ব্যস্তবাগীশ। এদের বেশির ভাগই অন্য ধর্মী। বুদ্ধের অনুগামী খুবই কম এখানে।

এখানে দশটির মতো সংঘারাম আছে শুনলাম। সেখানে হাজার খানেকের মতো ভিক্ষু আছেন। তাঁরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে হীনযান ও মহাযান ও দুয়েরই চর্চা করেন। বেশ কিছু (কয়েক দশ) দেবমন্দির রয়েছে। অন্য ধর্মী উপাসকদের সংখ্যাও বিপুল। রাজ্যের রাজধানীর নাম 'চেন-শু-নো' (জনকপুর ?)। এটির এখন প্রায় ভাঙা দশা। পুরানো রাজপুরীর সীমানা মধ্যে তবু এখনো প্রায় তিন হাজারের মতো বাড়ী ঘর আছে। এটিকে গ্রামও বলা যেতে পারে; আবার ইচ্ছে করলে শহরও বলা যেতে পারে।

বড়ো নদীর উত্তর-পূবে একটি সংঘারামের দেখা পেলাম। ভিক্ষুর সংখ্যা রীতি-মতো অল্প। তারা বেশ অধ্যবসায়ী, নিষ্ঠাবান ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন চরিত্রের।

এখান থেকে নদীর কূল বরাবর পশ্চিম দিকে গেলে তিরিশ ফুট খানেক খাড়া একটি স্তূপ দেখা যাবে। এর দক্ষিণদিকে গভীর জলের খাড়ি। করুণাময় ভগবান বুদ্ধ এখানে কতক জেলেকে ধর্মের অনুগামী করেন।

শেষের এই জায়গাটি থেকে ১০০ লি মতো উত্তর-পূবে যাবার পর আমরা একটি পুরোনো শহরের দেখা পেলাম। এর পশ্চিমদিকে ১০০ ফুট খানেক খাড়া একটি স্তূপ আছে। রাজা অশোক এটিকে গড়েন।

এখান থেকে উত্তরদিকে ১৪০ বা ১৫০ পা মতো এগিয়ে যেতে একটি ছোট স্তূপের দেখা পাওয়া গেল। বুদ্ধদেব এখানে বসে ভিক্ষুদের জন্য কতক শৃঙ্খলাবিধি রচনা ও প্রচলন করেন। এরপর একটুখানি গেলেই চুল ও নখকণার একটি স্তূপ আছে।

॥ ৪১ ॥ 'নি-পো-লো'

এখান থেকে উত্তর-পশ্চিমদিকে এবার পথ চলা শুরু করলাম। বেশ কয়েকটা পাহাড় ডিঙোবার পর উপত্যকার দেখা পেলাম। এভাবে ১৪০০ থেকে ১৫০০ লি পথ চলার পর নেপাল পেঁছান গেল।

নেপাল রাজ্যটির আয়তন ৪০০০ লি গতন হবে। তুষারাবৃত পর্বতমালার মধ্যে

দেশটি অবস্থিত। রাজধানীর ঘের মোটামুটি ২০ লি খানেক হবে। পাহাড় আর উপত্যকা একটানা পর পর ছড়িয়ে আছে। দেশটি খাদ্য শস্যের চাষ-আবাদে অভ্যস্ত। ফুল আর ফলও যথেষ্ট পরিমাণে ফলে। এখানে দেশী তামা পাওয়া যায়। এ ছাড়া চমরী গাই ও জীবঞ্জীব পাখিও রয়েছে।

লেন দেন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা দেশী তামার মুদ্রা ব্যবহার করে। আবহাওয়া একেবারে হিমেল। লোকের আচার-আচরণ মিথ্যাচার ও বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রবণ। মেজাজ রুক্ষ ও উগ্র। সত্য কথা বা শ্রদ্ধা-সম্মানের ধার ধারে না। এরা অশিক্ষিত হলেও নানা শিল্পকর্মে পটু। তাদের চেহারা বিশ্রী, দেখলেই মন বিগড়ে ওঠে।

সত্য ধর্মের অনুগামীও অন্য ধর্মী দুইই আছে এখানে। সংঘারাম আর দেব-মন্দির দুইই একেবারে পাশাপাশি। এখানকার সংঘারামগুলিতে দু'হাজারের মতন ভিক্ষু থাকেন। হীনযান ও মহাযান দুয়েরই চর্চা করেন তারা। অন্য ধর্মী ও তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপাশকদের সংখ্যা ঠিক বলতে পারলাম না।

রাজা ক্ষত্রিয় বর্ণের লোক। তিনি লিচ্ছবী বংশে জন্মেছেন। বেশ লেখাপড়া জানেন, ভাল খবরাখবর রাখেন। নিষ্ঠাবান ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তার গভীর অনুরাগ রয়েছে।

আগে এখানে অংশুবর্মণ নামে এক রাজা ছিলেন। বিদ্বান ও চতুর হিসাবে তাঁর বেশ নাম ডাক ছিল। শব্দ বিদ্যার উপর তিনি একখানি বই লিখে গেছেন। জ্ঞান ও সদ্‌গুণকে তিনি বিশেষ চোখে দেখতেন। তার খ্যাতি ও সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্বে একটি ছোট নদী আছে। একটি হ্রদও রয়েছে। এগুলিতে যদি আগুন ছুঁয়ে দেয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তা জ্বলে ওঠে। অন্যান্য জিনিষ-এর মধ্যে ছুঁড়ে দিলে তাতেও আগুন ধরে যায় ও তার গুণ পালটে যায়।*

॥ ৪২ ॥ মগধ

নেপাল থেকে বৈশালী ফিরে গেলাম। গঙ্গা নদী পেরিয়ে তার দক্ষিণ তীরের দিকে চলে এলাম। তারপর সেখান থেকে মগধে এসে হাজির হলাম।

মগধ দেশটির আয়তন ৫০০০ লির কাছাকাছি হবে। দেয়াল ঘেরা নগরগুলিতে অল্প লোকের বাস। কিন্তু শহরগুলিতে বেশ ঘন বসতি। জমি সরস ও উর্বরা। ফসলের ফলন প্রচুর। এখানে এক বিশেষ ধরনের চাল জন্মায়। এগুলির আকার বেশ বড়ো, সুগন্ধি আর খেতেও চমৎকার। চিকচিকে রঙের জন্য এই চাল মন কাড়ে। একে সাধারণতঃ 'বড়ো লোকদের খাবার চাল' বলা হয় (মহাশালী বা সুগন্ধিকা)। জমি নিচু

* হিউয়েন-সাঙ নেপাল গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

আর স্যাতসেঁতে বলে শহরগুলি উঁচু জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম মাসের পর থেকে, শরৎ ঋতুর দ্বিতীয় মাসের আগ পর্যন্ত সমতল ভূমি বন্যার জলে ডুবে থাকে। নৌকার সাহায্যে যাতায়াত, ও যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। লোকজনের আচার-আচরণ সরল ও সৎ। আবহাওয়া বেশ গরম। জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টাকে তারা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অগাধ ভক্তি।

এখানে পঞ্চাশটির মতো সংঘারাম রয়েছে। সেখানে প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন। বেশির ভাগই মহাযানের অনুগামী।

দশটি দেবমন্দির আছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপাসকেরা সেখানে থাকেন। তাদের সংখ্যা বেশ নজরে পড়ার মতো।

গঙ্গা নদীর দক্ষিণ কূলে একটি পুরানো শহর আছে। এর আয়তন ৭০ লি মতন হবে। যদিও বহুকাল ধরে এখানে আর লোকজন বসবাস করে না তবুও এর ভিতদেয়ালগুলো এখনো খাড়া রয়েছে। যে যুগে মানুষ অনেক অনেক কাল বেঁচে থাকতো, সে যুগে এই শহরটিকে কুসুমপুর বলা হতো। রাজপুরী অসংখ্য ফুলে ভরা ছিল বলেই শহরের এ নাম। যখন মানুষের আয়ু মাত্র কয়েক হাজার বছরে নেমে এল সে সময় এর নাম বদলে রাখা হলো পাটলীপুত্র।

যখন কুসুমপুর থেকে রাজধানী সরিয়ে আনা হলো তখন এই শহরটিকে রাজধানী করা হলো।*

পুরানো রাজপ্রাসাদের উত্তরদিকে বেশ কিছুটা (কয়েশ দশ ফুট) উঁচু একটি স্তম্ভ আছে। এই জায়গাটিতেই রাজা অশোকের 'নরক পুরী'টি গড়া হয়েছিল। তথাগতের মৃত্যুর ১০০ বছর পরে অশোক নামে এক রাজা রাজত্ব করেন। তিনি বিম্বিসার রাজার প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি তার রাজধানী রাজগৃহ থেকে পাটলিপুত্রে সরিয়ে আনেন। পুরানো শহরকে তিনি দেয়াল তুলে ঘিরে দেন। তারপর অনেক পুরুষ কেটে গেছে। এখন শহরটির পুরানো ভিতদেয়ালই শুধু যা টিঁকে আছে। শয়ে শয়ে সংঘারাম, দেবমন্দির ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। দু'তিনটি মাত্র পুরোপুরি খাড়া আছে। পুরানো রাজপ্রাসাদের উত্তরে, গঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে একটি ছোট শহর রয়েছে। সেখানে হাজারখানেক বাড়ি ঘর দেখা যায়।

অশোকের গড়া নরক থেকে একটুখানি দক্ষিণে একটি স্তূপ আছে। এর ভিত ধ্বসে গিয়ে পুরো স্তূপটি হেলে পড়েছে ও ভেঙে চলেছে। তার গম্বুজের শীর্ষচূড়াটি

* অর্থাৎ মূলে পাটলিপুত্র কুসুমপুর থেকে একটু দূরে গড়ে ওঠে। পরে সম্ভবতঃ দুটি শহর একাকার হয়ে যায় ও পাটলিপুত্র নামে পরিচিত হয়।

কিন্তু এখনো টি'কে আছে। এটি খোদাই করা পাথরের তৈরী ও পিলপে দিয়ে ঘেরা। এটি ৮৪০০০টি স্তূপের মধ্যে প্রথম (বা একটি)। অশোক রাজা তার রাজপুরী মধ্যে মানব শিল্পীদের দিয়ে এটি গড়েন। এতে এক চিং (Ching) পরিমাণ বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ রয়েছে।

স্তূপটির অদূরে একটি বিহার মধ্যে একটি বড়ো পাথর আছে। এর উপর বুদ্ধ চলাফেরা করেছেন। এখনো তাতে তার দু' পায়ের ছাপ রয়েছে। এই ছাপ ১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি চওড়া। দুটি ছাপেই চক্র চিহ্ন আছে। দশটি আঙ্গুলের প্রান্তে পুষ্প ও মৎস্য চিহ্ন বর্তমান। এগুলি আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে।

অতীতকালে বুদ্ধের নির্বাণ লাভ কাল ঘনিয়ে এলে তিনি উত্তরদিকে কুশীনগর যাত্রা করেন। তখন দক্ষিণদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, মগধের দিকে চেয়ে এই পাথরটির উপর তিনি উঠে দাঁড়ান। তারপর আনন্দকে বলেন—'আমি আমার শেষ চরণচিহ্ন এখানে রেখে গেলাম'। মগধের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন—'এখন থেকে ১০০ বছর পরে অশোক নামে এক রাজা জন্ম নেবে। সে এখানে তার রাজধানী গড়বে ও রাজসভা বসাবে। সে ধর্মীয় ত্রি-রত্নের পৃষ্ঠপোষক হবে'।

রাজা অশোক সিংহাসনে আরোহণের পর রাজধানী পরিবর্তন করলেন ও এই শহরটি গড়লেন। বুদ্ধের চরণচিহ্ন আঁকা এই পাথরটিকে ঘিরেও তিনি এক বিহার গড়লেন। এটি রাজপুরীর কাছে থাকার দরুণ তিনি নিয়মিত এখানে এসে পূজা দিতেন। পরে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজারা এটিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। পাথরটি অতি বড়ো না হওয়া সত্ত্বেও তারা এটিকে এখান থেকে এক পা-ও নড়াতে পারলেন না।

সব শেষে রাজা শশাঙ্কের দৃষ্টি পড়লো এদিকে। তিনি তখন বৌদ্ধধর্মের উৎখাত ক'রে চলেছেন। সমস্ত পবিত্র স্মারক নষ্ট ক'রে ফেলার মন ক'রে তিনি এটিকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। কিন্তু এটি আবার জুড়ে গিয়ে এক হয়ে গেল। ছাপ একেবারে আগের মতোই থাকল। তখন তিনি গঙ্গা নদীর মধ্যে এটিকে ফেলে দিলেন। কিন্তু এটি আবার তার পুরানো জায়গায় ফিরে এলো।

এই পাথরটির পাশেই একটি স্তূপ আছে। বিগত চার বুদ্ধ যেখানে ওঠাবসা ও চলাফেরা করতেন সেখানে এটি গড়া হয়েছে। তাদের সে-সব চিহ্ন এখনো আছে।

বুদ্ধের পদচিহ্ন থাকা বিহারটি থেকে একটুখানি গেলেই ৩০ ফুট মতো উ'চু একটি বড়ো পাথরের স্তম্ভ রয়েছে। এটিতে এক খোদাই বিবরণ আছে। বিবরণটিকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেলা হয়েছে। এর মূল বক্তব্য মোটামুটি এই—"অশোক রাজা বুদ্ধের মতবাদের প্রতি গভীর অনুরক্ত হয়ে তাকে এই জম্বুদ্বীপ তিনবার ধর্মার্ঘ'

নিবেদন করেন ও ধনরত্ন দিয়ে তিনবার তাকে আবার কিনে নেন।"

পুরানো রাজপ্রাসাদের উত্তরদিকে একটি বিশাল পাথরের বাড়ি আছে। বাইরে থেকে এটিকে একটি বড়ো পাহাড়ের মতো দেখায়। এর ভিতরটা খুব লম্বা চওড়া (কয়েক দশ ফুট প্রশস্ত)। রাজা অশোক তার ভাইয়ের জন্য দানোদের দিয়ে এটি বানিয়ে দেন। তার এই ভাইয়ের নাম মহেন্দ্র। ইনি অশোকের সৎভাই ছিলেন। প্রথম জীবনে ইনি অতি বিলাসী ও উচ্ছৃংখল ছিলেন। এজন্য প্রজারা পর্যন্ত রাজার কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। পরে ইনি সম্পূর্ণ পালটে যান। সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ ক'রে উচ্চ সাধনার দ্বারা অর্হত্ব লাভ করেন। তার বসবাসের জন্য এরপর রাজা অশোক এটি তৈরী করেন।

পুরানো রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ছোট পাহাড় আছে। পাহাড়ের চূড়াগুলিতে ও চারিদিককার উপত্যকায় অনেকগুলি (কয়েক দশ) পাথরের কক্ষ রয়েছে। উপগুপ্ত ও অন্যান্য অর্হৎদের থাকার জন্য রাজা অশোক দানোদের দিয়ে এগুলি বানিয়ে দেন।

পাশেই একটি বুরুজ দেখলাম। অনেক পুরানো। এখন এটি ভেঙে গিয়ে পাথর-গাদা হয়ে পড়ে রয়েছে। পাশে একটি পুকুর। আয়নার মতো টলটলে জলের বুকে মাঝে মাঝে বুদবুদের ধীর আলোড়ন। লোকেরা একে একটি পবিত্র জলাধার বলে মনে করে। যদি কেউ এর জল পান করে বা এখানে স্নান করে তার সব পাপ-তাপ ধুয়ে মুছে যায়।

পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে একটি জায়গায় পাঁচটি স্তূপ রয়েছে। এগুলি অনেক উঁচু ক'রে গড়া হয়ে থাকলেও এখন ভাঙা দশা। এ সত্ত্বেও এখনো এগুলি বেশ উঁচু। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন ছোট ছোট পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটিই সামনের দিকে অনেকখানি ক'রে জায়গা জুড়ে রয়েছে। পরের যুগে এর মাথায় ছোট ছোট স্তূপ বানাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের ইতিহাস মধ্যে এ সম্পর্কে এরকম এক বিবরণ রয়েছে: আগের কালে রাজা অশোক ৮৪000 স্তূপ বানান। এগুলি শেষ হবার পর তিনি দেখলেন যে, আরো পাঁচ কুনকে দেহাবশেষ এখনো রয়ে গেছে। তখন তিনি বিশেষভাবে দেখার মতো ক'রে ভিন্ন শৈলির আরো পাঁচটি স্তূপ বানান। এগুলি বুদ্ধদেবের পঞ্চবিধ আধ্যাত্মিক প্রতীক (রূপ, বেদনা, সজ্ঞান, সংস্কার, বিজ্ঞান)। কিছু সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তি পরবর্তীকালে এইরকম কানাঘুষা শুরু করেছিল যে, পুরাকালে নন্দ রাজা তার ধনরত্ন রাখার জন্য এগুলি তৈরী করেছিলেন। এই কানাঘুষার ফলে একজন অধার্মিক রাজা ধনলোভে সসৈন্যে এখানে এলেন ও এগুলি খনন করতে শুরু করলেন। এর ফলে ভূমিকম্প দেখা দিল, পাহাড় টলোমলো হলো,

কালো মেঘে সূর্য ঢেকে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। স্তূপের মধ্য থেকে বজ্রধ্বনির মতো গভীর নাদ ভেসে এলো। সৈন্যসামন্ত ও তাদের নায়কেরা সব চিৎপাত হয়ে উলটে পড়লো। হাতি-ঘোড়ার দল প্রাণ ভয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালালো। এরকম দুর্দশা হবার পর রাজার ধনলোভ ছুটে গেল। তিনি আর এগুলি খুঁড়তে সাহস করলেন না।

বিবরণে আরো বলা হয়েছে যে, "এই কাহিনীকে ভিক্ষুদের গালগল্প বলে উড়িয়ে দেয়া হয়, কিন্তু পুরানো প্রবাদ থেকে একথা সত্য বলেই মনে হয়।"

পুরানো শহরের দক্ষিণ-পূবে কুক্কুটরাম নামে একটি সংঘারাম আছে। রাজা অশোক বুদ্ধের অনুরাগী হবার পর প্রথম এটি গড়েন। এটি তার প্রথম পুণ্য বৃক্ষ রোপণ ও মহান স্থাপত্য নিদর্শন রচনার প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করা যেতে পারে। তিনি সেখানে ১০০০ ভিক্ষুর থাকার ব্যবস্থা করেন। এদের প্রয়োজনের সব জিনিসই উদারভাবে জুগিয়ে দেয়া হতো। এই দালানটি অনেক কাল হলো ভেঙেচুড়ে গেছে। তবে ভিতগুলি এখনো টিঁকে আছে।

সংঘারামের পাশেই একটি বড়ো স্তূপ। এটির নাম আমলক স্তূপ। আমলক ফলটি ভারতে ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রাজা অশোক একবার খুব অসুখে পড়েন। অনেককাল রোগে ভোগার পর ধরে নিলেন যে তিনি আর বাঁচবেন না। তাই তার যা কিছু সম্পদ সব পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য দান করবেন বলে ঠিক করলেন। রাজার এ ইচ্ছা মন্ত্রীর মনপুতঃ হলোনা বলে তিনি তা কার্যকর করতে চাইলেন না। একদিন তিনি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে একটি আমলক ফলের আধখানা নিজে খেয়ে বাকি আধখানা দান করার জন্য রাজার হাতে দিলেন। ফলটি নিজের হাতে ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা মন্ত্রীকে শুধালেন—'জম্বু দ্বীপের রাজা এখন কে?' মন্ত্রী উত্তরে বললেন—'একা আপনি'। রাজা বললেন—'না, এ সাম্রাজ্য এখন আর আমার নয়। আমি শেষ বয়সে একজন মন্ত্রীর হাতের পুতুল। এখন আমার বলতে শুধু এই আধখানা আমলক ফল।'

এরপর রাজা একজন পার্শ্বচরের হাতে ওই আধখানা আমলক দিয়ে বললেন—'যাও, কুক্কুটরামের ভিক্ষুদের এটি দিয়ে বলে এসো, এতকাল যিনি জম্বুদ্বীপের রাজা ছিলেন এখন তিনি মাত্র এই আধখানা আমলকের অধিপতি। তাই তিনি এটি পাঠিয়ে দিয়ে জানিয়েছেন, আপনারা অনুগ্রহ ক'রে, তার এই শেষ শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ করুন।

পার্শ্বচরের মুখে একথা শুনে ভিক্ষুদের স্থবির বললেন—'রাজা তার পূর্ব-পুণ্য ফলে ভাল হয়ে উঠবেন। তিনি অসুস্থ বলে, লোভী মন্ত্রীরা তার ক্ষমতা কেড়ে নিতে

চাইছে ও ধনসম্পদ আত্মসাৎ করতে চাইছে। কিন্তু এই আধখানা আমলক ফলদান থেকেই রাজা আরো আয়ু পাবেন।

রাজা সেরে উঠে ভিক্ষুদের নানা উপহার নিবেদন করলেন। সংঘারামের পরিচালক (কর্মদান)-কে উপযুক্ত পাত্রে ওই ফলের বীজ সংরক্ষণ করার আদেশ দিলেন। এছাড়া আয়ুলাভের জন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে এই স্তূপটিও এখানে গড়লেন।

আমলক স্তূপের উত্তর-পশ্চিমে একটি পুরানো সংঘারামের মধ্যে একটি স্তূপ দেখা যাবে। এটির নাম 'ঘণ্টাধ্বনি প্রবর্তন'। প্রথমদিকে এ শহরটিতে একশোটির মতো সংঘারাম ছিল। ভিক্ষুরা জ্ঞানী ও মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। নৈতিক চরিত্রও উঁচু মানের ছিল। অন্য ধর্মী পণ্ডিতদের তাঁরা চুপচাপ বোবা ক'রে রেখেছিলেন। সে পুরুষ কাল গত হবার পর যাঁরা এলেন, তাঁরা তাঁদের মতো হলেন না। এই সুযোগে অন্যধর্মীরা সংঘারামগুলির মধ্যে প্রবেশ ক'রে ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে তাদের বিতর্ক যুদ্ধে আহ্বান করলো। তাঁরা রাজাকে বিচারক মানলেন। মূর্খ ভিক্ষুরা অন্য-ধর্মীদের কাছে পরাস্ত হলো। তখন বিজয় পুরস্কার রূপে তারা রাজার কাছে দাবী করলো যে, ভবিষ্যতে কোন সংঘারাম আর ঘণ্টা বাজিয়ে বিতর্ক সমাবেশ আহ্বান করতে পারবে না। রাজা তাদের সে দাবী মেনে নিয়ে ভিক্ষুদের উপর সেইরূপ শাস্তি আরোপ করলেন। ফলে ১২ বছর ধরে ঘণ্টা নীরব হয়ে থাকলো।

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে নাগার্জুন বোধিসত্ত্ব থাকতেন। তিনি তখন যুবক। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর তখন বিরাট খ্যাতি। উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ভোগ বিলাস ও সংসার ত্যাগ ক'রে জ্ঞানের পরম সাধনা শুরু করেন ও তার শীর্ষ চূড়ায় ওঠেন। দেব নামে তার একজন শিষ্য ছিল। তিনিও জ্ঞান বুদ্ধির দিক থেকে বিরাট ছিলেন। আধ্যাত্মিক শক্তিও প্রবল ছিল। তিনি অধীর হয়ে বললেন—'বৈশালীতে বুদ্ধের অনুগামীরা বিধর্মীদের কাছে হেরে গিয়ে বারো বছর ধরে কোন ঘণ্টাধ্বনি করেনি। বিধর্মীদের হার মানিয়ে আবার সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের আলোক শিখা জ্বালাবো।'

একথা শুনে নাগার্জুন বললেন—'বৈশালীর বিধর্মীরা অনন্য পণ্ডিত। তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠার মতো যোগ্যতা তোমার এখনো হয়নি। চলো, আমি নিজেই যাবো।'

দেব উত্তর দিলেন—কতকগুলি আগাছাকে দ'লে দেবার জন্য কেন আমরা পাহাড় ছুঁড়তে যাবো। আমি যতটুকু শিক্ষা পেয়েছি তা-ই তাদের চুপ করিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। অন্তত আমার নিজের সেই রকমই ধারণা। আচার্য বরং বিধর্মীদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি করুন। আমি আপনার সব যুক্তি তাত্ত্বিকভাবে খণ্ডন করাবার চেষ্টা করবো। এর ফলাফল কি হয় দেখুন। তারপর না হয় ঠিক করবেন আমি যাবো কি যাবো না।'

নাগার্জুন তখন বিধর্মীদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি শুরু করলেন ও দেব তা একে একে কেটে চললেন। এভাবে সাতদিন তর্ক চলার পর নাগার্জুন দেবের কাছে হার মানলেন। তিনি তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন—মিথ্যা বুনিয়াদের উপর কোন কিছু বেশি দিন টিঁকে থাকতে পারে না। তাই ভুল মতবাদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করা শক্ত। দেব, তুমিই তাদের হারাতে পারবে।'

দেব তখন বৈশালী যাত্রা করলেন।

দেব আসছেন খবর পেয়ে বৈশালীর বিধর্মীরা রাজাকে প্রভাবিত ক'রে এরূপ আদেশ জারী করলেন যে, অন্য রাজ্যের কোন বৌদ্ধ শ্রমণ এরাজ্যে আসতে পারবে না।

দেব তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশ ত্যাগ ক'রে অন্য বেশে শহরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সংঘারামে কেউ তাঁর পরিচিত না থাকায় সেখানে রাতের আশ্রয় জুটলো না। বাধ্য হয়ে ঘণ্টা স্তূপে তিনি রাত কাটালেন ও পরদিন খুব ভোরে উঠে প্রাণপণ ঘণ্টা বাজিয়ে চললেন। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। ভিক্ষুরা যখন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, আগন্তুক একজন বিদেশাগত ভিক্ষু, তখন তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত সংঘারাম থেকে ঘণ্টাধ্বনি শুরু করলেন।

রাজার লোকেরা যখন এজন্য জবাবদিহি চাইলেন, দেব উত্তর দিলেন—সমাবেশের জন্য ঘণ্টাধ্বনি করা হয়েছে। এছাড়া আর কিসের জন্য ঘণ্টাধ্বনি করা হয় ?'

রাজ-কর্মচারীরা বললেন—'আগের কালে তর্কযুদ্ধে হেরে যাবার দরুণ ঘণ্টাধ্বনি করা বারণ হয়ে গেছে। ১২ বছর সেই মতোই কেটেছে।'

দেব বললেন—'তাই নাকি! তবে আমি নতুন করে ধর্মভেরী বাজালাম।

দূত গিয়ে রাজার কাছে একথা নিবেদন করলো।

রাজা সমাবেশের আয়োজন করলেন। সর্ত দিলেন যে পক্ষ পরাজিত হবে তাকে মেরে ফেলা হবে।

এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে দেব অন্য ধর্মীদের পরাস্ত করলেন।

রাজা ও তাঁর মন্ত্রীবর্গেরা খুশী হয়ে দেবের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য এই স্মারকটি গড়েন।

যেখানে ঘণ্টাধ্বনি করা হয়েছিল সেখানে তৈরী স্তূপটির উত্তরদিকে একটি পুরানো ভিত রয়েছে। এখানে এক প্রেতসিদ্ধ ব্রাহ্মণের বাস ছিল। প্রেতসিদ্ধ বলে সে সবাইকে তর্কযুদ্ধে হারিয়ে খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু অশ্বঘোষ বোধিসত্ত্ব তাকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত করেন।

পুরানো সংঘারামের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ১০০ লি মতো গেলে তিলডক সংঘারামের

দেখা পাওয়া যাবে। এখানে চারিটি মহাকক্ষ, ত্রিতল দর্শন মণ্ড ও বুরুজ সব রয়েছে। বুরুজগুলি কিছুটা অন্তর অন্তর জোড়া-দরজা দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগ করা ; এই দরজা গুলি ভিতরের দিকে খোলে। বিম্বিসার রাজার শেষ বংশধর এটি গড়েন। ধর্ম ও সদগুণ বিস্তারে উচ্চ প্রতিভা বিকাশিত করার জন্য তিনি অনেক কিছু করেন। কাছের ও দূরের বিভিন্ন শহর থেকে জ্ঞানীগুণীরা দল বেঁধে এখানে আসতেন ও এই সংঘারামে বাস করতেন।

এখন এই সংঘারামটিতে হাজারজন ভিক্ষু থাকেন। সকলেই মহাযানের অনুগামী। এর মাঝের ফটকটির সামনের রাস্তায় তিনটি বিহার আছে। এগুলির শীর্ষে পর পর যুক্ত থাকা ধাতুবলয়ের ঘের রয়েছে। বলয়গুলি যেন শূন্যে ঝোলানো। সেগুলিতে আবার ঘণ্টা আটকানো রয়েছে। বিহার তিনটিকে আগাগোড়া ধাপ ধাপ সাজিয়ে বসানো হয়েছে। তাদের চারিদিকে লোহার বেস্টনী রয়েছে। দরজা, জানালা, থাম, কড়িকাঠ ও সিঁড়ি সব জায়গায় গিলটি করা, তামা দিয়ে উঁচল ভাস্কর্য করা ও ফাঁক-গুলি অতি সুন্দর কারুকাজে ভরা। মাঝের বিহারটিতে তিরিশ ফুট মতো উঁচু একটি দাঁড়ানো বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে। বাঁদিকের বিহারে তারা বোধিসত্ত্বের মূর্তি, ডাইনের বিহারে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্তি। এ মূর্তি দুটি ধাতু পাথর দিয়ে তৈরী। তাদের আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জক চেহারা এক অদ্ভুত ও বিস্ময় মেশানো ভাব জাগায় ও তা মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি বিহারে এক কুনকে (Measure) করে দেহাবশেষ রয়েছে।

তিলডক সংঘারামের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রায় ৯০ লির কাছাকাছি যাবার পর আমরা একটি বিরাট পাহাড়ের দেখা পাই। এর চূড়াগুলি নীল মেঘে ঘেরা ও বুক জুড়ে ছায়া-আঁধার জাগানো ঘন বন জঙ্গলের সমারোহ। এটি দেবর্ষিদের এক বিচরণ ক্ষেত্র। দুর্দান্ত প্রকৃতির নাগেরা ও বিষাক্ত সাপ এখানকার গুহা মধ্যে বাস করে। অসংখ্য পশু ও শিকারযোগ্য পাখি এই অরণ্য মধ্যে থাকে। পাহাড় চূড়ায় একটি বিশেষ উল্লেখ করার মতো বড় পাথর আছে। এর উপর দশ ফুটের মতো উঁচু একটি স্তূপ রয়েছে। বুদ্ধদেব এখানে সমাধিগ্রস্ত হন। পুরাকালে তথাগত যখন বায়ুদেহে বা সূক্ষ্ম শরীরে জন্ম গ্রহণের জন্য অবতরণ করেন তখন তিনি এই পাথরের উপর বিশ্রাম নেন। ঐ সময়ে তিনি এখানে 'পূর্ণলীন' সমাধিগ্রস্ত হয়ে সারারাত কাটান। দেবতা ও মুনি-ঋষিরা তখন তথাগতকে পূজার্ঘ নিবেদন করেন। স্বর্গ থেকে সুমধুর সংগীত ও তালে তালে বাজনার ধ্বনি ভেসে আসতে থাকে ও সাথে সাথে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। তথাগত চলে যাবার পর দেবতারা তাকে পূজার্ঘ নিবেদনের জন্য সোনা রূপা ও দামী

দামী রত্ন পাথর দিয়ে একটি স্তূপ তৈরী করলেন। তারপর অনেক কাল পার হয়ে যাবার দরুন স্তূপটি এখন পাথরে পালটে গেছে।

পাহাড়টির পূর্বদিককার চূড়ায় একটি স্তূপ আছে। একসময়ে তথাগত এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মগধদেশ অবলোকন করেন।

পর্বতটি থেকে উত্তর-পশ্চিমে ৩০ লির কাছাকাছি গেলে একটি পাহাড়ের ঢালের দিকে একটি সংঘারাম রয়েছে। এটি একটি ছোট খাড়া পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এর উঁচু দেয়াল ও বুরুজগুলি পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চাশজনের মত ভিক্ষু এখানে থাকেন দেখলাম। সকলেই মহাযানের অনুগামী। গুণমতি বোধিসত্ত্ব এখানেই বিধর্মীদের পরাজিত করেন।

এখান থেকে ২০ লি মতো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গেলে আমরা একটি নিরালা পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়াই। এখানে শীলভদ্র নামে একটি সংঘারাম আছে। শাস্ত্রাচার্য শীলভদ্র তর্কযুদ্ধে বিজয় লাভ করে যে শহরটি দান হিসেবে পান তার অর্থ দিয়ে এই সংঘারামটি গড়ে তোলেন। স্তূপের মতো দেখতে একটি এক-শীর্ষ পাহাড়ের পাশে এটি তৈরী করা হয়েছে। এখানে বুদ্ধের কিছু পূতাস্থি আছে। শাস্ত্রাচার্য সমতট রাজপরিবারের বংশধর। জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি জ্ঞানপ্রিয় ছিলেন ও ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ধর্মীয় সত্যের সন্ধানে ভারত ভ্রমণ শুরু করেন ও এরাজ্যে এসে পড়েন। নালন্দা সংঘারামে এসে হঠাৎ তিনি ধর্মপাল বোধিসত্ত্বের দেখা পান। তাঁর ধর্ম ব্যাখ্যা শুনে শীলভদ্রের উপলব্ধি জন্মাল ও তাঁকে শিষ্য করে নেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। ধর্মপাল তাঁকে শিষ্য করে নিলেন। এরপর শীলভদ্র অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন সমূহের সমাধান খোঁজেন ও এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পদ্ধতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এভাবে তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার চরম শিখরে পেঁছান ও সমকালীন দেশ-বিদেশের লোকদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেন।

দক্ষিণ দেশে একজন বিধর্মী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ধর্মপালের খ্যাতি শুনে তাঁকে হারিয়ে দেবার জন্য আসেন। ধর্মপাল তাঁর সঙ্গে তর্কের লড়াইয়ে নামতে গেলে শিষ্য শীলভদ্র তাঁকে বাধা দিলেন ও তাঁর মুখোমুখি হবার জন্য গুরুর কাছে অনুমতি চাইলেন। ধর্মপাল রাজি হলেন। শীলভদ্র তর্কযুদ্ধে বিধর্মী পণ্ডিতকে হারিয়ে দিলেন। রাজা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এই শহরের রাজস্ব দান করলেন। শীলভদ্র প্রথমে এ দান নিতে ঘোর আপত্তি জানান। কিন্তু পরে রাজার একান্ত আগ্রহের দরুণ তা গ্রহণ করেন। সেই রাজস্ব দিয়ে এই বিরাট ও চমৎকার সংঘারামটি বানান।

শীলভদ্র সংঘারামটি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লি পথ হাঁটার

পর নৈরঞ্জনা নদী (বর্তমান ফল্‌গু নদী) পার হয়ে গয়া শহরে এসে পৌঁছলাম। এই শহরটি পাহাড় ঘেরা বলে প্রাকৃতিক ভাবেই সুরক্ষিত। জনবসতি খুবই কম। কেবল হাজার খানেক মতো ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করেন। তাঁরা একজন ঋষির বংশধর। রাজা তাঁদের নিজের অধীন প্রজা বলে মনে করেন না ও প্রত্যেক রাজ্যের লোকেরা তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন।

এ শহরটির উত্তরদিকে ৩০লি মতো গিয়ে একটি নির্মল জলের প্রস্রবণ দেখতে পেলাম। ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে এটি একটি পবিত্র জলাধার। যাঁরা এর জল পান করেন বা এখানে স্নান করেন তাঁদের সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়।

শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ৫ থেকে ৬ লি মতো দূরে গয়া পর্বত তার ছায়া আঁধার মাখা উপত্যকা, খর বয়ে চলা একাধিক নদী আর খাড়াই ও বিপদসংকুল চূড়াগুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতে এই পাহাড়টির চালু নাম হলো ধর্মপাহাড়। এ দেশের রাজা প্রজাদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা লাভ এবং বিগত রাজাদের চেয়ে বেশী খ্যাতি লাভের জন্য এই পাহাড়ে এসে ধর্মানুষ্ঠানসহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এখানকার রাজবংশ মধ্যে এই প্রথা বহুকাল ধরে চলে আসছে। এই পর্বতের শীর্ষে একশো ফুট উঁচু একটা স্তূপ আছে। রাজা অশোক এটিকে গড়েন।

গয়া পর্বতের দক্ষিণ-পূবে একটি স্তূপ রয়েছে। কাশ্যপ এখানে জন্ম নেন। এর দক্ষিণে আরো দুটি স্তূপ আছে। এখানে গয়া কাশ্যপ ও নান্দী কাশ্যপ অগ্নি উপাসক রূপে যাগযজ্ঞ করতেন।

গয়া কাশ্যপ যেখানে যাগযজ্ঞ করতেন সেখান থেকে পূর্বদিকে একটি বড়ো নদী পার হয়ে প্রাগ্‌বোধি পাহাড়ে এলাম। তথাগত ছ'বছর কৃচ্ছ্র সাধনা করে সেপথে পরম জ্ঞানের আলোক না পেয়ে তা ছেড়ে দিয়ে সুজাতার দেয়া পায়সান্ন খেলেন। তারপর উত্তর দিকে যেতে যেতে এই পাহাড়টি চোখে পড়লো। তিনি দেখলেন পাহাড়টি একেবারে নিরালা, নির্জন ও ছায়া-আঁধার ঘেরা। তাই তিনি এখানে বসে জ্ঞানের আলোক সন্ধানের মন করলেন। উত্তর-পূর্বদিকের ঢাল বেয়ে তিনি উপরে উঠে এলেন। সহসা পৃথিবী দুলে উঠলো পাহাড়টি থর থর করে কেঁপে চললো। তখন ভয় পেয়ে পর্বতদেব তাঁকে বললেন—'এ পর্বত পরম জ্ঞান লাভের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা নয়। যদি তুমি এখানে থেকে বজ্র সমাধি আরম্ভ করো তবে ভূমিকম্প হয়ে চলবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হবে ও পর্বত তোমার উপর ভেঙে পড়বে।'

বোধিসত্ত্ব তখন নেমে আসতে শুরু করলেন। দক্ষিণ-পূর্বদিকের ঢাল বেয়ে আধা আধি নেমে দাঁড়িয়ে গেলেন। পিছনে পাহাড় ও সামনে খর বেগে বয়ে চলা নদীর পরি-

বেশ মধ্যে একটি পাহাড়ী গুহা দেখতে পেলেন। এখানে তিনি আসন করে বসলেন। পৃথিবী ও পর্বত আবার থরথর কেঁপে উঠলো। তখন শুদ্ধ বস্ত্র পরিহিত এক দেবতা আকাশবাণী শোনালেন—'এ জায়গাটি একজন তথাগতের পরম জ্ঞান লাভের সহায়ক নয়। এখান থেকে ১৪-১৫ লি মতো দূরে তোমার কৃচ্ছ্র সাধনা পীঠের কাছে একটি অশ্বত্থ গাছ দেখতে পাবে। এর নীচে বজ্রাসন রয়েছে। অতীতের সব বুদ্ধ সেখানেই সেই বজ্রাসনের উপর বসে পরম জ্ঞান লাভ করেছেন। যাঁরা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হবেন তাঁরাও সেখানে বসেই পরম জ্ঞান লাভ করবেন। তুমি সেই জায়গাটিতে চলে যাও।

বোধিসত্ত্ব তখন যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তাই দেখে ওই গুহানিবাসী নাগ তাঁকে বললো—'এই গুহাটি এক মনোরম ও পবিত্র জায়গা। এখানে বসেই তোমার অভীষ্ট পূরণ হবে। তুমি করুণা করে আমায় ছেড়ে চলে যেও না।'

আপন অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে এ স্থান অনুকূল নয় বুঝতে পেরে বোধিসত্ত্ব এখান থেকে চলে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলেন। তবে যাবার সময় নাগকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপন ছায়া রেখে গেলেন। দেবতারা আগে আগে পথ দেখিয়ে তাঁকে বোধিবৃক্ষের কাছে নিয়ে চললেন।

অশোক রাজা হবার পর এ পর্বতের যে সব জায়গায় বোধিসত্ত্ব এসেছিলেন সে সমস্ত জায়গায় স্তম্ভ ও স্তূপ গড়ার আদেশ দেন। প্রত্যেক বছর বর্ষাবাস সমাপ্তি দিনে সাধারণ উপাসকেরা বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে এসে জড়ো হয়। পাহাড়ের উপর চড়ে বুদ্ধদেবকে পূজা দেয়। একরাত এখানে কাটিয়ে তারা চলে যায়।

প্রাগ্‌বোধি পর্বত দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ১৪-১৫ লি মতন গেলে আমরা বোধিবৃক্ষের দর্শন পাই। অনেক উঁচু, খাড়া আর মজবুত ইটের দেয়াল দিয়ে এটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে। জায়গাটির পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আর উত্তর-দক্ষিণে সরু। প্রায় ৫০০ পা মতো গোলাকার ধরণের। নানা বিরল জাতের নাম করা ফুল গাছের ফুল ও ছায়া জায়গাটিকে স্নিগ্ধ করে রেখেছে। কচি দূর্বাঘাস ও আরো নানারকম গুল্ম-লতা জমির বুকে সবুজ গালিচা বানিয়ে দিয়েছে। ভিতরে যাবার মূল ফটকটি নৈরঞ্জনা নদীর বিপরীত দিকে, পূবে। দক্ষিণের ফটকটির দিকে নদীর উপকূলটি ফুলে ভরা। পশ্চিমদিকে পুরোপুরি বন্ধ, পাঁচিল এত উঁচু যে তা ডিঙোন অসম্ভব।

উত্তরের ফটকটি একটি বিরাট সংঘারামের মধ্যে। ঘের দেয়াল দেয়া পরিসর মধ্যে নানা পবিত্র স্মৃতি-স্মারক একের পর এক গা ঘেঁষাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে স্তূপের সারি, ওখানে বিহারের সমারোহ। সারা জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন রাজা, মহারাজা ও নামকরা লোকেরা এখানে এগুলি গড়ে গেছেন।

দেয়াল দিয়ে ঘেরা বোধিবৃক্ষের পরিসরের মাঝখানে বজ্রাসন।

বুদ্ধের নির্বাণ পরে বিভিন্ন দেশের রাজারা চলিত পরম্পরা থেকে বজ্রাসনের প্রকৃত মাপ জানতে পেরে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সীমানা নির্ধারণ ক'রে তার নিশানা রূপে দুদিকে অবলোকিতেশ্বরের দুটি মূর্তি বসিয়েছেন। দুটি মূর্তিই পূবমুখী হয়ে বসে আছে।

প্রাচীন লোকেরা বলে থাকেন যে অবলোকিতেশ্বরের এই মূর্তি দুটি যখন পুরো-পুরি মাটিতে বসে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে তখন বৌদ্ধ ধর্ম লোপ পাবে। দক্ষিণের মূর্তিটি এখন বুক পর্যন্ত বসে গেছে। বজ্রাসনের উপরের বোধিবৃক্ষটি একটি অশ্বত্থ গাছ (পিপল)। পুরাকালে বুদ্ধের সময়ে গাছটি কয়েকশো ফুট উঁচু ছিল। তারপর একেপ্রায়ই কেটে ফেলা হয়েছে। তাসত্ত্বেও এখনো এটি ৪০ থেকে ৫০ ফুট উঁচু। বুদ্ধ এর নিচে বসে সম্যক সম্বোধি বা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন বলে একে জ্ঞানের বৃক্ষ বা বোধি-বৃক্ষ বলা হয়। এ গাছের বাকল হলদেটে-সাদা, পাতা গাঢ় সবুজ রঙের। কি শীত কি গ্রীষ্ম কোন ঋতুতেই এর পাতা ঝরে পড়ে না। সবসময় সেগুলি তেলতেলে চিকণ, কখন কোন হেরফের নেই। কিন্তু প্রত্যেক বছর বুদ্ধের নির্বাণ তারিখটি এলে পাতাগুলি হলদে হয়ে ঝরে পড়ে ও মুহূর্তের মধ্যে আবার নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে ও আগের চেহারা ফিরে পায়। এই দিনটিতে বিভিন্ন দেশের রাজারা ও অসংখ্য ধর্মানুরাগী চার দিক থেকে কাতারে কাতারে এসে এখানে জমা হন। বোধিবৃক্ষের পাদদেশে সুগন্ধি জল ও সুরভিত দুধ দিয়ে ধুইয়ে দেয়া হয়। সবাই স্তবগান করে ফুল ছড়ায়, সুগন্ধি ধূপধুনো জ্বালায়। রাতে মশালের আলোয় জায়গাটি আলোকিত হয়ে ওঠে। নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সহ পুজো ও উপহার নিবেদন করা হয়।

তথাগতের নির্বাণ লাভের পরেরকার কথা। অশোক রাজা হলেন। এই সময়ে তিনি বিধর্মী ছিলেন। তাই বোধিবৃক্ষটিকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য মন করলেন। সসৈন্যে এখানে এসে এটিকে কেটে একেবারে কুঁচি কুঁচি করে এ জায়গাটি থেকে দশ পা পশ্চিমে তাকে গাদা করলেন। তারপর এক ব্রাহ্মণকে ডেকে সেগুলি যজ্ঞে আহুতি দেবার আদেশ দিলেন। কিন্তু যজ্ঞাগ্নির ধোঁয়া মিলিয়ে যেতে না যেতে আগুনের শিখা থেকে একটি জোড়া গাছের আবির্ভাব হলো। গাছটির পাতা ও ডালপাতা পালকের মতো ঝলমল করছিল বলে এর নাম দেয়া হলো—'ভস্ম বোধিবৃক্ষ'। রাজা অশোক এ অলৌকিক কান্ড দেখে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেন। তখন তিনি পুরানো বোধি-বৃক্ষের শিকড় গুলিতে সুরভিত দুধ ঢালার ব্যবস্থা করলেন যাতে গাছটি আবার গজিয়ে উঠতে পারে। অবাক কান্ড পরের দিনই দেখা গেল যে, গাছটি ঠিক আগের মতই তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। রাজা সে দৃশ্য দেখে এতো অভিভূত হয়ে পড়লেন যে,

নিজেই তাকে পূজার্ঘ নিবেদন ক'রে চললেন। এনিয়ে এরূপ আনন্দবিহ্বল হয়ে রইলেন যে রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবার কথাই তিনি ভুলে গেলেন।

রাজা অশোকের মহিষীও একজন গোড়া বিধর্মী ছিলেন। তিনি গোপনে একজন লোক পাঠিয়ে এক মধ্য রাতে আবার গাছটিকে কেটে ফেললেন। পরদিন সকালে রাজা অশোক পূজা দিতে এসে গাছটির ওই অবস্থা দেখে খুব মর্মাহত হলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানিয়ে তার গোড়ায় সুরভিত দুধ ঢাললেন। একদিন পার হতে হতেই গাছটি আবার গজিয়ে উঠলো। রাজা এই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন গাছটির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে তার চারদিক ১০ ফুটেরও বেশি উঁচু পাথরের (ইটের) দেয়াল দিয়ে ঘিরে দিলেন। এ দেয়াল আজও দেখা যায়।

এরপর বিধর্মী শশাঙ্ক রাজা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি নাশ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি সংঘারামগুলি ভেঙে ফেললেন ও বৌদ্ধবৃক্ষটিকে কেটে তার গোড়া খুঁড়ে পৃথিবীর উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত চলে গেলেন। তবু তিনি এর শিকড়ের শেষ মাথা পর্যন্ত পেঁছিতে পারলেন না। তখন তিনি এটিকে আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে তার উপর আখের রস (গুড়) ঢেলে দিলেন যাতে গাছটি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

রাজা অশোকের শেষ বংশধর মগধরাজ পূর্ণবর্মা এ খবর শুনে দুঃখ পেলেন। কয়েক মাস পরে তিনি গাছের শিকড় গুলিতে এক হাজার গরুর দুধ ঢাললেন। এক রাতের মধ্যে গাছটি আবার গজিয়ে ১০ ফুটের মতো লম্বা হয়ে গেল। পাছে আবার কেটে ফেলা হয় সেই ভয়ে তিনি তার চারদিকে ২৪ ফুঠ উঁচু পাথরের দেয়াল তুলে দিলেন। গাছটি এখন ২০ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

বোধিবৃক্ষের পূর্বদিকে ১৬০ থেকে ১৭০ ফুট একটি বিহার আছে। এতে ভিত সামনের দিকে ২০ পায়েরও বেশি। নীল রঙা টালি (ইট) ও চুন দিয়ে এটিকে তৈরী করা হয়েছে। এর বিভিন্ন থাকগুলির কুলুঙ্গীতে সোনার মূর্তি রয়েছে। সৌধের চারিদিক অবাক করে দেবার মতো নানা কারুকাজে ভরা। কোথাও মুক্তার মালা কোথাও বা দেবর্ষিদের মূর্তি। বিহারটি গিলটি করা তামা দিয়ে বানানো একটি আমলক ফল দিয়ে পুরোটা ঘেরা।

বিহারটির অংশ রূপে তার পূর্বদিকে একটি বহুতল মণ্ডপ রয়েছে। তার গায়ে থাকা কুলুঙ্গীগুলি একের উপর এক তিন তলা সমান পর্যন্ত উপরে উঠে গেছে। কুলুঙ্গী, থাম, কড়িকাঠ, দরজা ও জানাগুলি সব সোনা ও রূপার কারুকাজ করা, জোড়ের মুখ গুলিতে মুক্তা ও রত্ন বসানো। এর আবছা আঁধার ভরা কক্ষগুলি ও রহস্যময় মহাকক্ষগুলিতে তিনটি তলাতেই দরজা রয়েছে। বাইরের ফটকের ডাইনে ও বাঁয়ে ঘরের মতো

বড়ো বড়ো কুলঙ্গী। বাঁদিকে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের ও ডানদিকে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্তি। সেগুলি সীসা দিয়ে তৈরী ও দশ ফুট মতো উঁচু। বর্তমান বিহার যেখানে রয়েছে সেখানে অশোক রাজা প্রথম একটি ছোট বিহার বানিয়েছিলেন। তারপর একজন ব্রাহ্মণ বিরাট ভাবে এটিকে তৈরী করেন। এই ব্রাহ্মণ প্রথমে বুদ্ধের অনুগামী ছিলেন না, তিনি মহেশ্বরের পূজা করতেন। মহেশ্বর তুষারাবৃত পর্বতমালা উপরে থাকেন শুনে তাঁরা দুভাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা জানাতে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। মহেশ্বর বললেন—'যে লোকের কোন পুণ্য কর্ম নেই, তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করা সম্ভব নয়। তোমরা আগে কিছু পুণ্য কর্ম করে এসো।' ব্রাহ্মণ যখন জানতে চাইলেন কী রূপ পুণ্য কর্ম করলে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। মহেশ্বর তাঁদের বোধিবৃক্ষের কাছে একটি বড়ো বিহার ও বড়ো পুকুর বানাতে বললেন।

দেব আদেশে বড়ো ভাই বিহারটি গড়লেন ও ছোট ভাই পুকুরটি খুঁড়লেন। পুণ্য কর্মের ফল হাতে হাতে ফললো। ব্রাহ্মণ রাজার মন্ত্রীপদ পেয়ে গেলেন। তিনি তার সব বেতন দান ধ্যানে ব্যয় করতে থাকলেন।

বিহারটি তৈরী শেষ হলে ব্রাহ্মণ সেখানে তথাগত বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ মুহূর্তের মূর্তি বসাবেন ঠিক করলেন। এ মূর্তি গড়ার জন্য দেশ বিদেশের সেরা শিল্পীদের ডাক দিলেন। কিন্তু কেউই সাহস ক'রে এগিয়ে এলো না। ব্রাহ্মণ যখন নিরাশ হতে বসেছেন এমত সময় সহসা একজন ব্রাহ্মণ এসে সেই মূর্তি গড়তে চাইলেন। তিনি বললেন— 'বিহার মধ্যে এক স্তূপ সুরভিত মাটি রাখো ও একটি প্রদীপ জেবলে দাও। আমি ভিতরে ঢোকার পর বিহারের দরজা বন্ধ করে দেবে। ছ'মাস পার হয়ে গেলে তবে দরজা খুলবে।

ব্রাহ্মণের নির্দেশ মতো সব কিছু করা হলো। কিন্তু চার মাস পার হয়ে যাবার পর হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনায় বিস্মিত হয়ে সবাই মিলে মন্দিরের দরজা খুলে ফেললো। খুলে বিহারের মধ্যে তারা বুদ্ধের একটি অপরূপ মূর্তি দেখতে পেল। মূর্তিটি বসে থাকা ভঙ্গিমার। পায়ের ডান পাতাটির উপরে বাঁ হাতটি ভর দেয়া, ডান হাতটি নিচের দিকে ঝুলছে। পূর্বমুখী হয়ে বসে থাকা এই মূর্তিটি তাঁর জীবন্তকালের মতোই করুণাকর চেহারার। যে সিংহাসনে তিনি বসে আছেন সেটি ৪'-২" উঁচু ও ১২'-৫" চওড়া। মূর্তি ১১'-৫" উঁচু দুটি হাঁটুর একপাশ থেকে অন্য পাশ ৮'-৮" ও দুই কাঁধ ৬'-২"। বুদ্ধের বিশেষ লক্ষণগুলি সব ঠিক ঠিক বর্তমান। মুখের করুণাময় অভিব্যক্তি জীবন্তকালের মতো। দক্ষিণ বুকের দিকটি পুরোপুরি শেষ করা হয়নি। মন্দির মধ্যে ব্রাহ্মণকে আর খুঁজে না পেয়ে সবাই বুঝলেন—এ পুরোপুরি অলৌকিক ঘটনা। একজন শ্রমণ এরই কাছেপিঠে সেদিন রাত কাটিয়েছিলেন। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব

তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানালেন যে এমূর্তি মানুষের গড়া অসম্ভব বলে তিনিই ব্রাহ্মণবেশে সেখানে গিয়ে এটি বানিয়ে দিয়েছেন। সকলে সে কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেল।

এরপর বুকের উপরে যে অংশটুকু অসমাপ্ত থেকে গেছে, সেখানটা নানা দামী পাথর ও রত্ন খচিত একটি হার দিয়ে ঢেকে, মাথায় অতি মূল্যবান রত্নমালা ছড়িয়ে দেয়া হলো।

রাজা শশাঙ্ক যখন বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলেন তখন এই মূর্তিটিকেও নষ্ট করে ফেলার মন করেন। কিন্তু মূর্তিটির অপরূপ সুষমা দেখে তাঁর মন টলে উঠলো ও সংকল্পচ্যুত হয়ে দেশাভিমুখে ফিরে গেলেন। পথে এক আমাত্যকে তিনি বললেন— বুদ্ধের ওই মূর্তিটি সরিয়ে নিয়ে একটি মহেশ্বর মূর্তি বসাতে হবে।

আমাত্য এ আদেশ পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়লেন। বুদ্ধের মূর্তি নষ্ট করলে কল্পকাল ধরে দুর্ভোগ ভুগতে হবে। আবার রাজার আদেশ না মানলে এ জন্মেই সে তাকে মেরে ফেলবে ও সারা পরিবার নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তিনি তখন একজন বুদ্ধ অনুরক্তকে ডেকে বুদ্ধমূর্তি থাকা কক্ষের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে সামনের দিকটা একটি ইটের দেয়াল গেঁথে দিলেন ও সেখানে মহেশ্বরের মূর্তি এঁকে দিলেন (অথবা একটি মূর্তি গড়লেন)।

কাজ শেষ করে তিনি গিয়ে মহারাজকে খবর দিলেন। রাজা শশাঙ্ক সে কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তার সারা শরীরে ঘা দেখা দিল। মাংস পচে পচে খসে পড়তে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

এরপর সামনের দেয়াল ভেঙে ফেলা হলো। যদিও কয়েকদিন এর মধ্যে পার হয়ে গেছে তবু দেখা গেল যে প্রদীপটি তখনো অম্লান জ্বলে চলেছে।

মূর্তিটি দেব-শিল্পমতে তৈরী হয়েছে বলে এখনো নিখুঁত অবস্থায় আছে। একটি অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মূর্তিটি বসানো। তার মধ্যে সব সময় প্রদীপ ও মশাল জ্বলে চলেছে। মূর্তিটিকে ভালভাবে দেখার জন্য কক্ষের মধ্যে ঢোকার নিয়ম নেই। একটি বড়ো আয়না নিয়ে সকালবেলা সূর্যালোক প্রতিফলিত করে তার সাহায্যে দেখতে হয়। যারাই সে মূর্তি দর্শন করে তাদের ধর্মানুরাগ বহু পরিমাণে বেড়ে যায়।

তথাগত সম্যক সম্বোধি লাভ করেন বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের অষ্টম দিনে। আমাদের চীনা পাঞ্জিকা মতে বছরের তৃতীয় মাসের অষ্টম দিন। কিন্তু স্থবির শাখানুবর্তীদের মতে দিনটি ছিল বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের ১৫ তারিখ। চীনা পাঞ্জিকা মতে দাঁড়ায় বছরের তৃতীয় মাসের ১৫ তারিখ। তথাগতের বয়স তখন তিরিশ বছর। মতান্তরে ৩৫ বছর।

বোধিবৃক্ষের উত্তরদিকে একটি জায়গা আছে যেখানে বুদ্ধ চলাফেরা করে বেড়িয়েছেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর তথাগত আসন থেকে উঠে আসেননি। তিনি পুরো সাতদিন সেখানে মৌন ভাবাবেশে সমাধিমগ্ন থাকেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গাছটির উত্তরদিকে পূব থেকে পশ্চিমমুখী দশ পা মতো জায়গায় ৭ দিন ধরে পায়চারি করে চলেন। তাঁর পদচিহ্নের নিচ থেকে ১৮টি অলৌকিক ফুল দেখা দেয়। পরে এই জায়গাটি তিন ফুট উঁচু ইটের দেয়াল দিয়ে ঢাকা দেয়া হয়। অনেককাল থেকে চলে আসা ধারণা অনুসারে এই ঢাকা দেয়া জায়গাটি যে কোন লোকের আয়ু নির্দেশ করে। তা জানার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন ক'রে জায়গাটি মাপতে হয়। আয়ুর কমবেশী অনুসারে মাপ কমবেশি হবে।

বুদ্ধ যেখানে পায়চারি করেন সেখান থেকে উত্তরে রাস্তার বাঁদিকে একটি বড়ো পাথর আছে। এর উপরে একটি বুদ্ধের মূর্তি আছে। মূর্তিটি উপরের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে। তথাগত বুদ্ধত্ব লাভের পর ৭ দিন ধরে বোধিবৃক্ষের দিকে ওইভাবে চেয়ে থাকেন। এই সময় মধ্যে তিনি ক্ষণেকের জন্যও বোধিবৃক্ষ থেকে তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নেন নি। এভাবে চেয়ে থেকে তিনি বোধিবৃক্ষকে তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানান।

বোধিবৃক্ষ থেকে অল্প একটুখানি গেলে পশ্চিমদিকে একটি বড়ো বিহার দেখা যাবে। তার মধ্যে পিতলের তৈরী একটি বুদ্ধমূর্তি আছে। মূর্তিটি দুর্লভ রত্ন খচিত ও পূবমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। এর সামনে অদ্ভুত আকৃতিতে কাটা ও নানা চিহ্ন আঁকা একটি নীলরঙা পাথর আছে। বুদ্ধ 'সম্যক সম্বোধি' লাভের পর ব্রহ্মা এখানে বহুমূল্য সপ্তবস্তু দিয়ে একটি মহাকক্ষ গড়িয়ে দেন ও সেখানে ইন্দ্রের তৈরী সপ্তরত্ন নির্মিত সিংহাসনে বুদ্ধ বসেন। এখানে তিনি 'সম্যক সম্বোধি' লাভের প্রতিক্রিয়ায় ৭ দিন আচ্ছন্নের মতো কাটান। তখন তাঁর শরীর থেকে এক বিচিত্র আভা ফুটে বেরোয় ও তা বোধিবৃক্ষটিকে ঝলমল করে তোলে। পরম জ্ঞানীর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পর অতি দীর্ঘকাল পার হয়ে গেছে, আর তার ফলে রত্নগুলি সব পাথর পালটে গেছে।

বোধিবৃক্ষ থেকে একটুখানি দক্ষিণে গেলে ১০০ ফুট মতো খাড়া একটি স্তূপ চোখে পড়বে। অশোক রাজা এটিকে গড়েন। বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান ক'রে বোধিবৃক্ষেরদিকে এগিয়ে চলেন। তখন তাঁর মনে ভাবনা এলো কিসের উপরে তিনি বসবেন। ঠিক করলেন সকাল হলে তিনি ঘাসের (কুশ তৃণ ?) খোঁজ করবেন। তখন ইন্দ্র রাজা ঘাস কাটালির ছদ্মবেশে একবোঝা ঘাস নিয়ে হাজির হলেন। বোধিসত্ত্ব তার কাছে

ঘাসের বোঝাটি চাইলেন। ছদ্মবেশী ইন্দ্র তাঁকে তা দিয়ে দিলেন। বোধিসত্ত্ব তা নিয়ে বোধিবৃক্ষের দিকে এগিয়ে চললেন।

এ রাজ্যটি থেকে একটুখানি উত্তরদিকে একটি স্তূপ আছে। বোধিসত্ত্ব সম্যক জ্ঞান লাভের আগে এখানে একদল নীল (রোহিন ?) পাখিকে উপরে উঠে শুভ নির্দেশ সূচক-ভাবে উড়তে দেখেন। ভারতে যেসব সংকেতকে শুভ মনে করা হয় এটি তার মধ্যে সেরা। বোধিবৃক্ষের পূর্বদিকে বড়ো রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে দুটি স্তূপ আছে। এখানে মার রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। সে প্রথমে তাকে রাজ-চক্রবর্তী করে দেবার লোভ দেখায়। সে বিফল হয়ে ফিরে গেলে তার কন্যারা প্রলুব্ধ করতে আসে। বোধিসত্ত্ব তখন তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাদের রূপ পালটে বৃদ্ধা রমণী করে দিলেন। তারা তখন লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হল।

বোধিবৃক্ষের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি বিহার মধ্যে কাশ্যপ বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে।

এই বিহারটির উত্তর-পশ্চিমে দুটি ইটের তৈরী ঘর আছে। তার প্রত্যেকটিতে পৃথিবীদেবের মূর্তি রয়েছে। পুরাকালে সত্য জ্ঞান লাভের আগে 'মার' যখন বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করার অপচেষ্টা করে, তখন তিনি বুদ্ধের হয়ে সাক্ষী থাকেন। লোকে এজন্য পরে তাঁর অপরূপ মূর্তি বানিয়ে এখানে স্থাপনা করে (মূর্তি বা চিত্র)।

বোধিবৃক্ষের দেয়ালের উত্তর-পশ্চিমদিকে কুঙ্কুম স্তূপ। এটি ৪০ ফুটের মতো উঁচু। 'সাও-কিউ-চু' (সোকুট) দেশের একজন শ্রেষ্ঠী এটি গড়েন।

বোধিবৃক্ষ দেয়ালের দক্ষিণ-পূবদিকে একটি বটগাছের পাশে একটি স্তূপ আছে। পাশে একটি বিহার মধ্যে বুদ্ধদেবের বসে থাকা ভঙ্গিমায় মূর্তি রয়েছে। সম্যক সম্বোধি লাভের পর বুদ্ধদেবকে ব্রহ্মা এখানে ধর্মব্যাখানের জন্য প্রথম অনুপ্রাণিত করেন।

বোধিবৃক্ষের ঘের-দেয়ালের মধ্যে চারকোণে চারটি বড় স্তূপ রয়েছে। শুভ সূচক ঘাস (কুশ তৃণ) পেয়ে তথাগত যখন বোধিবৃক্ষের চারিদিকে বর্গাকারে প্রদক্ষিণ করলেন তখন বিশাল পৃথিবী থর থর কেঁপে চললো। যেই তিনি বজ্রাসনের কাছে এলেন, অমনি মাটির কাঁপন থেমে গিয়ে সব চুপচাপ।

ঘের-দেয়ালের মধ্যে এত বেশি পবিত্র স্মারক রয়েছে ও সেগুলি এত বেশি গা ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে যে, প্রত্যেকটির কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা দুঃসাধ্য।

বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে দেয়ালের বাইরে একটি স্তূপ চোখে পড়বে। বুদ্ধদেবকে যে দুই গোপকন্যা পায়সান্ন খেতে দিয়েছিল, এটি তাদের পুরানো ভিটে। এর পাশে আরেকটি স্তূপ আছে। সেখানে গোপকন্যারা পায়েস রান্না করে। এর পাশে একটি জায়গায় তথাগত সেই পায়সান্ন গ্রহণ করেন।

বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ ফটকের বাইরে ৭০০ পা মতন গোলাকার একটি দীঘি রয়েছে। এর জল বেশ টলমলে ও আয়নার মতো স্বচ্ছ। দীঘিটিতে অনেক নাগ ও মাছ রয়েছে। মহেশ্বরের আদেশে সেই ব্রাহ্মণ দুভাই এটি তৈরী করেন।

আরো একটু দক্ষিণে গেলে একটি পুকুর দেখা যাবে। সম্যক জ্ঞানলাভের পর, তথাগতের স্নান করার ইচ্ছা হলো। তখন দেবরাজ অলৌকিক শক্তিবলে বুদ্ধের জন্য এ পুকুরটি করে দিলেন।

পুকুরের পশ্চিমদিকে একটি বড়ো পাথর আছে। বুদ্ধ স্নান সেরে কাপড় ধুলেন। ভাবছেন, কোথায় শুকোতে দেবেন। অমনি পাথরটি এখানে দেখা দিল। তুষারঘেরা পর্বতমালা থেকে ইন্দ্র সেটিকে বুদ্ধদেবের জন্য নিমেষে এনে দিলেন।

পাশেই একটি স্তূপ। স্নানের পরে এক বৃদ্ধার দেয়া কাপড়খানি বুদ্ধদেব এখানে পরেন। আরো দক্ষিণে বনের মধ্যে একটি স্তূপ রয়েছে। বৃদ্ধা রমণী এখানেই বুদ্ধদেবকে ঐ পুরানো কাপড়খানি দেন।

পুকুরটির পূর্বদিকে বনের মাঝে মুচিলিন্দ নাগরাজের সরোবর রয়েছে। জল ঘন নীল রঙের। স্বাদ বেশ মধুর ও তৃপ্তিকর। পশ্চিম তীরে একটি ছোট বিহার রয়েছে। ভিতরে একটি বুদ্ধ মূর্তি দেখা যাবে। বুদ্ধত্ব লাভের পর তথাগত এখানে সম্পূর্ণ শান্ত ও সমাহিত ভাবে সাতদিন ধরে ভাবসাধনা ক'রে কাটান। তখন মুচিলিন্দ নাগরাজ তাকে সতর্কভাবে পাহারা দেয়। নিজের দেহকে সাতপাক কুন্ডলী ক'রে বুদ্ধের শরীর ঘিরে রাখে ও বহু ফণা বিস্তার ক'রে ছাতার মতো তাকে ছায়া দেয়। সরোবরের পূর্বদিকে এই নাগরাজের আবাস।

মুচিলিন্দ সরোবরের পূর্বদিকে বনের মধ্যে একটি বিহারে বুদ্ধদেবের একটি মূর্তি আছে। এতে তাকে বেশ দুর্বল ও কংকালসার দেখানো হয়েছে।

পাশেই একটি জায়গা আছে, সেখানে বুদ্ধ পায়চারি করেন। জায়গাটি ৭০ পা মতন লম্বা, দু'পাশে দু'টি অশ্বত্থ গাছ রয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই ধনী গরিব নির্বিশেষে যে কোনো লোক অসুখে পড়লে এই মূর্তিটিতে সুগন্ধি মাটি লেপন করে। এর ফলে অনেকেই ভাল হয়ে যায়। এই জায়গা-টিতেই বোধিসত্ত্ব কৃচ্ছ্র সাধনায় রত ছিলেন। এখানেই তিনি বিধর্মীদের বশ করেন, মায়ের অনুরোধ শোনেন, তারপর ছ' বছরব্যাপী অনশন আরম্ভ করেন। ওই সময়ে তিনি শুধু একটি করে জোয়ার-দানা ও একটি ক'রে গমের দানা খেতেন। ফলে তাঁর শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে, চোখ মুখ বসে যায়। যে জায়গাটিতে তিনি পায়চারি করতেন সেখান থেকেই তিনি অনশন ভঙ্গের পর গাছের ডালটি নেন।

যে অশ্বত্থ গাছটির কাছে বুদ্ধ অনশন করেন তার কাছাকাছি একটি স্তূপ দেখা যাবে। এখানেই অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পাঁচজন বাস করতেন। রাজকুমার গৃহত্যাগ করার পর প্রথম কিছুকাল পর্বত ও উপত্যকা মধ্যে ঘুরে বেড়ান। তখন তিনি কখনো বা বনের মধ্যে কখনো বা কুয়ার পাশে বিশ্রাম নিতেন। তখন শুদ্ধোদন রাজা ওই পাঁচজনকে সব সময় রাজকুমারকে ছায়ার মতো অনুসরণ ও দেখাশোনা করার ভার দেন। রাজকুমার যখন অনশন-সহ কঠোর তপস্যা সুরু করলেন তখন তার দেখাদেখি অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য ও অন্য চারজনও ওই রকম কষ্টকর তপস্যা সুরু করে।

এ জায়গাটি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে একটি স্তূপ দেখা যাবে। এখান থেকেই বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করতে যান। আর এরই কাছাকাছি একটি জায়গাতে বসে তিনি পায়সান্ন খান।

এর পাশে যে জায়গাটিতে দুজন শ্রেষ্ঠী তাকে আটা ও মধু দান করে, সেখানেও একটি স্তূপ গড়া হয়েছে।

যখন বণিক দুজন বুদ্ধকে আটা ও মধু দিলেন তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে কিসে ক'রে তা নেবেন। তখন চারদিক থেকে চার দেবলোক রাজ এসে তাঁকে একখানি করে সোনার পাত্র যাচলেন। এ রকম দামী পাত্র নেয়া সন্ন্যাসীর মানায় না বলে তিনি তা নিলেন না। তখন তারা একটি ক'রে রূপার পাত্র যাচলেন। তারপব স্ফটিকের পাত্র, তারপর গাঢ় নীল, হালকা লাল, হলুদ এবং রক্ত-গোলাপ রঙের দামী রত্ন দিয়ে তৈরী পাত্র একে একে যাচলেন। কিন্তু ভগবন তার কোনোটিই নিলেন না। তখন চার রাজা প্রাসাদে গিয়ে গাঢ় নীল রঙের পরিচ্ছন্ন পাথরের পাত্র নিয়ে এলেন। কারটি নেবেন তা নিয়ে বিরোধ এড়াবার জন্য তিনি তখন চারিটি পাত্র নিয়ে একের উপর আরেকটি বসিয়ে একটি পাত্র ক'রে নিলেন। এজন্য তাঁর পাত্রটির চারিটি কানা দেখা যায়।

এখান থেকে মুচিলিন্দ সরোবরের দক্ষিণ দিক পর্যন্ত এলাকার মধ্যে আরো গুটিকয়েক স্তূপ চোখে পড়বে।

বোধিবৃক্ষ দেয়ালের পূর্বদিকে ফটকের বাইরে দ'তিন লি মতো গেলে অন্ধ নাগের আবাস। ফটকের কাছাকাছি এলাকায় তিনটি স্তূপ।

বোধিবৃক্ষ ঘের দেয়ালের উত্তর ফটকের বাইরে মহাবোধি সংঘারামটি। সিংহলের এক প্রাচীন রাজা এটি গড়েন। এই সংঘটিতে ৬টি মহাকক্ষ ও তেতলা বুরুজ রয়েছে। এটি তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট উঁচু প্রতিরোধ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এই বিহারটি তৈরী করার জন্য শিল্পীরা তাদের সব শিল্পনৈপুণ্য কাজে লাগিয়েছেন। অতি উজ্জ্বল রঙ

দিয়ে এটিকে অলংকৃত করা হয়েছে। বুদ্ধদেবের মূর্তিটি সোনা ও রূপা দিয়ে বানানো ও নানা রত্ন ও দামী পাথর বসানো। এগুলির মধ্যে বুদ্ধের দেহাবশেষ রাখা হয়েছে। অস্থিগুলি এক একটি হাতের অঙ্গুলের মতো লম্বা, চিকন, চকচকে ও ধবধবে সাদা আর পরিস্কার। চর্মাবশেষ সত্যিকায়ের বড়ো মুক্তার মতো হালকা নীলাভ লাল রঙের। প্রত্যেক বছর বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনটিতে এগুলি সকলের দর্শনের জন্য রাখা হয়।

এখানে হাজার জনেরও বেশি ভিক্ষু আছেন। তাঁরা মহাযানের চর্চা করেন ও স্থবির শাখার অনুগামী। তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে 'ধর্ম বিনয়'-এর অনুসরণ করেন। তাঁদের আচরণ খাঁটি ও নির্ভুল।

সিংহল নামে দক্ষিণ সাগরের একটি দেশে আগের কালে একজন ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁর ভাইও সংসার ছেড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। তিনি বৌদ্ধ তীর্থগুলি দেখার জন্য ভারতে এলেন। কিন্তু কোন ভারতীয় সংঘারামে তিনি ভাল ব্যবহার পেলেন না। প্রান্তিক দেশবাসী বলে ভারতীয় ভিক্ষুরা তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেন। অশেষ দুঃখ কষ্ট সয়ে সারা ভারত ঘুরে তীর্থ দর্শন শেষ ক'রে তিনি কোনমতে প্রাণটুকু নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। তারপর রাজাকে সব কথা জানিয়ে সিংহলীয় বৌদ্ধদের ক্লেশ নিবারণের জন্য যাতে তিনি ভারতে একাধিক সংঘারাম স্থাপন করেন সেজন্য উদ্বুদ্ধ করলেন।

সিংহল অধিপতি তখন ভারত-নৃপতির কাছে সংঘারাম স্থাপনার জন্য অনুমতি চাইলেন। ভারতপতি বোধিবৃক্ষের কাছে একটি সংঘারাম গড়ার সম্মতি দেন। সিংহলরাজ তখন বহু ধন সম্পদ খরচ করে এই সংঘারামটি গড়েন ও সেখানে তামার পাতের উপর এই ঘোষণাপত্রটি খোদাই ক'রে দেন—

"কোন রকম বৈষম্য না দেখিয়ে সকলকে সাহায্য করার পরম শিক্ষাই সকল বুদ্ধ আমাদের দিয়ে গেছেন। পরিস্থিতি অনুসারে যথাসম্ভব সবাইকে করুণা দেখানোর মহৎ শিক্ষাই বিগত মুনিঋষিদের কাছে আমরা পেয়েছি। সে কারণে আমি এক রাজবংশের দীন সন্তান হয়েও এই সংঘারামটি গড়েছি। বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র নিদর্শনগুলি যাতে সকলে সহজে দেখার সুবিধা পায়, তাদের মহত্ত্ব পরপুরুষ মধ্যে সঞ্চারিত হয় ও তার ফলে লোকেরা যাতে উপকৃত হয় এই বাসনা থেকে এটি গড়া হয়েছে। আমার রাজ্যের ভিক্ষুরা এর ফলে স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে ও এদেশের সংঘের সভ্যরূপে ব্যবহার লাভের অধিকারী হবে। এ সুযোগ সুবিধা যেন পুরুষানুক্রমে নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় থাকে।"

এজন্য এই সংঘারামটি সিংহলের বহু ভিক্ষুর সেবাযত্ন করে। বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ

দিকে দশ লি মতো অঞ্চল জুড়ে এত অসংখ্য পবিত্র স্মারক রয়েছে যে তাদের প্রত্যেকটির নাম করা অসম্ভব। প্রত্যেক বছর ভিক্ষুদের বর্ষা-উদ্‌যাপন শেষ হলে ধর্মপ্রাণ লোকেরা কাতারে কাতারে চারিদিক থেকে এখানে এসে ভিড় করে। সাতদিন সাতরাত ধরে তারা এই জেলাটি ঘুরে বেড়িয়ে বিভিন্ন স্তূপ ও বিহারে ফুল ছড়ায়, ধূপধূনা জ্বালায় ও গানবাজনা করে তাদের পূজা ও উপহার নিবেদন করে। ভারতের ভিক্ষুরা বুদ্ধের পবিত্র নির্দেশ মতো শ্রাবণ মাসের প্রথম পক্ষের প্রথম দিন থেকে বর্ষা উদ্‌যাপন আরম্ভ করে। আমাদের দেশে তা সুরু হয় পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিন থেকে। এখানে বর্ষা উদ্‌-যাপন শেষ হয় আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় পক্ষের পঞ্চদশ দিনে। আমাদের ওখানে অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিনে।

ভারতে মাসের নাম নক্ষত্রের নামানুসারে দেয়া হয়। এ বিষয়ে প্রাচীন বেঁধে দেয়া নিয়ম এখনো অপরিবর্তিতভাবে চালু রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় মূল নির্দেশ ও বিবরণ ভাষান্তরকালে বিভিন্ন শাখাগুলি যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়েছে তার ফলে বর্ষা উদ্‌যাপনকাল নিয়ে কিছু মতান্তর দেখা দিয়েছে। এজন্য কোথাও কোথাও তারা চতুর্থ মাসের ষোড়শ দিন থেকে বর্ষা উদ্‌যাপন আরম্ভ করেও শেষ করে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিন।

বোধিবৃক্ষের পূর্বদিকে নিরঞ্জনা নদী পার হয়ে আমরা এক বনের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে একটি স্তূপের দেখা পেলাম। এর উত্তরদিকে একটি জলাশয়।

জলাশয়ের পাশেও একটি স্তূপ দেখা যাবে। স্তূপটির সামনে একটি পাথর স্তম্ভ। অতি পুরাকালে কাশ্যপ বুদ্ধ এখানে সাধনা করেন। এর পাশে একটি জায়গায় বিগত চার বুদ্ধের বসা ও চলাফেরার চিহ্ন রয়েছে।

এই স্থানটির পূর্বদিকে মহীনদী পার হয়ে আমরা একটি বিরাট বনে এসে হাজির হলাম। এখানে একটি পাথর স্তম্ভ রয়েছে।

বুদ্ধের সমকালীন বিখ্যাত সন্ন্যাসী উড্র রামপুত্র এখানে চরম সিদ্ধি লাভ করেন। আবার পরবর্তীকালে এখানেই তিনি এক কু-বাসনা প্রকাশ করেন।

মহীনদীর পূর্বদিক গেলে আমরা বন্য প্রাণীসংকুল একটি বিরাট অরণ্যের দেখা পাই। ১০০ লি মতো পথ চলার পর কুক্কুটপাদগিরিতে এসে পেঁছাই। এর আরেক নাম গুরু পাদাঃ কন্যা। এ পর্বতের ধারগুলি বেশ খাড়া ও এবড়ো থেবড়ো। উপত্যকা ও গিরি খাতগুলির মধ্যে যাতায়াত অসম্ভব। এর চারপাশ দিয়ে তীব্রগতিতে জলধারা নেমে আসে। উপত্যকাগুলি ঘন জঙ্গলে ভরা। গুহা-গহ্বর ছড়িয়ে থাকা পর্বতের ধার-গুলি লতিয়ে ওঠা নানারকম বুনো লতাপাতায় ঢাকা। পর্বতটির তিনটি সংকীর্ণ চূড়া

আকাশ ফুঁড়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। চূড়ার উপরের দিক মেঘ ও বাষ্পাচ্ছন্ন। এই পর্বতমালায় পিছন দিকে সম্মানাস্পদ মহাকাশ্যপ নির্বাণাচ্ছন্ন হয়ে শায়িত রয়েছেন। লোকে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে স্পর্দ্ধা করেনা বলে 'গুরু-পাদাঃ' বলে। মহাকাশ্যপ একজন শ্রাবক ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক ষড়ৈশ্বর্য্য ও অষ্ট বিমোক্ষ লাভ করেন। তথাগত নির্বাণ লাভের আগে তার উপর ধর্ম-পিটক রক্ষার ও মাসীর দেয়া সোনার সুতায় বোনা কষায়টি ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়কে দেবার ভার দিয়ে যান।

ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব লাভ ক'রে কাশ্যপ প্রথম মহাসম্মেলন আহ্বান করলেন। তারপর তিনি কুড়ি বছর কাল তাঁর দায়িত্ব পালন ক'রে চলেন। পরে এই অনিত্য জগতের প্রতি অনীহা থেকে মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও সেজন্য এই পাহাড় শীর্ষে ওঠেন। তাই এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি স্তূপ গড়া হয়েছে। নির্জন সন্ধ্যাবেলায় দূর থেকে স্তূপটির দিকে তাকালে অনেক সময় মশালের আলোর মতো এক উজ্জ্বল আলোক শিখা দেখা যায় কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে সেরকম কিছুই চোখে পড়বে না।

কুক্কুটপাদ পর্বতের উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় ১০০ লি কাছাকাছি যাবার পর আমরা বুদ্ধবন পর্বতমালার দেখা পাই। এর চূড়াগুলি বেশ উঁচু, ছোট বড় পাহাড়গুলি রীতিমতো খাড়া। এই খাড়া পাহাড়ের মধ্যে পাথর গুহা রয়েছে। বুদ্ধ কোন এক সময় এই পর্বতে নেমে এসে (আকাশ পথে) এই গুহাটিতে থাকেন। এর পাশে একটি বড়ো পাথর আছে। এটিতে গোশীর্ষ চন্দন গুঁড়ো করে ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্র তা তথাগতের দেহে ওই সময়ে লেপন ক'রে দেন। সেই চন্দনের সুগন্ধ এখনো পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে।

বুদ্ধবন পর্বতের বন্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে পথ ভেঙে ৩০ লি মতো পূর্বদিকে চলার পর আমরা যষ্ঠিবন অরণ্যে এসে পড়লাম। এখানে বড়ো আকারের বাঁশ জন্মায়। পাহাড় ও উপত্যকা এই বাঁশের বনে ছেয়ে আছে।

এই বনের মাঝে একটি স্তূপ চোখে পড়লো। রাজা অশোক এটিকে গড়ে গেছেন।

এই বনে কিছুকাল আগে জয়সেন নামে একজন উপাসক বাস করতেন। তিনি পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। অতি সাধাসিধে ধরনের এই মানুষটি বন পাহাড় ভালবাসতেন ও সবসময় সত্যের সন্ধানে ডুবে থাকতেন। তিনি ধর্ম ও ধর্ম-বহির্ভূত সব রকম শাস্ত্র পাঠ ক'রে সেদিকে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বিভিন্ন বিধর্মী গোষ্ঠীর লোক রাজা মন্ত্রী সকলেই তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতো। তারা সকলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ও জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে আসতো। তাঁর শিষ্যরা চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে। সত্তর বছর বয়সেও তিনি অবিরাম পড়ে চলতেন।

ভারতে একরকমের সুগন্ধি গুঁড়োকে মাটির তালের মতো করে তা দিয়ে স্তূপ

বানানোর প্রথা চলিত আছে। এগুলি ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা ক'রে বানানো হয় ও কোন একটি সূত্র থেকে কিছুটা লিখে এর মধ্যে ভরে দেয়া হয়। এগুলির নাম দিয়েছে তারা 'ধর্ম্ম-শরীর'। এগুলি যখন অনেক জমা হয়ে যায় তখন একটি বড়ো স্তূপ বানিয়ে তার মধ্যে এগুলি তারা জমা করে ও সর্বদা পূজা অর্চ্চনা করে চলে। জয়সেন সর্বদা মুখে শাস্ত্র পাঠ ও ছাত্রদের নির্দেশাদি দিয়ে চললেও তাঁর হাত দু'টি সব সময় কিন্তু এই স্তূপ বানাতে ব্যস্ত থাকতো। একশো বছর পার হবার পরেও তিনি সম্পূর্ণ সক্রিয় ছিলেন। তিরিশ বছর মধ্যে তিনি সাত কোটি স্তূপ বানান ও এক এক কোটির জন্য এক একটি বড় স্তূপ বানিয়ে তার মধ্যে তা রেখে দেন। সাত কোটি পূর্ণ হয়ে যাবার পর তিনি পূজা দিলেন ও ভিক্ষুদের সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করলেন। তারা তাঁকে অভিনন্দন জানালো। এই সময়ে চারিদিকে এক দিব্য জ্যোতি খেলে গেল ও নানা অলৌকিক কাণ্ড ঘটলো। আর তারপর থেকে প্রায়ই এখানে দিব্য জ্যোতির দেখা পাওয়া যেতে লাগলো।

যষ্ঠিবনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০ লি মতো গেলে একটি বড়ো পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে দুটি উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যাবে। এর জল বেশ গরম। পুরাকালে তথাগত এদু'টি সৃষ্টি করেন ও নিজে তাতে স্নান করেন। এখনো এদু'টি অফুরন্ত বয়ে চলেছে। কাছে ও দূরের লোক এখানে স্নান করতে আসে। তাদের মধ্যে কারো কোন পুরানো বা কঠিন অসুখ থাকলে এখানে স্নানের ফলে প্রায়ই সে সেরে ওঠে। প্রস্রবণ দু'টির পাশে যেখানে তথাগত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিয়মিত পায়চারি ক'রে বেড়াতেন সেখানে একটি স্তূপ গড়া হয়েছে।

যষ্ঠিবনের দক্ষিণ-পূবে ৬-৭ লি মতো গেলে একটি বড়ো পাহাড়ের দেখা পাওয়া যাবে। এই পাহাড়ের একটি গিরিপথের সামনে একটি স্তূপ আছে। মানুষ ও দেবতাদের শুভার্থে তথাগত বর্ষা উদযাপনের তিনমাস কাল এখানে থেকে ধর্ম ব্যাখ্যান করেন। এই সময়ে বিম্বিসার রাজা তা শোনার জন্য আসতে চান। তিনি পাহাড়টির গা কেটে, পাথর গাদা ক'রে তার উপরে ওঠা নামা করার পথ ক'রে দেন। এটি চওড়ায় প্রায় ২০ পা আর লম্বায় ৩ থেকে ৪ লি।

এই বড়ো পাহাড়ের উত্তর দিকে ৩-৪ লি গেলে একটি নির্জন পাহাড় চোখে পড়বে। আগের কালে ঋষি ব্যাস এখানে নিরালায় বাস করতেন। পাহাড়ের দেহ খুঁড়ে তিনি একটি ঘর বানান। তার কতকাংশ এখনো দেখা যায়। শিষ্যেরা তাঁর রেখে যাওয়া জ্ঞানের পরম্পরা বয়ে নিয়ে চলেছে ও এখনো তাঁর জনপ্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে।

এই নির্জন পাহাড়টির উত্তর-পূবে চার পাঁচ লি গেলে একটি ছোট পাহাড় পড়বে।

এটিও একলা দাঁড়িয়ে আছে। এই পাহাড়ের একপাশে একটি পাথরের কক্ষ আছে। লম্বা ও চওড়ায় এটি ১০০০ জন লোক বসার পক্ষে যথেষ্ট। তথাগত এখানে তিন মাস ধর্ম ব্যাখ্যান করেন। এই পাথর মহাকক্ষের উপরে একটি বড়ো পাথর আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মা এখানে গোশীর্ষ চন্দন গ‍ঁুড়া ক'রে তা বুদ্ধের দেহে ছড়িয়ে দেন। পাথরের গায়ে সে গন্ধ এখনো পাওয়া যায়।

এই পাথর মহাকক্ষ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বিরাট সুড়ঙ্গ আছে। ভারতীয়রা একে অসুরপুরী বলে। একবার এক যাদুকর ও তার ১৪ জন সঙ্গী এর মধ্যে প্রবেশ করে ৩০-৪০ লি মতো যাবার পর এক বিরাট রাজনগরী দেখতে পায়।

পাথর কক্ষটির পাশ দিয়ে প্রায় দশ পা মতো চওড়া ও ৪-৫ লি লম্বা একটি কাঠের পথ রয়েছে। আগের কালে বিম্বিসার রাজা বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য বন পাহাড় কেটে এটি তৈরী করেন।

এখান থেকে পাহাড়ের মধ্যে পূর্বদিকে প্রায় ৬০ লি মতো পথ চলার পর আমরা কুশাগারপুর (রাজগৃহ) পৌঁছাই। মগধ রাজ্যের মধ্যবিন্দুতে এ শহরটি অবস্থিত। এটি এখানকার পুরানো রাজাদের রাজধানী ছিল। এখানে প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি কুশ তৃণ জন্মায় ও এজন্য একে কুশাগার বলে। এর চারিদিকে উঁচু পাহাড় দিয়ে এমনভাবে ঘেরা যে সেগুলিকে এর বাইরের দেয়াল বলে মনে হবে। পশ্চিম দিকের একটি সরু গিরিপথ দিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকতে হয়। উত্তরদিকেও পর্বতমালার মধ্য দিয়ে একটি পথ আছে। শহরটি পূব পশ্চিমে লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে সরু। প্রায় ১৫০ লি মতো এর ঘের। মাঝখানে থাকা মূল শহরের অবশেষ চিহ্ন প্রায় ৬০ লি মতো পরিসর জুড়ে ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি রাস্তার দু'পাশে কনকচাঁপা গাছের সারি। তার ফুল থেকে ভেসে আসা এক মধুর গন্ধে চারিদিক ভরপুর। এই ফুলগুলি উজ্জ্বল সোনালী রঙের। বসন্তকালে এখানকার সমস্ত বন-বনানী এই ফুলের সোনালী রঙে ভরে ওঠে।

রাজপুরীর উত্তর ফটকের বাইরে একটি স্তূপ চোখে পড়বে। দেবদত্ত ও রাজা অজাতশত্রু দু'জনে এক হয়ে তথাগতকে বধ করার জন্য এখানে এক মাতাল হাতিকে তার দিকে লেলিয়ে দেন।

এর উত্তর-পূবে একটি স্তূপ রয়েছে। এখানে সারিপুত্র ভিক্ষু অশ্বজিতের কাছে ধর্ম-ব্যাখ্যান শোনেন ও তার ফলে অর্হত্ব লাভ করেন।

এই জায়গাটি থেকে একটুখানি উত্তরদিকে গেলে একটি গভীর খাদের দেখা পাওয়া যাবে। তার পাশে একটি স্তূপ গড়া হয়েছে। খাদের মধ্যে আগুন লুকিয়ে রেখে ও

ভাতে বিষ মিশিয়ে শ্রীগুপ্ত এখানে বুদ্ধদেবকে মারার ফন্দি করেন।

শ্রীগুপ্তের আগুনের খাদ থেকে উত্তর-পূর্বদিকে শহরের এক বাঁকে একটি স্তূপ রয়েছে। মহাচিকিৎসক জীবক এখানে বুদ্ধের জন্য একটি প্রচার মহাশালা বানিয়ে দেন। দালানটির চারিদিকে তিনি ফুল ও ফলগাছ লাগান। ভিতের নিদর্শন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গাছের শিকড়গুলি এখনো দেখা যায়। তথাগত প্রায়ই এখানে আসতেন। প্রচার মহাশালার কাছে জীবকের বসত ভিটের শেষ নিদর্শন ও একটি পুরানো কুয়ার গর্ত এখানো চোখে পড়ে।

রাজপুরীর উত্তর-পূর্বদিকে ১৪/১৫ লি মতন পথ চলার পর গৃধ্রকূট পাহাড়ের দর্শন পাওয়া যাবে। উত্তরের পাহাড়ের দক্ষিণদিকের ঢাল ছুঁয়ে এই পাহাড়ের এক মাত্র চূড়াটি অনেক উঁচু পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এর উপর শকুনদের বাস। এটি অনেকটা উঁচু বুরুজের মতো দেখায়। শিখর ঘিরে আকাশের হালকা নীল রঙের প্রতিফলন। পাহাড় ও আকাশের রঙ মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেছে।

তথাগত তাঁর পঞ্চাশ বছর ধর্ম-প্রচারকের জীবন মধ্যে অনেককাল এই পর্বতে কাটান। তাঁর ধর্ম-মতবাদের অনেক তত্ত্বের বিকশিত রূপ তিনি এখানে বসে দিয়ে যান। তাঁর ধর্ম-ব্যাখ্যান শোনার জন্য রাজা বিম্বিসার বহু লোক সঙ্গে নিয়ে এর চূড়ায় উঠে ছিলেন। তাঁরা এর উপত্যকাগুলিকে সমান ক'রে খাড়া পর্বতের গা ছেঁটে রাস্তা বের করেন, খাড়া পর্বতাংশের ফাঁক মধ্যে সেতু বানান ও পাহাড়ের বুক কেটে পাথরের সিঁড়ি তৈরী করেন। এ সিঁড়িটি দশ পা চাওড়া ৫ থেকে ৬ লি লম্বা। রাস্তার মাঝে দুটি ছোট স্তূপ দেখা যাবে। একটির নাম 'রথাবরোহণ'। কারণ, রাজা এখানে রথ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যান। অন্যটির নাম 'জন-আবর্তন'। কারণ, রাজা সাধারণ মানুষদের তাঁর সাথে আর না নিয়ে এখান থেকে ফিরিয়ে দেন। পর্বত শীর্ষটি পূব-পশ্চিমে লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে সরু। তার পশ্চিম সীমান্তে খাড়া ও উঁচু পাথর ঘেরের মাঝে একটি ইটে বানানো বিহার আছে। এটি বেশ লম্বা চাওড়া। গঠন শৈলীও খুব চমৎকার। ফটক পূর্বদিকে। তথাগত প্রায়ই এখানে এসে ধর্ম-ব্যাখ্যান করতেন। ধর্ম-ব্যাখ্যানরত অবস্থায় তাঁর একটি স্বাভাবিক আকারের মূর্তি এখন এখানে রয়েছে।

বিহারের পূর্বদিকে একটি খুব লম্বাটে পাথর দেখা যাবে। তথাগত নিয়মিত এটির উপর পায়চারি করে বেড়াতেন। এটির পাশে ১৪-১৫ ফুট উঁচু ও ৩০ পা মতো ঘেরের একটি বিরাট পাথর রয়েছে। দেবদত্ত বুদ্ধদেবকে মারার জন্য দূরে থেকে ওই পাথর এই জায়গায় গড়িয়ে ফেলেন।

এর দক্ষিণে পাহাড়ের খাড়াইয়ের নিচে একটি স্তূপ আছে। পুরাকালে তথাগত এখানে সর্দ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র প্রকাশ করেন।

বিহারটির দক্ষিণদিকে খাড়া উঠে যাওয়া পাহাড়ের এককোণে একটি বড় পাথরের গুহা-ঘর রয়েছে। তথাগত এখানে একবার সমাধিমগ্ন হন।

পাথরের ঘরটির সামনে উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রকাণ্ড একটি পাথর রয়েছে। পূজনীয় আনন্দ যখন সমাধিমগ্ন হন, তখন মার রাজা এখানে তাঁকে ভয়ভীত করার জন্য শকুনের রূপ ধরে আসেন। মারের কার্যকলাপে আনন্দ ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লে বুদ্ধদেব তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে সে কথা জানতে পারলেন। তখন তিনি পাথরের দেয়াল ফুঁড়ে নিজের হাত বাড়িয়ে আনন্দের পিঠ থাবড়ে তাঁকে আশ্বাস ও সাহস দেন।

বহুকাল পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখনো পাথরের উপর পাখির নখের চিহ্ন দেখা যাবে। পাহাড় ফুঁড়ে হাত বের করার ফলে যে গর্তটি হয়, আজও সেটি বর্তমান।

বিহারটির পাশে কয়েকটি পাথরের ঘর রয়েছে। এখানে সারিপুত্র ও অন্যান্য বড়ো বড়ো অর্হৎ সমাধিমগ্ন হতেন। সারিপুত্রের পাথরের ঘরের সামনে একটি বড়ো কুয়া আছে। এখন এটি জলশূন্য। শুধু গর্তটিই যা দেখা যাবে।

বিহারের উত্তর-পূবে একটি পাহাড়ী নদীর মাঝে একটি বড়ো ও সমতল পাথর দেখা যাবে। এখানে তথাগত তার 'কাষায়' বস্ত্র শুকোতে দিতেন। আজো তাতে কাপড়ের সুতোর দাগ দেখা যায়—ঠিক যেন সেগুলো পাথরের গায়ে খোদাই ক'রে রাখা হয়েছে।

এর পাশে একটি পাথর টিলার উপর বুদ্ধদেবের পায়ের ছাপ আছে। ছাপের গায়ে থাকা চক্রচিহ্নগুলো বেশ কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে উঠলেও এখনো তার অস্তিত্ব ধরা যায়।

পর্বতের উত্তর চূড়ায় একটি স্তূপ চোখে পড়বে। সেখানে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ মগধ শহর দেখেন ও সাতদিন কাল ধর্ম-ব্যাখ্যান করেন।

এই পাহাড়ী শহরের উত্তর ফটকের পশ্চিমে বিপুলগিরি। চলতি মতানুসারে এই পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোলের উত্তরদিকে আগে নাকি পাঁচশো উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল। এখন মাত্র গুটিদশেক চোখে পড়ে। তার মধ্যেও আবার কতক ঠাণ্ডা আর কতক গরম। এগুলির উৎপত্তি হয়েছে তুষার ঘেরা পর্বতমালার দক্ষিণে থাকা অনবতপ্ত সরোবর থেকে (রাবণ হ্রদ)। মাটির তল দিয়ে বয়ে চলে এগুলি হঠাৎ এখানে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে। এদের জল সরোবরটির জলের মতই বেশ মিষ্টি আর টলটলে। সরোবর থেকে ৫০০টি প্রবাহ-ধারায় পাতালঅগ্নির ধার দিয়ে বয়ে আসার দরুন সেই অগ্নিশিখার উত্তাপ প্রস্রবণগুলির জলকে গরম করে তুলছে। কতক উষ্ণ প্রস্রবণের মুখে পাথর কেটে নানা

আকৃতি করে বসানো হয়েছে। কোনটার চেহারা সিংহের, কোনটার বা ধবল হাতির মুখ। কোথাও কোথাও পাথরের নালী বানানো হয়েছে যার মধ্য দিয়ে জল গড়িয়ে উঁচু পুকুরে বা জলাধারে গিয়ে পড়ে। আবার নিচেও পাথর বাঁধান জলাধার। সেখানে জল গিয়ে পুকুরের মতো জমা হয়। প্রত্যেক শহর ও গ্রাম থেকে নানা দেশের লোকেরা এখানে স্নান করতে আসেন। অসুস্থ লোক এর ফলে প্রায়ই ভাল হয়ে ওঠে। এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলির ডাইনে বাঁয়ে অনেক স্তূপ আছে। অনেক বিহারেরও অবশেষ রয়েছে। এগুলি একেবারে গা-ঘেঁষাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে। এর সবকটি জায়গাতেই বিগত চার বুদ্ধ ওঠা-বসা চলা-ফেরা করে গেছেন এবং এখনো সে সবের চিহ্ন রয়ে গেছে। এ স্থানটি পর্বত ঘেরা ও যথেষ্ট জল থাকার দরুণ বিশেষ গুণবান ও জ্ঞানবান ব্যক্তিরা এখানে বাস করেন। অনেক মুনি ঋষিও এখানে শান্তিতে ও নিরালায় বাস করেন।

উষ্ণ প্রস্রবণের পশ্চিমে 'পিপ্পল' নামের পাথরের বাড়িটি দেখা যাবে। ভগবান বুদ্ধ প্রায়ই এখানে বাস করতেন। এই বাড়িটির পিছনে যে গভীর গুহাটি রয়েছে সেটি এক অসুরপুরী। সমাধি অভ্যাস রত বহু ভিক্ষু তার মধ্যে বাস করেন। প্রায়ই এই গুহা থেকে নাগ, সাপ, সিংহ, ও নানা আকৃতির আশ্চর্যকর জীবজন্তুকে বেরিয়ে আসত দেখা যায়। এ ধরনের দৃশ্য দেখে অনেকেই হতবাক হয়ে যুক্তিবোধ হারিয়ে ফেলেন। যাই হোক, মুনি ঋষিরা যেসব জায়গায় বাস করেন এই অঞ্চলটি তার মধ্যে একটি। এখানে বহু পুণ্য-স্মারক আছে বলে তাঁরা সব বিপদ-আপদ তুচ্ছ করেও এখানে থাকেন।

বিপুলগিরির শিখরে একটি স্তূপ চোখে পড়বে। এক সময় বুদ্ধদেব সেখানে ধর্ম-ব্যাখ্যান করেন। এখন সেখানে অসংখ্য নগ্ন সন্ন্যাসীর (নির্গ্রন্থ) বাস। তাঁরা দিন ও রাত অবিরামভাবে কৃচ্ছ্র সাধনা ক'রে চলেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত স্তূপটিকে প্রদক্ষিণ ক'রে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানিয়ে চলেছেন।

এই পাহাড়ী শহরটির (গিরিরাজ) উত্তর ফটকের বাঁদিক ধরে পূবমুখী ২/৩ লি মতো গেলে, দক্ষিণ পাহাড়ের উত্তর কোলে একটি বড়ো পাহাড়ের ঘর দেখা যাবে। এটিতে দেবদত্ত সমাধি সাধনা করতেন।

এই পাথরের ঘরটি থেকে সামান্য একটুখানি পূবদিকে একটি সমতল পাথরের বুকে রক্তের দাগের মতো ছোপ ছোপ দাগ রয়েছে। পাশেই একটি স্তূপ। এখানে একজন ভিক্ষু সমাধি সাধনা করতেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে না পারায় তিনি প্রাণত্যাগ করার জন্য নিজের গলা ক্ষতবিক্ষত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অর্হত্ব লাভ হলো। তারপর তাঁকে দাহ করা হয় ও তিনি নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর এই মহৎ সিদ্ধান্তের জন্য তাঁর নামে এই স্মৃতি স্তূপটি গড়া হয়।

এখান থেকে পূবে একটি পাহাড়ী অঞ্চলে একটি পাথরে বানানো স্তূপ দেখা যাবে। এখানে বাস করা এক সমাধি সাধনারত ভিক্ষু আকাংখিত ফল না পেয়ে এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দেন ও সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর অচল বিশ্বাসের দৃষ্টান্তটিকে চিরন্তন ক'রে রাখার জন্য স্তূপটি বানানো হয়েছে।

পাহাড়ী শহরটির উত্তর ফটক থেকে এক লি মতো এগিয়ে যাবার পর করন্ড বেণু বনের দেখা পাই। এখানে এখন শুধু একটি বিহারের পাথরে তোলা বুনিয়াদ ও ইটের বুনিয়াদ ও ইটের দেয়ালগুলিই যা দেখা যাবে। এর দরজা পূবমুখী। তথাগত এখানে প্রায়ই এসে বাস করতেন। লোকেদের পথনির্দেশ করার জন্য ধর্মের ব্যাখ্যান শোনাতেন। মতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সত্যধর্মের অনুরাগী ক'রে তুলতেন। এখানে এখন বুদ্ধদেবের স্বাভাবিক আকারের একটি মূর্তি বানানো হয়েছে। এই শহরের এক নামকরা গৃহপতি করন্ড এই বিহারটি বুদ্ধদেবকে ক'রে দেন।

করন্ড বেণুবনের পূর্বদিকে রাজা অজাতশত্রুর তৈরী একটি স্তূপ দেখা যাবে। বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ যে ক'জন রাজার মধ্যে ভাগ হয়, অজাতশত্রু তাদের একজন। তিনি তার উপর এই স্তূপটি গড়ে বুদ্ধের প্রতি পূজা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর রাজা অশোক এটিকে খুঁড়ে দেহাবশেষ বের করে নেন ও নিজে অন্য একটি স্তূপ তোলেন।

রাজা অজাতশত্রুর স্তূপটির পাশে আরেকটি স্তূপ আছে। এটিতে আনন্দের আধা দেহাবশেষ রাখা হয়েছে। এই সৌধটির পাশে একটি জায়গা আছে যেখানে বুদ্ধদেব পায়চারি করতেন।

এখান থেকে অল্প একটুখানি এগিয়ে গেলে একটি স্তূপের দেখা পাওয়া যাবে। বর্ষা উদযাপনকালে সারিপুত্র ও মুদগলপুত্র এখানে বাস করতেন।

বেণুবনের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ৫ থেকে ৬ লি মতন যাবার পর দক্ষিণ পর্বতের উত্তরভাগে একটি বিরাট বাঁশবন দেখা যাবে। এর মাঝে একটি বিশাল পাথরের বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুদ্ধদেবের নির্বাণ পরে পূজনীয় কাশ্যপ এখানেই তিন পিটক সংকলনের জন্য ৯৯৯ জন মহান অর্হতের সঙ্গে মিলিতভাবে মহাসম্মেলন ডাকেন। এর সামনে একটি পুরানো ভিত দেখা যাবে। ধর্ম পিটক সংকলনের জন্য সমবেত অর্হৎগণের থাকার জায়গা ক'রে দেবার জন্য রাজা অজাতশত্রু এটি তৈরী করিয়েছিলেন।

এই সম্মেলনে আনন্দ সূত্র-পিটক, উপালি বিনয়-পিটক ও কাশ্যপ অভিধর্ম-পিটক সংকলনের ভার নেন। পূজনীয় কাশ্যপ এ সম্মেলনের সভাপতি বা স্থবির ছিলেন বলে একে স্থবির সম্মেলন বলা হয়।

মহান কাশ্যপ যেখানে সম্মেলন করেন সে জায়গাটি থেকে উত্তর-পশ্চিমদিকে একটি স্তূপ আছে। উপরোক্ত সম্মেলনে যোগদানে প্রথমে বাধা পেয়ে আনন্দ এখানে এসে নীরবে বসে থাকেন ও সেই অবস্থায় অর্হৎত্ব লাভ করেন। অর্হৎত্ব লাভের পর তিনি সম্মেলনে যোগ দেবার সুযোগ পান।

এই জায়গাটি থেকে ২০লি মতো পশ্চিমদিকে হাঁটলে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপের দেখা পাওয়া যাবে। এখানেই 'মহাসংঘ' তাদের অধিবেশন করেন। কাশ্যপের সম্মেলনে যারা যোগ দেবার অনুমতি পাননি এ রকম একলক্ষ লোক একত্রিত হয়ে এখানে আলাদা এক সম্মেলন করেন। এই সম্মেলনে ভিক্ষু ও গৃহী উপাসক উভয়ে একত্রিত হয় ও শেষ পর্যন্ত ৫টি পিটক সংকলিত হয়। এই পাঁচটি পিটক যথাক্রমে—সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম, বিবিধ (ক্ষুদ্র নিকায় বা সন্নিপাত নিকায়) ও ধারণী পিটক। যেহেতু এখানে ভিক্ষু ও গৃহী উভয়ে একত্র হয়েছিলেন এজন্য এ সম্মেলনকে 'মহাসংঘ' বলা হয়।

বেণুবন বিহারের উত্তরদিকে ২০০ পা মতো গেলে করন্ড সরোবর। জীবিতকালে তথাগত এখানে প্রায়ই ধর্ম-ব্যাখ্যান ক'রে গেছেন। এর জল স্বচ্ছ ও নির্মল এবং অষ্টগুণ সমন্বিত। বুদ্ধের নির্বাণের পর সরোবরের জল শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

করন্ড সরোবরের উত্তর-পশ্চিমে ২/৩ লি মতো গেলে একটি স্তূপ দেখা যাবে। রাজা অশোক এটিকে বানান। ৬০ ফুটের মতো উঁচু এই স্তূপটির পাশে একটি পাথর স্তম্ভ আছে। এতে এই স্তূপ গড়ার কারণ খোদাই করা রয়েছে। স্তম্ভটি পঞ্চাশ ফুটের মতো উঁচু ও তার উপরে একটি হাতির মূর্তি রয়েছে।

পাথর স্তম্ভটি থেকে উত্তর-পূর্বদিকে একটুখানি গেলে আমরা রাজগৃহ শহরে এসে পৌঁছাই। শহরের বাইরের দেয়াল নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তার চিহ্নবর্ণও নেই। ভিতরের দেয়াল (অর্থাৎ রাজপুরীর দেয়াল) শেষ দশায় পৌঁছালেও এখনো মাটির উপর কিছুটা উঁচু পর্যন্ত টিঁকে আছে। এর ঘের প্রায় ২০ লির কাছাকাছি। রাজা বিম্বিসার প্রথমে কুশীনগর বাস করতেন। কিন্তু সেখানে লোকের বাড়িঘর একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে থাকার দরুন ঘন ঘন আগুন লেগে ক্ষতি হতো। একটি বাড়িতে আগুন লাগলে পাশের বাড়িও তা থেকে রেহাই পেত না ও এভাবে এক একটি পল্লী পুড়ে ছাই হয়ে যেত। মুখ বুজে ক্ষতি সয়ে চলা অসম্ভব হয়ে উঠতে লোকেরা জোর নালিশ জানাতে শুরু করলো। রাজা বললেন—'আমার পাপের ফলেই গরিব মানুষেরা ভুগছে। কোন্ পুণ্যকর্ম করলে এ ক্ষতির হাত থেকে বাঁচা যায় ?' মন্ত্রীরা বললেন—মহারাজ, আপনার সুশাসনে চারদিকে শান্তি ও ঐক্য বজায় রয়েছে। আপনার ন্যায়নিষ্ঠ নীতিবিধির জন্য (ধর্ম ও জ্ঞানের) আলোক ও অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। শুধু লোকের অমনোযোগিতার

ফলেই আগুনে পুড়ে এসব ক্ষতিকর ঘটনা ঘটছে। এরকম ঘটনা রুখতে হলে কঠোর নিয়ম চালু করা দরকার। এখন থেকে যদি কোথাও আগুন লাগে তবে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে পেতে তার উৎস বার করা হোক। মূল দোষীকে সাজা দেয়া হোক, তাকে 'শীত বনে' নির্বাসিত করা হোক। শীত বনে সাধারণতঃ মৃতদেহ ফেলা হয়। সকলেই একে ভয়ংকর জায়গা বলে মনে করে। কেউই তার মধ্য দিয়ে চলা ফেরা তো দূরের কথা তার ধারও মাড়াতে চায়না। অপরাধীকে সেখানে তাড়িয়ে দেয়ার নিয়ম চালু করলে, লোকে আপনা থেকেই সতর্ক ও মনোযোগী হয়ে উঠবে। রাজা বললেন—'ভাল কথা বলেছ। রাজ্যে সেই রকম ঘোষণা ক'রে দাও। প্রত্যেক লোকের কানে একথা যেন পেঁছায়।'

এরকম ঘোষণার পর সবার আগে রাজপ্রাসাদেই একদিন আগুন লাগল। রাজা তখন মন্ত্রীদের বললেন—'আমাকেই নির্বাসিত করা দরকার।' তিনি ছেলের হাতে রাজ্যভার দিয়ে নির্বাসনে গেলেন।

রাজা বিম্বিসার শীত বনে একা বাস করছেন শুনে, বৈশালীরাজ তাঁকে আচমকা আক্রমণ করার জন্য সসৈন্যে এগোতে থাকলেন। খবর পেয়ে সীমান্ত রক্ষী সেনাপতিরা বনের মধ্যে একটি শহর গড়ে তুললেন। রাজা নিজে যেহেতু সেখানে প্রথম বনবাস আরম্ভ করেন সেজন্য তার নাম দেয়া হলো রাজগৃহ। তারপর মন্ত্রী ও অন্যান্য লোকেরা সেখানে বসবাস শুরু করলো।

আবার এরকম কথাও শোনা যায় যে রাজা অজাতশত্রুই নাকি প্রথম এ শহরটি গড়েন। তারপর তাঁর উত্তরাধিকারীও একেই রাজধানী করেন ও রাজা অশোকের সময় পর্যন্ত তা চালু থাকে। এরপর রাজা অশোক প্রথম পাটলীপুত্রে রাজধানী সরিয়ে আনেন ও রাজগৃহ শহরটি ব্রাহ্মণদের দান ক'রে দেন। এজন্য আজকাল সে শহরে সাধারণ মানুষদের দেখা যায় না। হাজার খানেক ব্রাহ্মণ পরিবারই থাকেন শুধু।

রাজপুরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দু'টি ছোট সংঘারাম রয়েছে। যে সব ভিক্ষু এখানে আসা যাওয়া করে বা একেবারে নতুন তারা এটিতে রাত কাটায়। বুদ্ধদেব দু'টি জায়গাতেই তাঁর জীবিতকালে এসে ধর্ম-ব্যাখান ক'রে গেছেন। এর উত্তর-পশ্চিমে একটি স্তূপ আছে। গৃহপতি জ্যোতিষ্ক যে গ্রামটিতে জন্মান সেটি এককালে এখানেই ছিল।

শহরের দক্ষিণ ফটকের বাইরে, রাস্তার বাঁদিকে একটি স্তূপ আছে। এখানে তথাগত ধর্ম-ব্যাখ্যান করেন। এছাড়া রাহুলকেও তিনি এখানেই আপন ধর্মমতে দীক্ষিত করেন।

এখান থেকে তিরিশ লি মতো উত্তরদিকে গেলে নালন্দা সংঘারামের দর্শন পাই। দেশের পুরানো ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এই সংঘারামের দিকে এক আম বনানীর

মাঝে একটি পুকুর আছে। এই পুকুর নিবাসী নাগের নাম নালন্দা। এর পাশেই সংঘারামটি গড়া হয়েছে বলে এটির এরকম নাম। কিন্তু আসল কথা অন্য রকম। পুরাকালে তথাগত একবার বোধিসত্ত্ব হয়ে এখানে জন্মেছিলেন। ওই সময়ে তিনি একটি বিশাল রাজ্যের রাজা হন। সে রাজ্যের রাজধানী এখানেই ছিল। জীবের প্রতি অপার করুণা থেকে তিনি সর্বদা তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতেন। এই সদ্গুণের জন্য তাঁকে 'অবিরামদাতা' বলা হতো। আর এই নামটিকে চিরন্তন ক'রে রাখার জন্য সংঘারামটির এই নামকরণ করা হয়। এ জায়গাটি আগে একটি আম বাগান ছিল। ১০ কোটি স্বর্ণ খন্ড দিয়ে ৫০০ জন শ্রেষ্ঠী এটিকে কিনে বুদ্ধদেবকে দান করেন। বুদ্ধদেব এখানে তিন মাস কাল থেকে ধর্ম-ব্যাখ্যান করেন ও সেই বণিক ও অন্যান্যরা এর ফলে সদ্গতি লাভ করেন।

বুদ্ধের নির্বাণ লাভের কিছুকাল পরে এদেশের এক পূর্বতন রাজা শক্রাদিত্য বুদ্ধের ধর্মমতের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ত্রি-রত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। তিনি এই আম-বাগানে একটি শুভস্থান গণংকার দিয়ে বাছাই ক'রে সেখানেই নালন্দা সংঘারামটি গড়লেন। যখন এটি বানানোর কাজ শুরু করলেন তখন খোঁড়াখুঁড়ির বেলায় আঘাত পেয়ে নাগটি আহত হলো। এইসময়ে বিধর্মীদের মধ্যে একজন নামকরা গণংকার ছিলেন। তিনি নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের লোক। ঘটনাটি দেখে তিনি এইরকম ভবিষ্যৎবাণী লিখে রেখে গেছেন : 'মনোনীত জায়গাটি অতি সুলক্ষণযুক্ত। এখানে একটি সংঘারাম তৈরী করা হলে সেটি বিখ্যাত হয়ে উঠবে। পঞ্চসিন্ধু মধ্যে আদর্শ স্থানীয় রূপে গণ্য হবে। এক হাজার বছর তার ক্রমোন্নতি বজায় থাকবে। সকল স্তরের শিক্ষার্থীরাই এখানে সহজে সুশিক্ষা লাভ করবে। কিন্তু নাগের দেহ থেকে রক্ত ঝরানোর জন্য এখানে অনেক রক্তপাত ঘটবে।'

শক্রাদিত্যের পর তাঁর পুত্র বুধগুপ্ত রাজা হলেন। পিতা যে মহৎ কাজ আরম্ভ করেন তিনি তা বজায় রাখেন। এই সংঘারামটির দক্ষিণদিকে তিনি আরো একটি সংঘারাম বানিয়ে দেন। রাজা তথাগত গুপ্তও উদ্দীপনার সঙ্গে তাঁর পূর্ব পুরুষদের ধারা অনুসরণ ক'রে যান। তিনি (মূল) সংঘারামটির পূবদিকে আরো একটি সংঘারাম গড়ে তোলেন।

এরপর রাজা বালাদিত্য সাম্রাজ্য লাভ করলেন। তিনি উত্তর-পূবদিকে একটি সংঘারাম বানিয়ে দেন। সংঘারামটি তৈরী সম্পূর্ণ হলে তিনি এক আনন্দ সম্মেলন ডাকলেন। খ্যাত অখ্যাত সবাইকে তিনি সমানভাবে সম্মান দিতেন। তাই সাধারণ মানুষ ও ধর্মানুগামী সবাইকে তিনি নির্বিচারে আমন্ত্রণ জানালেন। ভারতের সকল

ভিক্ষু এসে জমায়েত হলো, এমনকি দশ হাজার লি দূর থেকে পর্যন্ত। সকলের আসা যখন শেষ হয়ে গেছে তার অনেক পর দুজন ভিক্ষু এসে হাজির হলেন। তাঁদেরও অভ্যর্থনা ক'রে তেতলা মণ্ডপের উপর নিয়ে যাওয়া হলো। অভ্যর্থনাকারীরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? এত দেরীতে কেন এলেন?' তাঁরা উত্তর দিলেন—'আমরা চীন দেশ থেকে এসেছি। আমাদের আচার্যের অসুখ হয়েছিল, তাই তাঁর সেবা সুশ্রূষা ক'রে সুস্থ ক'রে তুলে তারপর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বের হয়েছি। এজন্যই আমাদের এখানে আসতে এতো দেরী হয়ে গেল।'

সমবেত সকলে সেকথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। রাজাকে খবর দেয়া হলো। তাঁরা যে উঁচুদরের সাধু একথা বুঝতে পেরে তিনি নিজেই তাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার জন্য এলেন। মণ্ডপে এসে কিন্তু তাঁদের খোঁজ আর পেলেন না। তাঁরা যে এর মধ্যে কোথায় গেলেন তা কেউ বলতে পারলো না। এই (অলৌকিক) ঘটনায় রাজার মনে ধর্ম বিশ্বাস আরো গভীর হলো। তিনি রাজ্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিলেন। রাজা থেকে তিনি একেবারে নিম্ন পর্যায়ের ভিক্ষু হয়ে গেলেন। ফলে তিনি এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেন। তাই তিনি ভিক্ষুসংঘকে বললেন—'আগে আমি রাজা ছিলাম, সম্মানীয়দের মধ্যে আমার স্থান ছিল সবার উপরে। কিন্তু ভিক্ষু হবার পর আমাকে ভিক্ষু কুলের একেবারে তলে স্থান দেয়া হয়েছে।' তখন সংঘ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে যারা পূর্ণসম্পদা লাভ করেননি এমন ভিক্ষুদের শ্রেণী বিভাগ সংঘে প্রবেশকাল অনুসারে করা হবে। একমাত্র এই সংঘারামটিতেই এ নিয়ম চালু রয়েছে।

এই রাজার পুত্র বজ্র তারপর সিংহাসন লাভ করলেন। তিনিও এই ধর্মের প্রতি গভীর অনুরক্ত ছিলেন। এই সংঘারামের পশ্চিমদিকে তিনিও একটি সংঘারাম স্থাপন করেন।

এরপর মধ্য ভারতের এক রাজা উত্তরদিকে একটি বিশাল সংঘারাম গড়লেন। এছাড়াও তিনি এই সংঘারামগুলির পুরো পরিসর উঁচু ঘের দেয়াল দিয়ে ঘিরে এক ফটকের মধ্যে সব সংঘারামগুলিকে রাখলেন। পর পর আরো অনেক রাজা নানা সৌধ তুললেন। ভাস্কর্য শিল্পীরা প্রাণ ঢেলে তাদের নৈপুণ্য খাটিয়ে সেগুলিকে শিল্পমণ্ডিত ক'রে তুলেছে। এভাবে পুরো জায়গাটি ধীরে ধীরে এক অপরূপ দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠেছে। রাজা বললেন—'যে সম্রাট প্রথম এখানে সংঘারাম গড়েছেন তাঁর গড়া সংঘারামের মহাকক্ষ মধ্যে আমি একটি বুদ্ধ মূর্তি বসাব। প্রতিষ্ঠাতা সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে সংঘের চল্লিশ জন ভিক্ষুকে প্রত্যেকদিন খাওয়াবো।

এখানে বেশ কয়েক হাজার ভিক্ষু আছেন। যোগ্যতা ও প্রতিভার দিক থেকে তাঁরা সবার সেরা। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকশো ভিক্ষুর নাম ও খ্যাতি দূর দেশগুলিতেও

ছড়িয়ে পড়েছে। চাল-চলন আচার-ব্যবহারের দিক থেকে তাঁরা নিষ্ঠাবান ও ত্রুটিশূন্য। আন্তরিকতার সঙ্গে নৈতিক নীতি-দর্শনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্যকে মেনে চলেন। এই সংঘারামের নীতি-নিয়মগুলি বেশ কঠোর। প্রতিটি ভিক্ষু তা মেনে চলতে বাধ্য। ভারতের সব দেশ তাঁদের শ্রদ্ধা করে, অনুসরণ করে। প্রতিদিন বহু তাত্ত্বিক প্রশ্ন এখানে তোলা হয়, তার উত্তর দেয়া হয়। প্রশ্ন আর উত্তরের ভিড়ের মধ্যে দিন যে কখন শেষ হয়ে যায় টের পাওয়া যায় না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সকলে নানা আলোচনায় নিমগ্ন। শিক্ষানবীশ ও অভিজ্ঞরা একে অপরকে সাহায্য ক'রে চলেছে। যাঁরা ত্রিপিটকের উপর কোন জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নের উত্তর বা আলোচনা করার ক্ষমতা ধরেন না তাঁদের পণ্ডিত বলে গণ্য করা হয় না। এজন্য যেসব লোক তাড়াতাড়ি জ্ঞান ও খ্যাতির শিখরে উঠতে চান তাঁরা বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে এখানে আসেন। এখান থেকে মনের জিজ্ঞাসা ও সংশয় দূর ক'রে নিয়ে তাঁরা ফিরে যান। এভাবে জ্ঞানের স্রোতধারা দিকে দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সহজে নাম কেনার জন্য অনেকেই মিথ্যা করে নিজেকে এখানকার ছাত্র বলে পরিচয় দেয় ও সম্মান কুড়োয়। যদি বাইরের কোন লোক এখানে ছাত্র হিসাবে স্থান পেতে চায় বা আলোচনায় ভাগ নিতে চায় তবে দ্বারপাল তার কাছে কতকগুলি শক্ত প্রশ্ন তোলেন। অনেকেই তার উত্তর দিতে না পেরে এখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পুরানো ও নতুন বিভিন্ন শাস্ত্র বইয়ের উপর আগে থেকে গভীর দখল না থাকলে এখানে ছাত্র হিসাবে স্থান পাওয়া দুষ্কর। এজন্য, যেসব ছাত্র এখানে নতুন আসে তাদের গভীর বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা দেখাতে হয়। সাধারণতঃ দশ জনের মধ্যে ৭ থেকে ৮ জনই এই পরীক্ষায় অসফল হয়। সেই সফল দুই বা তিনজন যখন এখানকার (পণ্ডিত) সমাবেশে আলোচনা করতে সুযোগ পায় তখন তাদের হার একেবারে নিশ্চিত। কিন্তু যারা অসাধারণ প্রতিভাধর তাদের নাম এখানকার বিরাট কৃতীদের নামের তালিকায় যুক্ত হয়ে যায়। যেমন ধর্মপাল ও চন্দ্রপাল ঃ এঁরা এঁদের রেখে যাওয়া অনন্য জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান ও পার্থিব লোকেদেরও উদ্দীপিত করেছেন। গুণমতি আর স্থিরমতি ঃ এঁদের উন্নতমানের শিক্ষাধারা এখনো বিদেশে পর্যন্ত প্রবাহিত। প্রভামিত্র ঃ ইনি তাঁর সুস্পষ্ট আলোচনা ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত। জিনমিত্র ঃ তাঁর উন্নত ধারার বাগ্মীতার জন্য নাম কিনেছেন। জ্ঞানচন্দ্রের রীতি ও খ্যাতিই তাঁর বিশিষ্ট কার্যকলাপের স্বাক্ষর। আছেন শীঘ্রবুদ্ধ ও শীলভদ্র। আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন যাঁদের নাম কালক্রমে লোকে এখন ভুলে গেছে। এই সব বিখ্যাত লোকেরা সকলের কাছে পরিচিত। তাঁরা সদগুণ ও প্রতিভায় পূর্ববর্তীদেরও ছাড়িয়ে যান, প্রাচীনদের জ্ঞানের সীমানাকেও অতিক্রম করেন। এদের প্রত্যেকেই অনেকগুলি করে

(কয়েক দশ) ধর্মপ্রবন্ধ ও টীকা গ্রন্থ লিখে গেছেন ও সেগুলি ব্যাপকভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাঞ্জলতার জন্য সেগুলি এখনো সুপ্রচলিত।

এই সংঘারামের চারিদিকে শয়ে শয়ে পুণ্য স্মারক ছড়িয়ে আছে। বইয়ের আয়তন সংক্ষিপ্ত করার জন্য এ থেকে মাত্র গুটি কয়েকের কথা বলবো।

সংঘারামের পশ্চিমদিকে একটি বিহার আছে। এটি দেখার জন্য বেশি দূরে হাঁটতে হবে না। পুরাকালে তথাগত এই জায়গাটিতে তিন মাস থাকেন ও দেবতাদের মঙ্গল বিধানের জন্য পরম ধর্মকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যান করেন।

দক্ষিণ দিকে ১০০ পা মতো গেলে একটি ছোট স্তূপের দিকে নজর পড়বে। বহু দূরে দেশ থেকে আসা এক ভিক্ষুকে বুদ্ধদেব এখানে দর্শন দেন।

এই দক্ষিণ দিকেই অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের একটি দাঁড়ান মূর্তি আছে। কখনো কখনো তাকে এক সুরভি পাত্র নিয়ে বুদ্ধের বিহারের দিকে যেতে দেখা যায় কখনো বা ডানদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

এই মূর্তিটির দক্ষিণে একটি স্তূপ আছে। বুদ্ধদেব তিন মাস মধ্যে যত নখ ও চুল কাটেন তা এখানে রাখা আছে। যে সব লোক কঠিন রোগে ভোগেন তাঁরা এখানে এসে স্তূপটিকে প্রদক্ষিণ করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাল হয়ে যান।

এর পশ্চিমে, দেয়ালের বাইরের দিকে পুকুরের পাশে একটি স্তূপ আছে। এখানে চড়াই পাখি হাতে ক'রে এক বিধর্মী বুদ্ধদেবকে জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে নানারকম প্রশ্ন করেন।

দেয়ালের সীমানা মধ্যে, দক্ষিণ-পূবে ৫০ পা মতো গেলে একটি অসামান্য গাছ দেখা যাবে। এ গাছটি ৮ থেকে ৯ ফুট উঁচু, কিন্তু গাছটির দুটি গুঁড়ি। জীবিত-কালে তথাগত একদিন তাঁর দাঁত ঘষে দাঁতনটি এখানে ছুঁড়ে ফেলেন। সেই দাঁতনটি থেকেই এ গাছটি গজিয়েছে। বহুকাল পার হয়ে গেলেও গাছটি বাড়েনি বা কমেনি।

তারপর পূর্বদিকে একটি বড়ো বিহার রয়েছে। এটি প্রায় দুশো ফুটের কাছাকাছি উঁচু। তথাগত এখানে চার মাস থেকে ধর্মের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা ক'রে যান।

এরপর উত্তরদিকে ১০০ পা মতো গেলে একটি বিহার দেখা যাবে। এখানে অব-লোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্তি আছে। যে সব নিষ্ঠাবান ভক্তরা অপার ভক্তি নিয়ে তাঁকে পূজা অর্চনা করেন, তাঁরা তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে দেখতে পান। তিনি একই স্থানে অনড় থাকেন না। কখনো তাঁকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, কখনো বা কুলুঙ্গীর বাইরে চলে আসেন। সাধারণ অনুগামী ও ভিক্ষু উভয় স্তরের ধর্মপ্রাণ লোকই চারিদিক থেকে দলে দলে তাঁকে পূজা দিতে আসে।

এই বিহারটির উত্তরদিকে এর চেয়েও বড়ো একটি বিহার আছে। এটি খাড়ায় তিনশো ফ্রুটের কাছাকাছি। রাজা বালাদিত্য এই বিহারটি তৈরী ক'রে গেছেন। এর গঠন সৌন্দর্য, আকার ও বুদ্ধ মূর্তিটি বোধিবৃক্ষের কাছে থাকা বড়ো বিহারটির মতন।

এর উত্তর-পূর্বদিকে একটি স্তূপ দেখা যাবে। তথাগত এখানে সাতদিন ধরে পরম ধর্মের ব্যাখ্যান করেন।

উত্তর-পশ্চিমদিকে একটি জায়গা আছে সেখানে বিগত চার বুদ্ধ ওঠা-বসা চলা-ফেরা করেন।

এর দক্ষিণদিকে রাজা শীলাদিত্যের তৈরী বিহারটি দেখা যাবে। এটি পিতল দিয়ে তৈরী করা হচ্ছে। বানানো এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। পরিকল্পনা মতো গড়া শেষ হলে এর খাড়াই ১০০ ফুট হবে।

তারপর পূর্বদিকে দু'শো পা মতো গেলে, দেয়ালের বাইরের দিকে বুদ্ধের একটি দাঁড়ানো মূর্তি চোখে পড়বে। এটি তামার তৈরী, উঁচু প্রায় ৮০ ফুটের মতো। এটিকে আচ্ছাদন করতে হলে ছ'তলা মন্ডপের দরকার। রাজা পূর্ণবর্মা এটি তৈরী করে গেছেন।

এই মূর্তিটির উত্তরদিকে ২-৩ লি মতন যাবার পর ইটে গাঁথা একটি বিহার চোখে পড়বে। তার মধ্যে 'তারা' বোধিসত্ত্বের মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটি খুব উঁচু। এর অলৌকিক ক্ষমতাও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। প্রত্যেক উপবাসের দিনে এখানে বেশ বড়ো আকারে পূজা হয়। প্রতিবেশী দেশগুলির রাজা, মন্ত্রী ও বড়ো বড়ো লোকেরা অতি মনোহর সব সুগন্ধি, নানারকম ফুল, রত্নখচিত পতাকা, ছত্র প্রভৃতি দিয়ে পূজা নিবেদন করেন। এই সময় বীণা, বাঁশী আরো নানারকম পাথর ও ধাতুর তৈরী বাজনা-যন্ত্র সহ সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে চলে। এরূপ অনুষ্ঠান ৭ দিন ধরে চলে।

দক্ষিণ ফটকের দিকে, সীমানার মধ্যে একটি বড়ো কুয়া আছে। একদিন একজন বণিক পিপাসার্ত হয়ে জায়গাটিতে বুদ্ধের কাছে আসেন। ভগবান আঙুল দিয়ে এই বিশেষ জায়গাটি দেখিয়ে বলেন—'ওখানে জল রয়েছে'। বণিকদের দলপতি একথা শুনে তাঁর শকটের অক্ষদণ্ডের ডগা দিয়ে এ জায়গাটি বিঁধতেই নিচ থেকে ফোয়ারার মতো জল বেরিয়ে এলো। জল খেয়ে তাঁরা তৃপ্ত হলেন। এরপর বুদ্ধদেবের ধর্ম ব্যাখ্যান শুনলেন। সকলেই এর ফলস্বরূপ মোক্ষ লাভ করলেন।

এই সংঘারামটি থেকে ৮/৯ লি মতো দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে আমরা কুলিক নামে একটি গ্রামে এসে পেঁছাই। এই গ্রামের মধ্যে রাজা অশোকের গড়া একটি স্তূপ দেখলাম। পূজনীয় মুদ্‌গলপুত্র এখানে জন্ম নেন। গ্রামের পাশে আরো একটি

স্তূপ দেখা যাবে। এখানেই তিনি পরম-নির্বাণ লাভ করেন। এই স্তূপটিতে তাঁর মরদেহের অবশেষ রয়েছে। পূজনীয় মুদ্‌গলপুত্র এক নামকরা ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। ছোটকাল থেকেই তিনি ও সারিপুত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সব কথা প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতার জন্য সারিপুত্রের বিরাট খ্যাতি ছিল। অপরজনের খ্যাতি ছিল ধারণ ক্ষমতা ও জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ প্রতিভার জন্য। তাঁদের জ্ঞান ও প্রতিভা ছিল সমান স্তরের। তাঁরা সব সময় একই সঙ্গে থাকতেন। তাঁদের লক্ষ্য এবং বাসনাও প্রথম থেকে পর্যন্ত অভিন্ন ছিল।

মুদ্‌গলপুত্রের জন্ম-গ্রাম থেকে ৩।৪ লি পূর্বদিকে গেলে একটি স্তূপ। বুদ্ধদেবের সাথে দেখা করতে রাজা বিম্বিসার এখানে আসেন।

এই জায়গাটি থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রায় ২০ লি পথ চলার পর আমরা কালপিনাক শহরের দেখা পাই। এই শহরটিতে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ আছে। পূজনীয় সারিপুত্র এখানে জন্ম নেন। এখানকার কূয়াটি এখনো বর্তমান। এর পাশেই একটি স্তূপ আছে। এখানে সারিপুত্র নির্বাণ লাভ করেন। এই স্তূপে তাঁর দেহাবশেষ রাখা আছে। তিনিও বড়ো ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। তাঁর পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত ও গুণীব্যক্তি ছিলেন। সারিপুত্র বুদ্ধের আগেই মারা যান।

কালপিনাক শহর থেকে ৪-৫ লি দক্ষিণ পূর্বদিকে একটি স্তূপ দেখা যাবে।

সেখান থেকে পূর্বদিকে ৩০ লি মতো যাবার পর আমরা ইন্দ্রশৈল গুহা পর্বতে পেঁছাই। খাড়া পাহাড়ী অঞ্চল ও উপত্যকাগুলি বেশ থমথমে ও ছায়ান্ধকার। বন জঙ্গলের মতো গাদা গাদা ফুলের গাছ। পাহাড়টির দুটি চূড়া। বেশ খাড়া, আকাশ ছোঁয়া। পশ্চিম চূড়ার ডাইনে নিচু পাহাড়মালার মাঝে একটি বড়ো গুহা আছে। এটি বেশ চওড়া হলেও তেমন উঁচু নয়। বুদ্ধ এখানে থাকাকালে দেবরাজ ইন্দ্র পাথরের উপর ৪২টি কূটচিত্র আঁকেন ও বুদ্ধের কাছে তার ব্যাখ্যা চান।

বুদ্ধ সেগুলির ব্যাখ্যা দেন। এই কূটচিত্রগুলি এখনো বর্তমান। বর্তমানকালের লোকেরা এই পবিত্র চিত্রগুলি দেখে নকল করার চেষ্টা করে। যারা এখানে পূজা দিতে আসে তাদের মধ্যে এক ধর্মীয় ভাবান্তর দেখা দেয়।

পাহাড়ের গায়ে বিগত চার বুদ্ধের ওঠা-বসা, চলা-ফেরার চিহ্ন আজো বর্তমান। পূর্বদিকের চূড়ার উপরে একটি সংঘারাম রয়েছে। আর তার সামনে একটি স্তূপ। নাম হংস-স্তূপ।

ইন্দ্রশৈল গুহা পর্বতমালা থেকে ১৫০ বা ১৬০ লি মতো উত্তর-পূর্বদিকে গেলে কপোতক সংঘারামের দেখা পাওয়া যাবে। এখানে ২০০ জনের মতো ভিক্ষু বাস

করেন। এঁরা সর্বাস্তিবাদ শাখার অনুগামী। সংঘারামের পূর্বদিকে রাজা অশোকের গড়া একটি স্তূপ।

এখান থেকে ২/৩ লি দক্ষিণ দিকে গেলে একটি নিরালা পাহাড় দেখা যাবে। পাহাড়টি বিরাট উঁচু ও ঘন বন-জঙ্গলে পুরোটা ঢাকা। নানারকমের নামকরা ফুল ও ঝরনার নির্মল জলধারায় এর চারদিক ঘেরা। এই জলধারা এর খাদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। এই পর্বতটিতে অনেকগুলি বিহার ও পুণ্য মন্দির রয়েছে। এগুলি অতি উঁচুদরের শিল্পভাস্কর্য মণ্ডিত। বিহারের ঠিক মধ্যস্থলে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি রয়েছে। হাতে পদ্মফুল ও মাথার উপর একটি বুদ্ধ মূর্তি।

এখানে সবসময়ই কিছু লোকে বোধিসত্ত্বের দেখা পাওয়ার জন্য উপোস ক'রে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে। ৭ দিন, ১৪ দিন এমনকি পুরো একমাসও তারা এরকম হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে। যারা প্রকৃত অনুরাগী তারা দেখা পায়।

পুরাকালে সিংহলের রাজা সকালবেলা আয়নায় নিজের মুখ দেখতে গিয়ে নিজের মুখের বদলে জম্বুদ্বীপের মগধ দেশের একটি পর্বত উপরে তালবনের মধ্যে বোধিসত্ত্বের এই মূর্তিটি দেখতে পান। রাজা মূর্তিটির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনুসন্ধান শুরু করলেন। তারপর এই পাহাড়ে এসে তার সন্ধান পেলেন। তখন তিনি এখানে একটি বিহার বানিয়ে দিলেন ও নিয়মিত পূজার্চনার ব্যবস্থা করলেন। পরবর্তী রাজারা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এখানে আরো বিহার ও স্তূপাদি গড়েন। এখানে গান বাজনা-সহ সব সময়ে ফুল ধূপ ও ধুনা জ্বালানো হয়।

এই বিহারটি থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে ৪০ লি মতো পথ এগিয়ে যাবার পর একটি সংঘারাম দেখা যাবে। এখানে ৫০ জনের মতো ভিক্ষু থাকেন। এরা সকলেই হীন-যানের উপাসক। সংঘারামটির সামনে একটি স্তূপ আছে। এর পাশেই বিগত তিন বুদ্ধের বসা ও চলাফেরার চিহ্ন রয়েছে।

সংঘারামটি থেকে উত্তর-পূর্বদিকে ৭০ লি যাবার পর গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে একটি বড়ো গ্রামে এসে হাজির হলাম। গ্রামটিতে অনেক লোকের বাস। এখানে অনেক দেবমন্দির আছে। প্রত্যেকটিই সুন্দরভাবে নানা কারুকাজ করা।

এখান থেকে অল্প কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটি বড় স্তূপ চোখে পড়লো।

আরো পূর্বদিকে এগিয়ে আমরা এক নির্জন পর্বতমালার মধ্যে এসে ঢুকলাম। এই পাহাড়মালা ভেঙে প্রায় ১০০ লি পথ চলার পর 'লো-ইন-নি-লো' গ্রামের সংঘারামটিতে এসে উপস্থিত হলাম।

এই সংঘারামটির সামনে অশোক রাজার তৈরী একটি বড়ো স্তূপ আছে। এর

উত্তর দিকে ২ বা ৩ লি মতো গেলে একটি বিরাট হ্রদের দেখা পাওয়া যাবে। এটির ঘের প্রায় ৩০ লির মতো। সব ঋতুতেই এখানে চার রকম রঙের পদ্মফুল ফোটে।

॥ ৪৩ ॥ 'ই-লান-ন-পো-ফো-তো' বা হিরণ্য পর্বত

এবার আরো পূর্বদিকে এগিয়ে চললাম। এক বিরাট নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ চলেছি। এ অরণ্য যেন আর শেষ হয় না। ২০০ লি মতো যাবার পর এলাম ই-লান-ন-পো-ফো-তো বা হিরণ্যপর্বত রাজ্যে।

তিন হাজার লি মতন পরিসর এ রাজ্যটির। রাজধানীর আয়তন মোটামুটি ২০ লি। তার উত্তর দিক দিয়ে গঙ্গা নদী বয়ে চলেছে। এখানে নিয়মিত চাষ-আবাদের কাজ হয়। ফসলের প্রচুর ফলন। ফুল ফলও অফুরান। আবহাওয়া বেশ ভালই, গরমের দাপট তেমন জোরালো নয়। মানুষজন সৎ ও সরল।

দশটি সংঘারাম আছে। সেখানে চার হাজারের মতো ভিক্ষু। বেশির ভাগই হীনযানের সম্মতীয় শাখার অনুগামী। ১২টির মতো দেবমন্দির। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্যধর্মীরা সেখানে থাকে।

সম্প্রতি পাশের কোন এক রাজ্যের রাজা এ রাজ্যটি দখল ক'রে নিয়েছেন। তিনি বৌদ্ধদের প্রতি উদার। এ শহরে তিনি দুটি সংঘারাম তৈরী ক'রে দিয়েছেন। প্রত্যেকটিতে হাজারের চেয়ে কিছু কম ভিক্ষু থাকার ব্যবস্থা আছে। দুটি সংঘারামই হীনযানের সর্বাস্তিবাদ শাখার অনুগামী।

রাজধানীর পাশে গঙ্গা নদীর কোল ঘেঁষে হিরণ্য পর্বত। ধোঁয়া আর বাষ্প উগরে পর্বতটি সূর্য ও চাঁদের আলো তার আস্তরণে ঢেকে চলেছে। সুদূর অতীত থেকে অধুনা পর্যন্ত এটি মুনিঋষিদের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে আছে। এখন এখানে একটি দেবমন্দির রয়েছে। প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা যে সব বিধি-বিধান দিয়ে গেছেন, মন্দিরটিতে এখনও সে সব মেনে চলা হয়। তথাগতও অতীতে এখানে বাস ক'রে গেছেন, ব্যাখ্যান করে গেছেন পরম ধর্মের।

রাজধানীর দক্ষিণ দিকে একটি ও তার পশ্চিমে আরেকটি স্তূপ।

দেশের পশ্চিম সীমানার দিকে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ বরাবর একটি নির্জন পাহাড় রয়েছে। এটির দুটি চূড়া। অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠে গেছে চূড়া দুটি।

পর্বতটির দক্ষিণ-পূবে একটি পাথরের উপর বুদ্ধের উপবেশন চিহ্ন রয়েছে। এর উপর একটি স্তূপ গড়া হয়েছে।

তার দক্ষিণ-পূবে একটি জায়গায় যক্ষ বকুলের পদচিহ্ন রয়েছে। পর্বত চূড়ায়ও বুদ্ধদেবের পদচিহ্নের উপর একটি স্তূপ বানানো হয়েছে।

এর পশ্চিমদিকে ছয় সাতটি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। তার জল খুবই গরম।

দেশটির দক্ষিণ সীমানা ঘিরে বিরাট পাহাড়ী বনাঞ্চল। সেখানে বড়ো বড়ো বুনো হাতির বাস।

॥ ৪৪ ॥ 'চেন-পো' বা চম্পা

হিরণ্য পর্বত রাজ্য পিছনে রেখে, গঙ্গা পার হয়ে, তার দক্ষিণ তীর বরাবর পুব দিকে চলতে থাকলাম। প্রায় তিনশো লি পথ পার হবার পর চেন-পো বা চম্পা রাজ্যের দেখা পেলাম।

চম্পা রাজ্যটির আয়তন চার হাজার লির মতো। রাজধানীর উত্তর সীমানা দিয়ে গঙ্গা নদী বয়ে চলেছে। শহরটি আকারে ৪০ লির মতো। ভূমি সমতল ও উর্বরা। নিয়মিত চাষ আবাদের কাজ হয়, ফসলের ফলনও পর্যাপ্ত। আবহাওয়া মোলায়েম ধরনের, গরমের দাপট রয়েছে কিছুটা। লোকজন সৎ ও সরল স্বভাবের। অনেকগুলি (কয়েক দশ) সংঘারাম আছে। বেশির ভাগেরই ভাঙাদশা। মাত্র শ'ছয়েক ভিক্ষুর দেখা পাওয়া গেলো সেগুলিতে। তাদের সকলেই দেখলাম হীনযানের অনুগামী।

কুড়িটির মতো দেব মন্দির। সেখানে সব সম্প্রদায়ের বিধর্মীরাই থাকে।

রাজধানীর আরক্ষা-প্রাকার ইট দিয়ে গড়া ও রীতিমতো উঁচু (কয়েক দশ ফুট)। খুব উঁচু বাঁধের উপর এই সব দেয়ালের ভিতের পত্তন করা হয়েছে। ফলে, এই দেয়াল পাহাড়ের মতো খাড়া। শত্রুর আক্রমণ সহজেই ব্যর্থ করে দিতে পারে।

শহর থেকে ১৪০/১৫০ লি মতো পুবে, গঙ্গা নদীর দক্ষিণ দিকে, একটি নির্জন ও বিচ্ছিন্ন পর্বত রয়েছে। পাহাড়টি বেশ খাড়া ও এবড়ো খেবড়ো, চারিদিক জলে ঘেরা। পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে একটি দেব মন্দির। পাহাড় কুরে কুরে কতক ঘর বানানো হয়েছে। প্রত্যেকটি ঘরের মধ্য দিয়ে নদীর ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে। নানা বিচিত্র ফুলগাছে জায়গাটি নয়ন জুড়ানো ফুলের অরণ্য হয়ে উঠেছে। এখানকার পাহাড়ে কন্দরে অনেক সাধু-সন্ত-জ্ঞানীর আবাস। যারা একবার এখানে আসে তাদের আর ফিরে যেতে মন চায় না।

দেশটির দক্ষিণ সীমানা ঘিরে বুনো জন্তু-জানোয়ার ভরা গভীর অরণ্য। বুনো হাতি, নানা রকম হিংস্র পশুরা দল বেঁধে ঘোরাফেরা করে সেখানে।

॥ ৪৫ ॥ 'কিএ-চু-হোহ-খি-লো' বা কজুঘীর (বা কজিংঘরা)

চম্পা থেকে পুবদিকে গেলাম এবার। চারশো লি মতো পথ চলার পর দর্শন পেলাম 'কিএ-চু-হোহ-খি-লো' বা কজুঘীর-এর।

এই রাজ্যটির পরিসর ২০০০ লির মতো হবে। জমি সমতল ও মাটি দো-আঁশ।

চাষ আবাদ ক'রে ফসলের ফলনও প্রায় অঢেল। গরমের দেশ। অধিবাসীদের চালচলনের মধ্যে সরলতার ভাব রয়েছে। উঁচু প্রতিভাবান লোকেদের বিশেষ শ্রদ্ধা সম্মান দেখায়। লেখাপড়া ও শিল্পকলাকে যথেষ্ট সমাদর করে।

ছ'টি সাতটি সংঘারাম আছে এখানে। ভিক্ষু আছেন সেখানে তিনশো জনের মতো। দশটির কাছাকাছি দেব মন্দির। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্যধর্মীরা সেখানে থাকে।

কয়েক শতাব্দী হলো এখানকার রাজবংশ লোপ পেয়ে গেছে। একটি পড়শী রাজ্য এখন একে শাসন করছে। এর শহরগুলোতে মানুষজন একরকম নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ লোকই গ্রামে ও আশ্রমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এজন্য পূব-ভারতে ঘুরে বেড়ানোর কালে শীলাদিত্য রাজা এখানে একটি প্রাসাদ গড়েন ও সেখান থেকে তাঁর বিভিন্ন রাজ্যের কাজকর্ম চালানোর ব্যবস্থা করেন। গাছের ডালপালা ও খড় দিয়ে অস্থায়ীভাবে এটি হয়েছিল। তিনি চলে যাবার পর সেটি পুড়িয়ে ফেলা হয়। দেশটির দক্ষিণ সীমানায় অনেক বুনো হাতির আবাস।

উত্তর সীমানায় গঙ্গা নদীর কাছেই একটি বেশ বড়ো ও উঁচু স্তূপ রয়েছে। এটি ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী। এর ভিত বেশ প্রশস্ত ও উঁচু। নানারকম দুর্লভ ভাস্কর্য-কলা এর গায়ে খোদাই করা। স্তূপের চারিদিকে মুনিঋষি, দেবতা ও বুদ্ধদেবের মূর্তি আলাদা আলাদা খোপের মধ্যে খোদাই করা রয়েছে।

॥ ৪৬ ॥ 'পুন-ন-ফ-তন-ন' বা পুণ্ড্রবর্ধন

পূর্বদিকে এগিয়ে চললাম। গঙ্গা নদীও পার হলাম। প্রায় ৬০০ লি মতন পথ ভাঙার পর এলাম 'পুন-ন-ফ-তন-ন' বা পুণ্ড্রবর্ধন।

এ রাজ্যটি আকারে ৪০০ লি প্রায়। রাজধানী ৩০ লির কাছাকাছি। বেশ ঘন বসতির দেশ। পুকুর, সরকারী দপ্তর আর পুষ্পকুঞ্জ পর পর চোখে পড়বে। জমি সমতল। মাটি দো-আঁশ। সবরকম শস্যের অপর্যাপ্ত ফলন। পণস ফল প্রচুর পরিমাণে ফলে ও এখানে তার বেশ আদর রয়েছে। এর ফল এক একটি কুমড়োর মতো বিরাট। পাকলে হলুদাভ-লাল রঙের চেহারা নেয়। ভাঙলে তার ভেতর পায়রার ডিমের মতো অগুণতি ছোট ছোট ফল দেখা যাবে। এই ফলগুলি হলুদাভ-লাল রঙের ও রসে ভর্তি। গন্ধও অতি মধুর। এ ফল কখনো অন্যান্য ফলের মতন গাছের ডালে হয়, কখনো বা গাছের গুঁড়িতে। আবহাওয়া না বেশি গরম না বেশি ঠাণ্ডা। জ্ঞান চর্চাকে লোকেরা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

এখানে কুড়িটির মতন সংঘারাম আছে। ভিক্ষু আছেন তিন হাজার প্রায়। হীনযান ও মহাযান দু'য়েরই চর্চা করেন তাঁরা।

শ'খানেকের মতো দেবমন্দির রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্য-ধর্মীরা সেখানে বসবাস করেন। নগ্ন নির্গ্রন্থ উপসাকদের সংখ্যা সব থেকে বেশি।

রাজধানী থেকে ২০ লি মতন গেলে পো-চি-পো সংঘারামটি দেখা যাবে। এর আঙিনাগুলি বড়ো ও আলোক ভরা। গম্বুজ ও মণ্ডপগুলি খুব উঁচু। ৭০০ জনের মতো ভিক্ষু রয়েছেন। মহাযান শাখার চর্চা করেন। ভারতের পূব অঞ্চলের অনেক নামকরা ভিক্ষু এখানে থাকেন।

এর কাছেই রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ রয়েছে। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্তি থাকা একটি বিহারও দেখলাম।

॥ ৪৭ ॥ 'কিআ-মো-লু-পো' বা কামরূপ

পুণ্ড্রবর্ধনকে পেছনে ফেলে আরো পূর্বদিকে চলেছি। ৯০০ লি মতো পথ ভেঙে একটি নদী পেরিয়ে কিআ-মো-লু-পো বা কামরূপ রাজ্যে এলাম। (আসলে তিনি মগধ থেকে কামরূপ আসেন।)

এ রাজ্যটির আয়তন দশ হাজার লির কাছাকাছি। রাজধানীর পরিধি হবে প্রায় ৩০ লি। এখানকার জমি নিচু। কিন্তু বেশ সরস ও উর্বরা, নিয়মিতভাবে চাষ আবাদ হয়ে থাকে। এখানে পণস (কাঁঠাল) ও নারিকেল চাষ হয়। ফল দুটির গাছ এখানে অগুণতি হলেও বিশেষ মূল্য বা মর্যাদা পায় না। নদী বা বাঁধানো সরোবর থেকে খাল কেটে নিয়ে আসা জল শহরগুলিকে ঘিরে বয়ে চলেছে। আবহাওয়া কোমল ধরনের শীত ও গরম কোনটাই বেশি গায়ে বেঁধে না। লোকজনের চালচলন সাদামাটা। সৎ প্রকৃতির। এদের চেহারা ছোটোখাটো, গায়ের রঙ ঘন-হলুদ ঘেঁসা।। ভাষা তাদের মধ্য ভারতের ভাষার চেয়ে একটু অন্যরকম। স্বভাব অতি একগুঁয়ে ও বুনো ধরনের। স্মরণশক্তি বেশ প্রখর। জ্ঞান চর্চার দিকে বেশ আগ্রহী।

তারা দেবতাদের পুজো করে ও তাদের কাছে বলি দেয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি কোন অনুরাগ নেই। এ জন্য বুদ্ধের জন্ম থেকে এ যাবৎ একটিও সংঘারাম তৈরী হয়নি।

একশোটির মতো দেবমন্দির আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কয়েক অযুত অনুগামী আছেন সেখানে। বর্তমান রাজা প্রাচীন বিষ্ণুদেব পন্থী। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম ভাস্কর বর্মন, উপাধি—কুমার। এ বংশ এ রাজ্যের রাজা হবার পর থেকে বর্তমান রাজা পর্যন্ত এক হাজার প্রজন্ম পার হয়েছে। রাজা জ্ঞান চর্চায় বিশেষ অনুরাগী। তাঁর দেখাদেখি তাঁর প্রজারাও এদিকে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিভাবান লোকেরা কাজের আশায় তাঁর কাছে আসেন। তিনি বুদ্ধদেবের অনুগামী না হলেও বিদ্বান শ্রমণদের খুব শ্রদ্ধা করেন। বুদ্ধের মহান ধর্মমত অধ্যয়ন করার

জন্য চীনের মতো এক দূরদেশ থেকেও একজন শ্রমণ মগধের নালন্দা বিহারে এসেছেন ও কঠোর শ্রম ক'রে অধ্যয়ন ক'রে চলেছেন এ খবর তাঁর কানে যেতেই তিনি এর মধ্যেই তিন তিন বার আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমি যাইনি। তখন আচার্য শীলভদ্র আমায় বললেন: 'বুদ্ধদেবের প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা থাকলে তাঁর সত্য-ধর্ম প্রচারের দিকে তোমার মন দেয়া উচিত। এ তোমার এক কর্তব্য। দূর পথকে তোমার ভয় করা উচিত নয়। কুমার রাজা ও তাঁর পরিবারের লোকেরা অন্য-ধর্মীদের অনুগামী। অথচ তিনি একজন শ্রমণকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। এ এক শুভ লক্ষণ। এ থেকে মনে হচ্ছে তাঁর মনের ও মতের পরিবর্তন ঘটছে। তিনি সত্যিকারের পুণ্যকর্ম করে অপরের মঙ্গল করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সকলের উপকারের জন্য তুমি এর আগে জীবনের পরোয়া না ক'রেও একা একা এখানে আসার শপথ নিয়েছিলে।' ...এভাবে তিনি আমায় উদ্বুদ্ধ করতে আমি আর কোনরকম ছলছুতো বা বিলম্ব না করে তাঁর দূতের সঙ্গে সোজা তাঁর রাজ্যে যাত্রা করলাম।

আমি আসতে কুমার রাজা বললেন: 'আমার যদিও কোনরকম প্রতিভা নেই তাহলেও আমি সব সময়ে বিশেষ জ্ঞানী লোকেদের ভাল চাই। আপনার খ্যাতি ও গুণের কথা শোনার পর থেকে তাই আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাবার সাহস করেছি।'

আমি উত্তর দিলাম: 'আমার বিদ্যাবুদ্ধি অতি সামান্য। আমার তো মনে হয় আপনি আমার অখ্যাতির কথাই শুনে থাকবেন।'

এভাবে নানা কথা বিনিময়ের পর তিনি আমার কাছ থেকে চীন রাজার বিরাট সাম্রাজ্যের কথা শুনে, সেখানে যাবার গভীর বাসনার কথা প্রকাশ করলেন। শেষে বললেন: রাজা শীলাদিত্য এখন কজুঘীর রয়েছেন। জ্ঞান ও পুণ্যের শিকড় গভীরে ছড়িয়ে দেবার জন্য তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বিরাট দানধ্যান করবেন। পঞ্চ ভারতের সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের সেখানে সমবেত হওয়া বিশেষ জরুরী। তিনি আমায় নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। আমার অনুরোধ আপনিও আমার সঙ্গে চলুন।

এর পর আমরা একসঙ্গে যাত্রা করলাম।

এ রাজ্যটির পূর্বদিকটি সার সার পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এজন্য সেদিকে কোন বড়ো শহর নেই। রাজ্যের সীমান্ত দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের অসভ্য উপজাতি এলাকার সংলগ্ন। এইসব উপজাতির লোকেরা রীতিনীতি চালচলনের দিক থেকে আসলে 'মন' গোষ্ঠীর লোকেদের সমগোত্রীয়। খোঁজ খবর নিয়ে যা জানলাম তা থেকে আমার ধারণা হলো যে, এদিক দিয়ে দু'মাস ধরে হাঁটলে আমরা ঝে'চুয়েন (শুহ্) প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় গিয়ে পেঁছাবো। কিন্তু পর্বত ও নদী এই যাবার ব্যাপারে

বিশেষ প্রতিবন্ধক। দূষিত বাতাস, বিষ বাষ্প, ভয়ংকর সব সাপ ও বিষাক্ত গাছ-পালার দরুণ পদে পদে মরণের ভয় রয়েছে।

রাজ্যটির দক্ষিণ-পূবে পালে পালে বুনো হাতিরা ঘুরে বেড়ায়। এজন্য, এখানে এদের বিশেষভাবে যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।

॥ ৪৮ ॥ 'সন-মো-ত-চ' বা সমতট

এখান থেকে ১২০০—১৩০০ লি দক্ষিণ দিকে পথ চলে সন-মো-ত-চ বা সমতট উপস্থিত হওয়া যায়। [পুণ্ড্রবর্ধন—কর্ণসুবর্ণ—সমতট এই পথে আসেন]

সাগরকূলে থাকা এ রাজ্যটির আয়তন তিন হাজার লি মতো। জমি নিচু ও সরস। রাজধানীর পরিধি ২০ লি খানেক হবে। শস্যের প্রচুর ফলন দেখে বোঝা যায় চাষ আবাদের কাজ নিয়মিত বেশ আগ্রহের সঙ্গেই করা হয়ে থাকে এখানে। যেদিকে চোখ ফেরাও শুধু ফুল আর ফল। আবহাওয়া স্নিগ্ধ। লোকের আচার ব্যবহার বেশ মোলায়েম। অধিবাসীরা সহজাত ভাবেই পরিশ্রমী। ছোটোখাটো গড়নের শরীর, গায়ের রঙ কালচে ধরনের। জ্ঞান চর্চা করতে বেশ ভালো পারে, তাকে আয়ত্ত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। সত্যধর্ম ও অন্য ধর্ম দুয়েরেই অনুগামী আছেন এখানে। তিরিশটি বা তার কাছাকাছি সংঘারাম আছে, প্রায় দু' হাজার ভিক্ষু থাকেন। সকলেই স্থবির শাখার অনুগামী। শ' খানেক দেবমন্দির রয়েছে। সেখানে সবরকম অনুগামীই থাকেন। নগ্ন নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীরাই সব থেকে বেশি।

শহরের বাইরে একটুখানি গেলেই অশোক রাজার তৈরী একটি স্তূপ দেখা যাবে।

এর কাছাকাছি একটি সংঘারাম আছে। সেখানে সবুজ পাথরে (Jade) গড়া একটি বুদ্ধমূর্তি দেখতে পেলাম। মূর্তিটি আট ফুট উঁচু।

এখান থেকে উত্তর-পূর্বদিকে সাগরকূল ধরে এগিয়ে গেলে শ্রীক্ষেত্র রাজ্যে আসা যায় (Shi-li-cha-to-lo = Burma)।

এরপর দক্ষিণ-পূর্বদিকে গেলে সাগরকূলে কামলঙ্কা (Kia-mo-long-kia ≑ Pegu)। আরো পূর্বদিকে গেলে দ্বারপতি (To-Lo-Pa-ti = Probably Shyam)। তারপর আরো পূর্বদিকে এগোলে দেখা মিলবে ঈশানপুরের (I-Shang-na-pu-lo)। আরো পূবে গেলে মহাচম্পা (Mo-ho-chem-po)। এর পর দক্ষিণ-পশ্চিমে চললে যমনদ্বীপ। এ ছ'টি দেশ এতো পাহাড়-পর্বত নদীতে ভরা যে সেখানে যাওয়া অসম্ভব।

॥ ৪৯ ॥ তান-মো-লি-তি বা তাম্রলিপ্ত

সমতট থেকে পশ্চিমদিকে ৯০০ লির মতো পথ ভাঙার পর তান-মো-লি-তি বা তাম্রলিপ্ত রাজ্যের দেখা পাওয়া যাবে।

রাজ্যটি আকারে ১৪০০ থেকে ১৫০০ লি মতো। রাজধানীর আয়তন দশ লি খানেক। এ রাজ্যটিও সাগরকূলে। ভূমি নিচু ও সরস। নিয়মিতভাবে চাষবাসের কাজ হয়। দেদার ফুল ও ফলের ছড়াছড়ি। আবহাওয়া গরম ধাঁচের। লোকজনেরা চটপটে ও ব্যস্তবাগীশ। বেশ পরিশ্রমী ও সাহসী। সত্যধর্মানুরাগী ও অন্য-ধর্মী দুই-ই আছে।

এখানে দশটির মতো সংঘারাম। সেখানে হাজার জনের কাছাকাছি ভিক্ষু থাকেন। দেবমন্দির প্রায় পঞ্চাশটি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্য-ধর্মীরা সেখানে মিলেমিশে বাস করছেন। দেশটির উপকূল একটি সমুদ্র খাড়ি দিয়ে ঘেরা (উপসাগর)। জল ও ভূমি যেন একে অপরকে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে। প্রচুর পরিমাণে নানারকম দামী দামী পণ্যসামগ্রী ও রত্নাদি এখান থেকে সংগ্রহ করা হয়। এজন্য এখানকার লোকেরা সাধারণভাবে বেশ ধনী।

শহরের কাছ ঘেঁষে অশোক রাজার গড়া একটি স্তূপ রয়েছে।

॥ ৫০ ॥ 'কিএ-লো-ন-সু-ফ-ল-ন' বা কর্ণসুবর্ণ

তাম্রলিপ্ত থেকে উত্তরদিকে চললাম। ৭০০ লি মতন চলার পর এলাম আমরা কিএ-লো-ন-সু-ফ-ল-ন বা কর্ণসুবর্ণ।

এ রাজ্যটির ঘের ১৪০০ থেকে ১৫০০ লি। রাজধানীর পরিধি ২০ লির কাছাকাছি। ঘন জনবসতিতে ভরা। পরিবারগুলি বেশ ধনী ও সমৃদ্ধ। জমি নিচু ও মাটি দো-আঁশ। চাষ আবাদ বরাবর নিয়ম মতো হয়ে আসছে। অফুরান ফুলের চাষ। এ ছাড়া নানা ধরনের অসংখ্য দামী দামী সামগ্রীর চাষ। আবহাওয়া বেশ মনোরম। লোকেরা অমায়িক ও সৎ। জ্ঞান চর্চাকে অত্যধিক ভালোবাসে। অতি আগ্রহের সঙ্গে এর চর্চা করে। বৌদ্ধধর্মী ও অন্য-ধর্মী দুই-ই আছে এদের মধ্যে।

সংঘারাম রয়েছে দশটির মতো। সেখানে দু'হাজারের মতো ভিক্ষু থাকেন। হীনযানের সম্মতীয় শাখার অনুগামী তাঁরা।

দেবমন্দির পঞ্চাশের মতো হবে। সেখানে অসংখ্য অন্য-ধর্মীর বাস।

এ ছাড়া আরো তিনটি সংঘারাম রয়েছে। এখানে দেবদত্তর নির্দেশ মেনে দই ব্যবহার করা হয় না।

রাজধানীর পাশেই একটি সংঘারাম আছে। এটির নাম রক্তবিতি। এর মহা-কক্ষগুলি বেশ বড়োসড়ো ও আলো বাতাস ভরা। তলযুক্ত গম্বুজগুলি খুবই উঁচু। রাজ্যের সেরা জ্ঞানীগুণী খ্যাতিবানরা সকলেই প্রায় এখানে সমবেত হন। তাঁরা একে অপরের চরিত্র গঠনে, জ্ঞানের অগ্রসর প্রচেষ্টায় সাহায্য করেন। আগে এখানকার

লোকজন বুদ্ধের মতবাদের প্রতি অনুরাগী ছিল না। এ সময়ে একজন দক্ষিণ ভারতীয় বিধর্মী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর পেটে তামার পাত বেঁধে রাখতেন, কপালে একটি জ্বলন্ত মশাল। সদর্পে পা ফেলে লাঠি হাতে তিনি এ দেশে এসে হাজির হলেন। বিতর্ক সভা আহ্বানের ভেরী বাজিয়ে তর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাইলেন। একটি লোক তখন প্রশ্ন করলো ঃ আপনার এমন বিচিত্র সাজ কেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ আমার বিদ্যা এতো বেশি যে ভয় হয় তা পাছে পেট ফেটে বেরিয়ে যায়। অসংখ্য লোক নিদারুণ অজ্ঞতার আঁধারে বাস করছে দেখে আমার তাদের জন্য ভারি দুঃখ হয়, তাদের (জ্ঞানের) আলো দেখানোর জন্যই আমি কপালে মশাল জ্বালিয়েছি।

দশদিন কেটে গেল। তাঁর সঙ্গে তর্কে নামার মতো কাউকে পাওয়া গেল না। একজন বললো ঃ এখানে বনের মধ্যে একজন বিদেশী শ্রমণ আছেন। তিনি খুব পণ্ডিত। রাজা তাঁকে ডেকে আনলেন। তিনিও একজন দক্ষিণ ভারতীয়। তিনি সহজেই বিধর্মী পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করলেন।

রাজা শ্রমণের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে এই সংঘারামটি গড়ে দিলেন। সেই থেকে এখানে বুদ্ধদেবের শিক্ষা বিস্তার করতে থাকলো।

এই সংঘারাম থেকে অল্প কিছুদূরে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ রয়েছে। পাশেই একটি বিহার। যে সব জায়গায় বুদ্ধদেব এসে ধর্ম প্রচার করেন সে সব জায়গায় আরো কয়েকটি স্তূপ আছে। এগুলি রাজা অশোক বানিয়ে গেছেন।

॥ ৫১ ॥ 'উ-চ' বা উড্র

কর্ণসুবর্ণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে এগিয়ে প্রায় ৭০০ লি মতো যাবার পর উ-চ বা উড্র দেশ। [তাম্রলিপ্ত থেকে উড্র যান]

আয়তনে এ রাজ্যটি ৭০০০ লি মতন। রাজধানীর ঘের ২০ লি খানেক। প্রচুর ফসলের ফলন দেখে বোঝা যায় মাটি বেশ সরস ও উর্বরা। অন্য যে কোন দেশের তুলনায় এখানে যে কোন ফলের ফলন বেশি। এখানে যে সব নতুন ধরনের লতাগুল্ম ও নামকরা সব ফুল ফোটে সেগুলির তালিকা দেয়া বেশ দুরূহ।

আবহাওয়া গরম। মানুষজন সুসভ্য নয়। চেহারা লম্বা-চওড়া, গায়ের রঙ হলদেটে-কালচে। তাদের কথাবার্তার ভঙ্গী ও ভাষা মধ্য ভারতের চেয়ে আলাদা। তারা জ্ঞান চর্চ্চায় আগ্রহী ও এজন্য অবিরাম চেষ্টা ক'রে চলে। অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী।

একশোটির মতো সংঘারাম রয়েছে। দশ হাজারের মতো ভিক্ষু সেখানে থাকেন। সকলেই মহাযানের চর্চা করেন।

পঞ্চাশটির মতো দেবমন্দির। সব সম্প্রদায়ের বিধর্মীরাই সেখানে থাকেন।

বুদ্ধদেব এ রাজ্যের যে সব জায়গায় ধর্মপ্রচার ক'রে গেছেন সেখানেই একটি স্তূপ গড়া হয়েছে। এরকম স্তূপ মোট দশটি। সব ক'টিই রাজা অশোক গড়ে গেছেন।

রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের দিকে একটি বড়ো পাহাড়ের মাঝে 'পুষ্পগিরি' নামে একটি সংঘারাম আছে। এখানেও ৫ কটি স্তূপ আছে।

এর উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি পাহাড়ের উপর একটি সংঘারাম আছে। সেখানেও একটি স্তূপ দেখা যাবে।

রাজ্যের দক্ষিণ-পূব সীমান্তে, সাগরকূলে একটি শহর চোখে পড়লো। নাম চে-লি-ত-লো বা চরিত্র। আয়তনে ২০ লির মতো। এখান থেকে সওদাগরেরা দূর দেশে যাত্রা করে, বিদেশীরাও যায় আসে, অন্য কোথাও যাবার পথে এখানে থেমে বিশ্রাম নেয়। শহরটির দেয়াল বেশ মজবুত ও উঁচু। এখানে সব ধরনের দুর্লভ ও দামী দামী জিনিষ মেলে।

শহরের বাইরে পর পর পাঁচটি বিহার রয়েছে। এদের তলাবিশিষ্ট গম্বুজগুলি খুব উঁচু, চমৎকারভাবে মুনি-ঋষিদের মূর্তি খোদাই করা।

এখান থেকে কুড়ি হাজার লি মতন দক্ষিণদিকে গেলে তবে সিংহল।

॥ ৫২ ॥ 'কঙ্গ-উ-তো' বা কঙ্গোদ

উড্র থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে চললাম। পথে বিরাট বিরাট সব বনাঞ্চল পড়লো। তার মধ্য দিয়ে পথ চলে ১২০০ লি যাবার পর কঙ্গ-উ-তো বা কঙ্গোদ রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

রাজ্যটির আয়তন এক হাজার লির কাছাকাছি। রাজধানীর পরিধি ২০ লি মতো। একটি উপসাগর কূলে এ রাজ্যটি। এর পাহাড়মালাগুলি উঁচু আর খাড়া। জমি নিচু ও স্যাঁতসেঁতে। চাষ আবাদের কাজ লেগে আছে, ফসলও ভালো হয়। গরম আবহাওয়া। লোকজন সাহসী ও তাড়নার বশ। শরীরের গড়ন লম্বা-চওড়া, গায়ের রঙ কালো, নোঙরা থাকে। চাল-চলনের মধ্যে কিছুটা বিনয়ের ভাব দেখা যায় আর মোটামুটিভাবে সৎও বলা চলে। তাদের লিখিত বর্ণমালার চেহারা মধ্য ভারতের মতোই। কিন্তু ভাষা আর তার উচ্চারণ রীতি পুরোপুরি ভিন্ন। অন্য-ধর্মীদের মত-বাদের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা, বুদ্ধ ধর্মের প্রতি কোন অনুরাগ নেই।

শ'খানেকের মতো দেবমন্দির দেখা যাবে। সেখানে বোধহয় ১০ হাজারের কাছাকাছি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্যধর্মীরা থাকে।

এ রাজ্যের মধ্যে অনেকগুলি (কয়েক দশ) ছোট ছোট শহর রয়েছে। সাগরের সঙ্গে

সংযোগ রেখে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগুলি গড়ে উঠেছে। শহরগুলি স্বাভাবিক-ভাবেই বেশ উঁচু সুরক্ষিত। সৈন্যরাও বেশ সাহসী ও পরাক্রমী। পড়শী দেশগুলিকে তারা সৈন্যবলের সাহায্যে শাসন করে, কেউ এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

সাগর কূলের এই রাজ্যটিতে অনেক দুর্লভ আর দামী দামী জিনিষের প্রাচুর্য রয়েছে। কড়ি ও মুক্তা দিয়ে তারা বাণিজ্যিক আদানপ্রদান চালায়। সবজে নীলরঙা বড়ো বড়ো হাতি রয়েছে এখানে। এগুলিকে যানবাহন টানার কাজে ও অতি দূর-দেশে যাত্রার সময় ব্যবহার করা হয়।

॥ ৫৩ ॥ কিঅ-লিঙ্গ-কিঅ=কলিঙ্গ

কঙ্গোদ পিছনে ফেলে আরো দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে যাত্রা শুরু হলো। বুনো জন্তু জানোয়ারে ভরা বন আর গভীর জঙ্গল। গাছগুলো যেন একেবারে স্বর্গে মাথা উঁচিয়েছে। সূর্যের মুখ দেখার একটুও উপায় নেই। এই পথ ধরে ১৪০০ থেকে ১৫০০ লি যাবার পর আমরা পা রাখলাম কলিঙ্গ রাজ্যে।

এ দেশটির আয়তন পাঁচ হাজার লির মতো হবে। রাজধানীর পরিধিও ২০ লি খানেক। নিয়মিতভাবে চাষবাসের কাজ চলে, ফলনও ভালো। ফুল ও ফল অফুরান। বেশ কয়েকশো লি জুড়ে একটানা বন-জঙ্গল-অরণ্য। সবজে-নীল রঙের বুনো হাতি প্রচুর। পড়শী দেশগুলিতে এই হাতির বেশ কদর রয়েছে।

আবহাওয়া অঙ্গারের মতো জ্বলন্ত। মানুষজন উগ্র ও দুর্বিনীত। তাদের চাল-চলন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রুক্ষ ও অভদ্র হলেও কথা দিলে কথা রাখে ও বিশ্বাস করা চলে। তাদের ভাষা হালকা ও ছন্দোগতিময়। উচ্চারণ পরিষ্কার ও নির্ভুল। কিন্তু শব্দ ও ধ্বনির ক্ষেত্রে মধ্য ভারত থেকে তারা যথেষ্ট ভিন্ন।

এখানকার খুব কম লোকই বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী। অন্য ধর্মীরাই প্রধান। দশটির মতো সংঘারাম আছে। ভিক্ষু ৫০০ খানেক। এরা স্থবির শাখানুগামী মহাযান-পন্থী।

শ' খানেক দেবমন্দির রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিধর্মীরা অগুণতি সংখ্যায় সেখানে থাকে। সব থেকে বেশি হলো নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের অনুগামী।

আগে এখানে খুব ঘন বসতি ছিল। তারপর এক ঋষির ক্রোধে রাজ্যটি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। বাইরের লোকেরা এসে এখানে ধীরে ধীরে বসবাস শুরু করে। তবুও যথেষ্ট বসতি এখনো গড়ে ওঠেনি।

রাজধানী থেকে অল্প কিছু দূরে একশো ফুট মতো উঁচু একটি স্তূপ রয়েছে। রাজা অশোক এটি বানিয়ে গেছেন।

রাজ্যটির উত্তর সীমানায় একটি বড়ো খাড়া পাহাড়ের উপরেও (মহেন্দ্র গিরি) একশো ফুটের মতো উঁচু একটি পাথরের স্তূপ রয়েছে।

॥ ৫৪ ॥ কিও-স-লো : কোশল

কলিঙ্গ থেকে উত্তর-পশ্চিমদিকে রওনা হলাম এবার। শুধু বন আর বন, পাহাড় আর পাহাড়। এরই মধ্য দিয়ে প্রায় ১৮০০ লি পথ ভাঙবার পর এলাম কিও-স-লো বা কোশল (দক্ষিণ কোশল)।

পাঁচ হাজার লি মতো আয়তনের এ রাজ্যটির সীমা পাহাড় কন্দর দিয়ে ঘেরা। একের পর এক ঘন বন আর জঙ্গল। রাজধানী শহরটির ঘের ৪০ লি হবে। জমির সরসতা ও উর্বরতার জন্য ফসলের ফলনও অঢেল।

শহর আর গ্রামগুলি যেন গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে। ঘন বসতি ভরা এলাকা। মানুষজন বেশ লম্বা-চওড়া চেহারার। গায়ের রঙ কালো। মেজাজ কড়া, মার, দাঙ্গা-প্রবণ। সাহসী আর গোঁয়ার। বৌদ্ধ ও অন্য-ধর্মী দু'রকমই রয়েছে। লেখাপড়া, জ্ঞান চর্চায় আগ্রহী ও খুব চালক চতুর বুদ্ধিমান।

রাজা ক্ষত্রিয় জাতির লোক। বুদ্ধের ধর্মমতের প্রতি গভীর অনুরাগী। তাঁর সদগুণাবলী ও সহৃদয়তার খ্যাতি দূর দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

শ' খানেক সংঘারাম রয়েছে। হাজার দশেকের কিছু কম ভিক্ষু সেখানে থাকেন। সকলেই তাঁরা মহাযানের অনুগামী। দেবমন্দির সত্তরটির মতো। নানা সম্প্রদায়ের অন্য-ধর্মীদের পীঠস্থান সেগুলি।

শহর থেকে অল্প কিছু দক্ষিণে একটি সংঘারাম আছে। রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপও রয়েছে তার কাছে। নাগার্জুন বোধিসত্ত্ব এ সংঘারামে থাকতেন। সে সময়ে এখানকার রাজা ছিলেন সদবহ (সাতবাহন)। রাজা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। দেব বোধিসত্ত্ব এই নাগার্জুনের শিষ্য। নাগার্জুন রসায়ন বিদ্যাতেও সুদক্ষ ছিলেন।

দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে তিনশো লি মতো গেলে ব্রহ্মগিরি পর্বতের দেখা মিলবে। এ পর্বতের একক চূড়াটি এ অঞ্চলের সব পাহাড়কে ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুলেছে। এই ভাব-গম্ভীরময় নিরেট পাহাড়টি হঠাৎ যেন এর খাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, মাঝে কি আশেপাশে কোন উপত্যকা নেই। নাগার্জুন বোধিসত্ত্বের জন্য রাজা সাতবাহন এই পাহাড়ের মাঝ বরাবর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একটি সংঘারাম বানিয়ে দিয়েছেন। প্রায় দশ লি মতন সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সেই ঢাকা পথ দিয়ে এর মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা বানান হয়েছে। কোন্ পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে তা জানা না থাকায় আমরা পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে তার সারা গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্য দেখতে

থাকলাম। ছাদে ঢাকা চলাচলের বারান্দাসহ পাঁচতলা উঁচু সৌধ। উপরে উঁচু উঁচু গম্বুজ। প্রত্যেকটি তলাতেই বিহারসহ চারটি ক'রে মহাকক্ষ। প্রত্যেকটি বিহারেই একটি ক'রে সোনার বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে। প্রত্যেকটিই স্বাভাবিক মানুষের আকারের। অপূর্ব তার শিল্প সুষমা, সোনা ও মূল্যবান রত্নাদি দিয়ে অপরূপ ভাবে সাজানো। পাহাড়ের উঁচু চূড়াটি থেকে কয়েকটি ঝরনাধারা নেমে এসেছে জলপ্রপাতের মতো হয়ে। বয়ে চলেছে তার জলধারা সৌধটির প্রত্যেকটি তলাকে ঘিরে তার ধার-বারান্দাগুলি দিয়ে। এদিক ওদিক তৈরী ফোকরগুলি দিয়ে ঢুকছে সৌধের ভেতরে আলো।

॥ ৫৫ ॥ 'অন-ত-লো' বা অন্ধ্র

কোশল পিছনে ফেলে এক বিরাট অরণ্যের মধ্য দিয়ে আমরা অন-ত-লো বা অন্ধ্র রাজ্যের দিকে এগিয়ে চললাম। প্রায় ৯০০ লি পথ চলার পর সেখানে এলাম।

তিন হাজার লি এ রাজ্যটির আয়তন। ২০ লি হলো রাজধানীর পরিধি। এ শহরটির নাম পিঙ-কি-লো (বিঙ্গিল ?=সম্ভবত বেঙ্গি)।

এখানকার জমি সরস ও উর্বরা। নিয়মিতভাবে চাষ আবাদের কাজ হয়। খাদ্য-শস্যের ফলন বেশ প্রচুর। আবহাওয়া গরম, লোকজন উগ্র ও তাড়না-প্রবণ।

এ এলাকার ভাষা ও বাক্যবিন্যাস মধ্যভারত থেকে ভিন্ন ধরনের। বর্ণমালার চেহারা সেখানকার সঙ্গে প্রায় এক।

কুড়িটির মতন সংঘারাম আছে। ভিক্ষু থাকেন সেখানে তিন হাজারের মতো। দেবমন্দির তিরিশটি। অগুণতি বিধর্মী সেখানে বাস ক'রে থাকেন।

শহর থেকে একটুখানি দূরে একটি বিরাট সংঘারাম রয়েছে। এর একাধিক তলবিশিষ্ট গম্বুজগুলি ও ঝুল-বারান্দাগুলি সুন্দর কারুকাজ ও অলংকার করা। এখানে অনুপম শিল্প-সুষমামণ্ডিত একটি বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে। সংঘারামের সামনে কয়েক শো ফুট উঁচু একটি পাথরের স্তূপ রয়েছে। এর সব কটিই অর্হৎ ও-চে-লো (অচল) এর তৈরী।

এখান থেকে একটুখানি দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে গেলে রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপের দেখা পাওয়া যাবে।

কুড়ি লি মতো দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে গেলে একটি নির্জন পাহাড়ের উপর একটি স্তূপ চোখে পড়বে। এখানে জিন বোধিসত্ত্ব ইন-মিঙ-লুন (ন্যায়দ্বার তারক-শাস্ত্র বা হেতু বিদ্যা শাস্ত্র ?) রচনা করেন।

॥ ৫৬ ॥ 'তো-ন-কিএ-ৎসে-কিঅ' বা ধনকন্টক

এখান থেকে এবার নির্জন বনানীর বুক চিরে দক্ষিণদিকে 'তো-ন-কিএ-ৎসে-কিঅ'

বা ধনকণ্টক চললাম। হাজার লির মতো পথ চলার পর সেখানে পেঁাছলাম।

এ রাজ্যটি আয়তনে ছয় হাজার লি খানেক হবে। রাজধানীর ঘেরও ৪০ লির কাছাকাছি। মাটি সরস ও উর্বরা। চাষ আবাদের কাজ নিয়মিতভাবে করা হয়। ফসলের ফলন বেশ ভালোই। দেশের বেশির ভাগ জায়গাই বসতি বর্জিত। শহরগুলির লোক সংখ্যাও ভয়ানক কম। আবহাওয়া গরম। লোকদের গায়ের রঙ হলদেটে-কালচে। স্বভাবের দিক থেকে উগ্র ও তাড়না-প্রবণ। জ্ঞানের প্রতি আপার শ্রদ্ধা রয়েছে।

অসংখ্য সংঘারাম এ রাজ্যটিতে। তবে সবই প্রায় জন-বর্জিত ভাঙা চোরা। যে কটিকে এখনো টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের সংখ্যা কুড়িটির মতো হবে। হাজারখানেক ভিক্ষু সেখানে থাকেন। সকলেই মহাযানের অনুরক্ত। শ'খানেক দেবমন্দির আছে। নানান সম্প্রদায়ের অগুণতি বিধর্মী সেখানে থাকেন।

রাজধানী থেকে পূবে, পাহাড়ের গোড়ায় পূর্বশীল নামে একটি সংঘারাম আছে। পশ্চিমদিকেও পাহাড় কোলে আবরশীল নামের সংঘারামটি রয়েছে। আগেকার এক রাজা এগুলি ক'রে দিয়েছিলেন। এখন এদু'টিতে কেউই থাকে না।

শহরের দক্ষিণে অল্প কিছুটা হাঁটলে একটি বড়ো পাহাড়ী গুহার দেখা মিলবে। মৈত্রেয় বোধিসত্বের অপেক্ষায় শাস্ত্রবেত্তা ভাববিবেক এখানে এক গোপন অসুরপুরীতে বাস ক'রে চলেছেন। এই বিখ্যাত পণ্ডিত বাইরে সাংখ্যকার কপিলের অনুগামী হলেও মূলতঃ নাগার্জুনের মতবাদের অনুরক্ত।

॥ ৫৭ ॥ 'চু-লি-য়ে' চুল্য বা চোল দেশ

ধনকণ্টক পিছনে ফেলে এগোতে থাকলাম। এবার আমাদের লক্ষ্য চু-লি-য়ে বা চোল রাজ্য। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে হাজারখানেক লি পথ ভাঙার পর থামলাম এসে চোলিতে।

২৪০০ থেকে ২৫০০ লি আয়তনের এ রাজ্যটির রাজধানী শহরটি মাত্র দশ লি খানেক এলাকা জুড়ে।

বেশির ভাগ অঞ্চলেই জনমানব নেই, বুনো জন্তু জানোয়ারের বাসভূমি। পর পর জলাভূমি আর ঘন বনজঙ্গল। লোকসংখ্যা খুব কম। লুটেরা-ডাকাতের দল সবার চোখের সামনে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবহাওয়া গরম ঠেকলো। লোকজনের ব্যবহারও নিষ্ঠুর, মায়া-মমতাহীন। স্বভাব সহজাতভাবেই উগ্র। বিরোধী ধর্মমতের প্রতিই এদের অনুরক্তি।

এই এলাকার সংঘারামগুলি যেমন ভাঙাচোরা আর আবর্জনায় ভরা ভিক্ষুরাও তেমনি নোংরা। বেশ কিছু (কয়েক দশ) দেবমন্দির আছে। নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীর সংখ্যাই সব থেকে বেশি।

শহর থেকে কিছুটা দক্ষিণ-পূবে গেলে রাজা অশোকের গড়া একটি স্তূপ চোখে পড়বে। শহর থেকে পশ্চিমদিকে দেখা যাবে একটি পুরানো সংঘারাম। দেব বোধিসত্ত্ব এখানে অর্হৎ উত্তরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

॥ ৫৮ ॥ 'ত-লো-পি-চো' বা দ্রাবিড়

চোল রাজ্য থেকে এবার আমরা আরো দক্ষিণে চললাম। হিংস্র জন্তু জানোয়ার ভরা এক বিরাট অরণ্য প্রদেশের মধ্য দিয়ে পথ চলতে থাকলাম। ১৫০০ থেকে ১৬০০ লি পার হবার পর এলাম 'ত-লো-পি-চ' বা দ্রাবিড় রাজ্যে।

দেশটির আয়তন ছয় হাজার লির বেশি হবে না। রাজধানী শহরের নাম কাঞ্চী-পুর। তিরিশ লি মতন এলাকা জুড়ে শহরটি।

এখানকার মাটি উর্বরা। চাষ আবাদের কাজও ভালোই চলে। শস্যের ফলনও বেশ ভালো হয়। ফুল ফলের কোন অভাব নেই, অফুরান রয়েছে। দামী দামী রত্ন ও অন্যান্য জিনিসও এখানে পাওয়া যায়।

আবহাওয়া গরম বলেই মনে হলো। লোকজন দেখলাম সাহসী। সততা ও সত্য ভাষণের দিকে গভীর অনুরাগ রয়েছে। জ্ঞান চর্চার দিকে অপার অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। এখানকার ভাষা ও বর্ণমালা মধ্য ভারতের তুলনায় ভিন্ন হলেও এই ভিন্নতা খুবই সামান্য।

কয়েকশো সংঘারাম আছে এখানে। ভিক্ষুর সংখ্যাও দশ হাজার খানেক। সকলেই মহাযান শাখার স্থবির মতধারার অনুগামী। দেবমন্দির আশিটির মতো। নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীই বেশি।

তথাগত এদেশে প্রায়ই আসতেন ও ধর্মপ্রচার করে বেড়াতেন। এজন্য রাজা অশোক এখানে বুদ্ধদেবের স্মৃতি বিজড়িত জায়গাগুলিতে অনেকগুলি স্তূপ বানিয়ে গেছেন।

কাঞ্চীপুর ধর্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান। তিনি ছিলেন এ রাজ্যের এক মন্ত্রীর বড়ো ছেলে।

শহর ছেড়ে খানিক দূরে এগোলে দক্ষিণদিকে একটি বড়ো সংঘারাম দেখা যাবে। এখানে অশোক রাজার তৈরী একশো ফুটের মতো একটি উঁচু স্তূপ রয়েছে।

॥ ৫৯ ॥ 'মো-লো-কিউ-চ' বা মালকূট

এবার আরো দক্ষিণদিকে এগিয়ে চললাম। দীর্ঘ তিন হাজার লি পথ পেরিয়ে এলাম অবশেষে 'মো-লো-কিউ-চ' বা মালকূট।

রাজ্যটির আয়তন পাঁচ হাজার লির কাছাকাছি। রাজধানীর শহরটি গড়ে উঠেছে প্রায় ৪০ লি এলাকা জুড়ে। এখানকার মাটি নোনা। শস্যের ফলন তাই ততো বেশি

নয়। পড়শী দ্বীপগুলিতে যে সব মূল্যবান জিনিষপত্র পাওয়া যায় সেগুলি এখানে আনা ও বাছাই করা হয়।

আবহাওয়া বেজায় গরম। মানুষজন বেজায় কালো। স্বভাবের দিক থেকে তারা দৃঢ়চেতা ও গোঁয়ার। বৌদ্ধধর্মী ও অন্যধর্মী দুই-ই রয়েছে তাদের মধ্যে। লেখাপড়া ও জ্ঞান চর্চার দিকে তেমন কোন অনুরাগ নেই। ব্যবসায়িক লাভ লোকসান নিয়েই মেতে আছে।

অনেক পুরানো সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তাদের দেয়ালগুলিই যা একটু খাড়া রয়েছে এখনো। ভিক্ষুর সংখ্যা খুবই অল্প। বেশ কয়েকশো দেবমন্দির আছে। বিধর্মী অনুগামীদের সংখ্যাও অগুণতি। বেশির ভাগই নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের।

শহর থেকে খানিক দূর গেলে পূবদিকে একটি পুরানো সংঘারাম চোখে পড়বে। তার পথ ও প্রাঙ্গণ বুনো গাছপালার জঙ্গলে ঢাকা, শুধু যা ভিত দেয়ালগুলিই কোন মতে এখনো খাড়া রয়েছে। রাজা অশোকের ছোট ভাই মহেন্দ্র এটি বানিয়েছিলেন।

এর পূবে একটি স্তূপ নজরে এলো। তার প্রায় সবটাই মাটিতে বসে গেছে। কেবল চূড়ার দিকটি মাটির উপরে রয়েছে। রাজা অশোক এটি গড়েন।

রাজ্যের দক্ষিণদিকে, সাগরকূলে, মলয় পর্বতমালা। বিরাট উঁচু উঁচু চূড়া, খাড়া খাড়া পাহাড়, গভীর উপত্যকা আর গিরি-ঝরনার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে শ্বেত চন্দন ও চন্দনিভ গাছ জন্মায়। দুটি গাছই একরকম দেখতে। প্রখর গরমকালে পাহাড়ের উপর গিয়ে এ দু'টোর পার্থক্য কষা সম্ভব। তখন দূর থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বড়ো বড়ো সাপ চন্দন গাছের পা জড়িয়ে পাক খেয়ে পড়ে আছে। এই গাছের গা খুব ঠান্ডা বলে সাপেরা ঐভাবে পাক খেয়ে পড়ে থাকে। এভাবে মূল চন্দন গাছ চিনবার পর দূর থেকে গাছের গায়ে তীর বিঁধিয়ে গাছটিকে চিহ্নিত ক'রে রাখা হয়। শীতকালে সাপ যখন আর থাকে না তখন গিয়ে গাছ কেটে ফেলা হয়।

এ অঞ্চলে কর্পূরও মেলে। কর্পূর গাছের গুঁড়ি দেখতে পাইন গাছের মতোই, তবে পাতা, ফুল ও ফল দেখতে আলাদা রকমের। যখন গাছ কেটে ফেলা হয় ও রসালো অবস্থায় থাকে তখন কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। কাঠ শুকিয়ে গেলেই তার মধ্যে শিরার মতো দেখা দেয় ও ফেটে ফেটে যায়। তখন এর মধ্যে অভ্রের মতো স্বচ্ছ জমাট বরফ রঙের কর্পূরের দেখা মেলে।

মলয় পর্বতমালার পূবদিকে পোতলক পর্বত। এর গিরিপথগুলি ভয়ঙ্কর বিপদ-ভরা। পাহাড়ের পাশগুলি ভীষণ খাড়া, উপত্যকাগুলি দারুণ উঁচু নিচু এবড়ো খেবড়ো। পাহাড়ের উপরে একটি হ্রদ রয়েছে। জল আয়নার মতো স্বচ্ছ। একটি খাদ থেকে

একটি বড়ো নদী নেমে এসেছে। নদীটি নামার পথে পাহাড়টিকে কুড়িবার পাক খেয়ে নেমে এসেছে ও শেষমেশ দক্ষিণ সাগরে গিয়ে মিশেছে। হ্রদের পাশে দেবতাদের একটি পাথর-প্রাসাদ রয়েছে।

এই পাহাড় থেকে উত্তর-পূব মুখো গেলে সাগর পাড়ে একটি শহরের দেখা পাওয়া যাবে। এখান থেকেই সাধারণতঃ দক্ষিণ-সাগর ও সিংহল যাত্রা করা হয়। এখানকার লোকেরা বলে থাকে যে এই বন্দর থেকে জাহাজে চড়লে ও তিন হাজার লি মতো দক্ষিণ-পূবে গেলে সিংহল পেঁছান যায়।

॥ ৬০ ॥ সিংহল

সিংহল রাজ্যটি সাত হাজার লি আয়তনের। রাজধানীর পরিধি ৪০ লি মত হবে। আবহাওয়া গরম। মাটি উর্বর ও সরস থাকায় চাষ আবাদও ঠিক মতো হয়ে চলেছে। ফুল আর ফলও অপর্যাপ্ত হয়। জনসংখ্যাও অনেক। প্রত্যেকটি পরিবারই তার বিষয় সম্পত্তি থেকে ভালো রোজগার করে।

এখানকার লোকেরা ছোটোখাটো চেহারার। গায়ের রঙ কালো। স্বভাবে উগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞান চর্চার দিকে এদের আকর্ষণ রয়েছে, সদগুণাবলীকে সম্মান করে। ধর্মীয় ঐশ্বর্যকে তারা গভীর শ্রদ্ধা করে; ধর্মাচরণ ও পুণ্য অর্জনের দিকে যথেষ্ট চেষ্টা রয়েছে।

এ দেশকে আদিতে রত্নদীপ বলা হতো। এখানে দামী দামী রত্ন পাওয়া যায় বলেই এ নাম। পুরাকালে এটি রাক্ষসের আবাস ছিল।

এ রাজ্যের লোকেরা আগে নীতিশূন্য ধর্মীয় পূজো অর্চ্চনার প্রতি আসক্ত ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর একশো বছর পর রাজা অশোকের ছোট ভাই মহেন্দ্র এখানে বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। সেই থেকে এখানকার লোক বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এখানে প্রায় একশোটির মতো সংঘারাম গড়ে ওঠে ও সেখানে কুড়ি হাজারের কাছাকাছি ভিক্ষু বসবাস করতে থাকেন। এঁরা প্রধানতঃ মহাযান শাখার স্থবির মতবাদের অনুগামী। এর দু'শো বছর পর তাঁরা দু'টি শাখায় ভাগ হয়ে যান। একদল 'মহাবিহার বাসী'—যাঁরা মহাযানের বিরোধী ও হীনযানের অনুগামী। অন্যদল—'অভয় গিরি বাসী'—যাঁরা উভয় যানেরই চর্চা করে থাকেন। এঁরা বিভিন্ন মতবাদের ত্রি-পিটকের নির্দেশগুলিকে একাকার ক'রে ফেলেছেন। এই মতবাদপন্থী ভিক্ষুরা নৈতিক নিয়মগুলিকে বিশেষভাবে মেনে চলতেন। উপলব্ধি ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার জন্য তাঁরা বিশিষ্টতা অর্জন ক'রেছিলেন। তাঁদের নির্ভুল আচরণ ও চালচলন পরবর্তী কালের কাছে আদর্শ স্বরূপ হয়ে উঠেছিল।

রাজার প্রাসাদের কাছেই বুদ্ধদেবের দন্ত বিহার। এটি কয়েকশো ফুট উঁচু, নানা

রকম দুর্লভ রত্ন দিয়ে অলংকৃত। বিহারের উপরে একটি খাড়া দণ্ড রয়েছে। তার মাথায় একটি পদ্মরাগ মণি বসানো আছে। এ থেকে সব সময়ে উজ্জ্বল জ্যোতি খেলে চলেছে। কি দিন কি রাত সব সময়েই সে আলো দূরে থেকে চোখে পড়ে, তখন একে একটি নক্ষত্রের আলো বলে মনে হয়। রাজা প্রতিদিন বুদ্ধের তিনবার দাঁতটিকে সুগন্ধি জল দিয়ে ধোয়া মোছা করেন, কখনো বা সুগন্ধি চূর্ণ দিয়ে মাজেন।

একে বর্তমানে সি-লন-শান বা সিলনগিরি বলা হয়। কিন্তু আগে সিংহল বলা হতো।

এখানকার বর্তমান রাজা অ-লি-ফুন-নই-'রহ (অলিবুনর ?) সোলি (চোল) দেশের লোক। সে গভীরভাবে ভিন্ন ধর্মের অনুরাগী, বুদ্ধের ধর্মের প্রতি তার কোন রকম অনুরাগ নেই। সে যেমন ক্রুর তেমনি স্বেচ্ছাচারী। যা কিছু ভালো মহৎ, সে তারই বিরোধী। দেশের লোকেরা এ সত্ত্বেও এখনো বুদ্ধের দাঁতের প্রতি সম্মান দেখায়।

দন্ত বিহারের কাছেই একটি ছোট বিহার আছে। এটিও নানারকম মূল্যবান রত্ন দিয়ে অলংকৃত। এখানে বুদ্ধের একটি সোনার প্রতিমা রয়েছে। মূর্তিটি স্বাভাবিক মানুষের আকারের। এ দেশের একজন পুরানো রাজা এটি গড়ে গেছেন। পরে তিনি শিরোভূষণটিকে রত্ন খচিত করেন।

রাজপ্রাসাদের পাশেই একটি রন্ধনশালা রয়েছে। রোজ এখান থেকে আগে আট হাজার ভিক্ষুকে খাদ্য দেয়া হতো। ইদানিং দশ বছর খানেক ধরে এ দেশে বিশেষ বিশৃঙ্খলা চলেছে, কোন সুপ্রতিষ্ঠিত রাজা নেই এদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য।

দেশের উপকূলে একটি উপসাগরের দরুন এই রাজ্যটি দামী রত্নাদি ও মূল্যবান পাথরের দিক থেকে ধনী। রাজা নিজে সেখানে ধর্মানুষ্ঠান করেন, এর ফলে আত্মীয়রা তাঁকে নানারকম দুর্লভ ও মূল্যবান বস্তু উপহার দেয়। দেশের অধিবাসীরাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। যে যার ধর্মীয় সুকৃতি অনুসারে ফল লাভ করে। যে যা পায় তার নির্দিষ্ট এক ভাগ রাজাকে কর দেয়।

রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বদিকে লংকা পর্বত।

এখান থেকে সমুদ্র পার হয়ে আরো দক্ষিণে গেলে কয়েক হাজার লি পর ন-লো-কি-লো বা নরকির দ্বীপ পড়বে। সেখানকার লোকেরা ছোটোখাটো মাত্র তিন ফুট লম্বা। তাদের দেহ মানুষের মতো হলেও পাখির মতো চঞ্চু রয়েছে। তারা কোন শস্য ফলায় না, কেবল নারিকেলের উপর বেঁচে থাকে।

॥ ৬১ ॥ কঙ-কিন-নো-পু-লো বা কঙ্কনাপুর

দ্রাবিড় রাজ্য পেছনে ফেলে উত্তরদিকে এগিয়ে চলে আমরা এক জন্তু জানোয়ার

ভরা অরণ্যের দেখা পাই। এখানে পর পর মানব বর্জিত কতক শহর রয়েছে, বরং এদের শহর না বলে গ্রাম বলাই ঠিক হবে। ডাকাত লুটেরার দল এখানে দল বেঁধে পর্যটকদের উপর হামলা চালায়। জখম করে, অনেক সময় বন্দীও ক'রে রাখে। এই পথ ধরে দু'হাজার লি মতো যাবার পর আমরা কঙ-কিন-নো-পু-লো বা কঙ্কনাপুরের দেখা পেলাম।

এ দেশটি আয়তনে পাঁচ হাজার লির কাছাকাছি। রাজধানী তিরিশ লি মতো জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে। মাটি রসালো ও উর্বরা। নিয়মিত চাষের কাজ চালিয়ে যথেষ্ট ফসল ফলাচ্ছে। আবহাওয়া খর, গরমের বেশ দাপট।

এখানকার লোকজনেরা বেশ উৎসাহী ও চটপটে স্বভাবের। রঙ তাদের কালো। মেজাজ উগ্র, চালচলন অমার্জিত। জ্ঞান চর্চার দিকে ঝোঁক রয়েছে, সদগুণাবলী ও প্রতিভার কদর করে।

একশোটির মতো সংঘারাম আছে। দশ হাজার খানেক ভিক্ষু সেখানে থাকেন। মহাযান ও হীনযান দু'য়েরই চর্চা করেন। দেবতাদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। কয়েকশো দেবমন্দির বর্তমান। নানা সম্প্রদায়ের বিধর্মীদের পীঠস্থান এগুলি।

রাজপ্রাসাদের পাশেই একটি বড়ো সংঘারাম দেখলাম। শ'তিনেক ভিক্ষু থাকেন। প্রত্যেকেই বিশিষ্ট লোক। একশো ফুটের বেশি উঁচু বিরাট একটি বিহার রয়েছে। রাজকুমার সর্বার্থসিদ্ধের (সিদ্ধার্থ) একটি মূল্যবান উষ্ণীষ বা মুকুট আছে এখানে। এটি উচ্চতায় দু'ফুটের কিছু কম, নানা দামী রত্ন পাথর দিয়ে অলংকৃত করা। একটি রত্ন খচিত আধারে একে রাখা হয়। এটি অর্হৎ শ্রুতবিংশতি কোটির শিল্পকর্ম।

নগরীর উত্তরদিকে একটুখানি গেলেই ৩০ লি এলাকা জুড়ে একটি তালবন। গাছের পাতাগুলি লম্বা ও চওড়া। রঙ চকচকে উজ্জ্বল। ভারতের সব রাজ্যেই লেখার জন্য এই পাতা ব্যবহার করা হয়। এই বনের মধ্যেই একটি স্তূপ দেখলাম।

শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে কিছুটা গেলেই একশো ফুট মতো উঁচু একটি স্তূপ দেখা যাবে। এটি অশোক রাজার গড়া। এর পাশেই একটি সংঘারামের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। শুধু ভিতটুকুই যা বর্তমান।

শহরের পূর্বদিকেও একটি স্তূপ আছে। ফুট তিরিশেক ছাড়া বাকী অংশ মাটিতে বসে আছে।

॥ ৬২ ॥ 'মো-হো-লো-চ' বা মহারাষ্ট্র

কঙ্কনাপুরের সীমানা ছেড়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চললাম। এক বিরাট অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলেছি। হিংস্র জন্তু জানোয়ার, ডাকাত ও লুটেরার দল সুযোগ

পেলেই পর্যটকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পদে পদে জখম হবার, প্রাণ খোয়াবার ভয়। এ পথ ধরে ২৪০০ থেকে ২৫০০ লি যাবার পর দেখা পেলাম মো-হো-লো-চ বা মহারাষ্ট্র রাজ্যের।

রাজ্যটির আয়তন পাঁচ হাজার লি মতন। এক বড়ো নদীর পশ্চিম পাড়ে ৩০ লি খানেক এলাকা জুড়ে রাজধানী শহরটি গড়ে উঠেছে।

এখানকার মাটি সরস ও উর্বরা। নিয়মিত চাষ আবাদ চলছে। ফসলের ফলন খুবই ভালো। আবহাওয়ায় গরমের দাপট। লোকজন সৎ ও সরল স্বভাবের। শরীরের গড়ন বেশ লম্বা চওড়া। একগুঁয়ে ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। কেউ কোন উপকার করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করে। শত্রুদের উপর কোনরকম মায়া-মমতা দেখায় না। কেউ অপমান করলে, তার শোধ তুলবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছপা হয় না। যদি কেউ দুর্দশা, দুর্বিপাকে প'ড়ে কোন সাহায্য চায়, নিজেদের ব্যস্ততার ঠেলায় তাকে সাহায্য করতেই ভুলে যাবে। কারো উপরে প্রতিশোধ নেবার আগে তারা শত্রু-পক্ষকে হুঁশিয়ার ক'রে দেবে, তারপর উভয়ে বর্শা হাতে নিয়ে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যখন কেউ পালাবার চেষ্টা করে অন্যজন পিছু পিছু ধাওয়া করে, তবে যে লোক নতিস্বীকার ক'রে আত্মসমর্পণ করে তাকে কখনো তারা হত্যা করে না।

কোন সেনাপতি যুদ্ধে হেরে গেলে তারা তাকে কোন শাস্তি দেয় না। পরিবর্তে, তাকে মেয়েদের কাপড় উপহার পাঠায়। এর ফলে, (অপমানিত হয়ে) সে নিজেই মৃত্যুবরণ ক'রে নেয়। এ রাজ্যে কয়েকশো লোক নিয়ে গড়া একটি সংসপ্তক সেনাবাহিনী রয়েছে। প্রত্যেকবার যুদ্ধযাত্রার আগে তারা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নেয়। তারপর বর্শা হাতে একদল লোক দশ হাজারের মুখোমুখি হয় ও যুদ্ধের আহ্বান জানায়। যদি এই 'সংসপ্তক' সেনারা কোন লোককে অকারণেও মেরে ফেলে, দেশের আইন তাদের কোন শাস্তি দেয় না। যখনই তারা বাইরে বের হয়, তারা তাদের আগে আগে ভেরী বাজিয়ে চলে। এছাড়া তারা শয়ে শয়ে হাতিকে মাতাল ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যায়। নিজেরাও মদ খেয়ে নেয়। তারপর একত্র হয়ে হাতি ও মানুষে মিলে সামনে যা কিছু পায় দলিয়ে মাড়িয়ে ধ্বংস ক'রে চলে। ফলে কোন শত্রুদলই এদের সামনে তিষ্ঠোতে পারে না।

এই সব লোক ও হাতি নিজের মুঠোয় থাকার জন্য রাজা তার পড়শীদের সঙ্গে তাচ্ছিল্যকর ব্যবহার করেন। তিনি ক্ষত্রিয় বর্ণের লোক। নাম তাঁর পুলকেশি। তাঁর কল্যাণকর কাজসমূহের সুফল ও প্রভাব বিরাট এলাকা জুড়ে অনুভূত হয়। তাঁর প্রজারা তাঁকে গভীরভাবে মেনে চলে। অধুনা শীলাদিত্য মহারাজা পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সব জাতিকে জয় করে নিয়েছেন। দেশের অতিসুদূর প্রান্তেও তাঁর প্রতিপত্তি

রয়েছে। কিন্তু একমাত্র এই রাজ্যের লোকেরাই তাঁর অধীনতা মেনে নেয়নি। তিনি পঞ্চ-সিন্ধুর সব অঞ্চল থেকে সৈন্য সমবেত ক'রে, সব দেশ থেকে সেরা নায়কদের বেছে নিয়ে, নিজেই তাঁদের নিয়ে এদের জয় করার জন্য এসেছিলেন। তবুও তিনি এদের সৈন্যদের জয় করতে পারেননি।

স্বভাবের দিক থেকে এরা বিদ্যানুরাগী। বৌদ্ধ ও অন্য ধর্ম দু'য়েরই চর্চা করে। একশোটির মতো সংঘারাম আছে এখানে। পাঁচ হাজারের মতো ভিক্ষুও আছেন। মহাযান ও হীনযান উভয়কেই অনুসরণ করেন তাঁরা। দেবমন্দির একশোর কাছাকাছি। সেখানে সব সম্প্রদায়ের বিধর্মীরাই থাকেন।

রাজধানীর ভিতরে ও বাইরে বুদ্ধদেবের স্মৃতি বিজড়িত ৫টি স্থানে পাঁচটি স্তূপ আছে। সব ক'টিই রাজা অশোক গড়েছেন। এছাড়া ইট ও পাথরে গড়া আরো এতো স্তূপ রয়েছে যে সবগুলির বিবরণ দেয়া অসম্ভব।

শহরের দক্ষিণে অল্প খানিকটা গেলেই একটি সংঘারাম চোখে পড়বে। এখানে চাওয়ান-ৎঝে-ৎসই বোধিসত্ত্বের একটি পাথরমূর্তি আছে।

রাজ্যের পূব সীমান্তে একটি দুরারোহ পর্বতমালা আছে। এর মাঝে, এক অন্ধকার উপত্যকায় একটি সংঘারাম গড়া হয়েছে। এর বিশাল মহাকক্ষগুলি ও তার বারান্দাগুলি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রতিটি তলের পিছন দিকে বন্ধুর পর্বত, সামনে উপত্যকা।

এই সংঘারামটি অর্হৎ আচার (o-che-lo) বানিয়েছেন, ইনি পশ্চিম ভারতীয় ছিলেন।

এর বিহারটি একশো ফুটের মতো উঁচু। মাঝে ৭০ ফুট খানেক লম্বা একটি বুদ্ধ-মূর্তি রয়েছে। তার ওপর সাত ধাপ যুক্ত পাথরের ছত্র। কোন রকম অবলম্বন ছাড়াই সেগুলি উপরে উঠে গেছে। প্রত্যেকটি ছত্রের মধ্যে তিন ফুটের মতো ব্যবধান।

বিহারের চারপাশেই পাথরের দেয়ালগুলিতে বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের নানা ঘটনা চিত্রিত রয়েছে। বুদ্ধত্ব অর্জনের আগে তিনি যেসব শুভসংকেত দর্শন করেন তার চিত্র ও তাঁর নির্বাণ ঘটনা সহ তাঁর জীবনের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ঘটনাবলীর চিত্রও এখানে রয়েছে।

এই দৃশ্যগুলি অতি নিপুণ ও নিখুঁত ভাবে রূপায়িত করা হয়েছে। সংঘারামের বাইরের ফটকে, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে, ডাইনে ও বাঁয়ে দুটি পাথরের হাতি আছে। প্রাচীন কালে জিন বোধিসত্ত্ব প্রায়ই এই সংঘারামটিতে আসতেন।

॥ ৬৩ ॥ 'পো-লু-কিএ-চে-পো' বা ভরুকচ্ছেব

এবার আমরা পশ্চিম দিকে এগিয়ে চললাম। প্রায় হাজার লি পথ চলার পর নর্মদা নদী পার হয়ে পেঁছালাম এসে পো-লু-কিএ-চে-পো বা ভরুকচ্ছেব (ভরুকচ্ছ)।

রাজ্যটি ২৪ শত থেকে ২৫ শত লি এলাকা জুড়ে। রাজধানী ২০ লি মতন। এখানকার মাটি নোনা। গাছপালা লতাগুল্ম অন্যান্য অঞ্চলের মতো অত বেশি নজরে পড়ে না। অল্প স্বল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এরা সাগরের জল জ্বাল দিয়ে নুন বানায়। সমুদ্রই এদের একমাত্র অবলম্বন, যা কিছু সম্পদ আর রোজগারের পথ। আবহাওয়া গরম। সব সময়েই ঘূর্ণি ঝড় আর বাতাসের দাপট।

লোকজনের ধরন ধারণ কেমন যেন হিম আর নির্বিকার। স্বভাব-চরিত্র কুটিল ও বিকৃত। এদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা নেই। সত্যমার্গী ও বিপথমার্গী দুই মতের লোকই রয়েছে।

রাজ্যটিতে দশটির মতো সংঘারাম আছে। শ'তিনেক ভিক্ষু সেখানে। এরা মহাযানের উপাসক। স্থবির শাখার অনুগামী। দেবমন্দির গুটি দশেক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপথ মার্গীরা সেখানে থাকে।

॥ ৬৪ ॥ 'মো-ল-প' বা মালব

ভরুকচ্ছেব পিছনে ফেলে উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে চলতে থাকলাম। প্রায় দু'হাজার লি পথ ভাঙার পর মো-ল-প বা মালব দেশের দেখা মিললো।

দেশটি দু'হাজার লি এলাকা জুড়ে। তিরিশ লি রাজধানীর আয়তন। এর দক্ষিণ ও পুব সীমা দিয়ে মহানদী বয়ে চলেছে। জমি সরস ও উর্বরা, এজন্য ফসলের ফলন অপর্যাপ্ত। লতাগুল্ম গাছপালার সীমা সংখ্যা নেই, ফল ও ফুল অফুরান। শীতে গম বোনার পক্ষে এ জমি বিশেষ উপযোগী। এরা বেশির ভাগই মচমচে রুটি ও ভাজা শস্য চূর্ণ বা তা দিয়ে তৈরী খাবার খায়।

লোকজন বেশ সদ্গুণ সম্পন্ন নরম স্বভাবের। বুদ্ধির প্রখরতা বিশেষ লক্ষ্য করার মতো। এদের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও পরিস্কার। বিদ্যাবত্তা বেশ গভীর ও ব্যাপক।

বিদ্যা ও জ্ঞানের পীঠরূপে ভারতের দুই প্রান্তের দু'টি দেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে মালব আর উত্তর-পুবে মগধ। এরা সদ্গুণাবলীর কদর করে, সভ্য-ভব্য আচরণের সম্মান করতে জানে। মন বুদ্ধিদীপ্ত, আর অপার প্রচেষ্টাশীল। এ সব সত্ত্বেও এরা মিথ্যা ধর্মে বিশ্বাসী। বৌদ্ধ ধর্মীও রয়েছে। দুই সম্প্রদায় মিলেমিশে বাস করে।

একশোটির মতো সংঘারাম আছে এখানে। দু'হাজারের কাছাকাছি ভিক্ষু সেখানে।

হীনযানের সম্মতীয় শাখার উপাসক সবাই। নানাধরনের দেবমন্দির শ'খানেক রয়েছে। অসংখ্য বিধর্মী উপাসক সেখানে। তবে, পাশুপতদের সংখ্যাই বেশি।

এরাজ্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে এখন থেকে ৬০ বছর আগে এখানে শীলাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন। জ্ঞানী ও বিদ্বানরূপে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। ছিল উ'চুদরের সাহিত্য প্রতিভাও। চতুর্বিধ প্রাণীকে সযত্নে লালনপালন করতেন, গভীর শ্রদ্ধা করতেন ত্রিরত্নকে। সারা জীবনে কেউ তাঁকে কখনো এতটুকু রাগ করতে দেখেনি, কোন প্রাণীর বিন্দুমাত্র ক্ষতি বা আঘাত করতে দেখেনি কখনো। যাতে কোন প্রাণী হত্যা না হয় এ জন্য তিনি তাঁর হাতি ও ঘোড়াদের ছাঁকনী দিয়ে ছে'কে তারপর জল খেতে দিতেন। তাঁর পঞ্চাশ বছর রাজত্বকালে বন্য পশুদের সঙ্গেও মানুষের প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। কোন লোক তাদের কোন ক্ষতি করতো না, তাদের হত্যা করতো না।

শীলাদিত্য তাঁর প্রাসাদের পাশেই একটি বিহার তৈরী করান। এটিকে সবরকম শিল্পকলায় সুষমামণ্ডিত করা হয়েছে। এখানে তিনি সপ্ত বুদ্ধের প্রতিমা গড়ে বসিয়েছেন। প্রতি বছর তিনি দেশের চারিদিক থেকে ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ ক'রে এনে 'মোক্ষ মহাপরিষদ' সম্মেলন বসাতেন। তাদের দানধ্যান করতেন। এ প্রথা এখনো এখানে চলিত রয়েছে।

রাজধানী থেকে উত্তর-পশ্চিমে ২০০ লি মতো গেলে ব্রাহ্মণদের একটি শহর (বা ব্রাহ্মণপুর-এর) দেখা পাওয়া যাবে। এর কাছে একটি গভীর খাদ আছে। তার পাশেই রয়েছে ছোট্ট একটি স্তূপ।

॥ ৬৫ ॥ 'ও-চ-লি' বা অটলি

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যেতে যেতে এক উপসাগর কূলের দেখা পেলাম। সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে চললাম এবার। ২৪০০ থেকে ২৫০০ লি পথ পেরিয়ে এসে পড়লাম 'ও-চ-লি' বা অটলি রাজ্যে।

রাজ্যটির পরিসর ছয় হাজার লির কাছাকাছি। কুড়ি লি খানেক এলাকা নিয়ে এর রাজধানীটি গড়ে উটেছে। ঘন-জন বসতি ভরা। ভালো জাতের রত্ন পাথর ও মূল্যবান সামগ্রীর এক বিপুল ভাণ্ডার এ রাজ্যটি। ভূমিজাত ফসলাদির কোন রকম কিছু অভাব নেই। তাহলেও ব্যবসাই এদের প্রধান জীবিকা। জমি লবণাক্ত ও বালিভরা। ফুল ও ফল তাই অপর্যাপ্ত নয়।

এ অঞ্চলে হাটসিয়ান (hutsian) গাছ প্রচুর জন্মে। এ গাছের পাতাগুলি বে-চুয়েন গোলমরিচ গাছের (sz'chuen pepper) পাতার মতো দেখতে। হিয়ুন-লু (hiun-lu) সুগন্ধি গাছও এখানে জন্মে। এর পাতা থঙ-লি (thang-li) গাছের পাতার মতো।

এলাকাটির জল বাতাস গরম। বাতাস আর ধুলোর দাপটও রয়েছে। লোকজনের ধরন-ধারণ কেমন যেন নিস্পৃহ-নির্বিকার, ঠান্ডা। ধন-সম্পদই এদের কাছে সবকিছু, সদ্‌গুণাবলী দু-চোখে বিষ। এখানকার বর্ণমালা, ভাষা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, লোকদের শরীরের গড়ন—সবকিছুই মালব দেশের মতো। অটলির বেশির ভাগ লোকেরই পুণ্যকর্মের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ বা বিশ্বাস নেই। যারা একটু বিশ্বাস করে তারা সকলেই দেব-ভক্ত। তাদের মন্দির রয়েছে এখানে হাজারখানেক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিধর্মীরা সেখানে সমবেত হয়, বাস করে।

॥ ৬৬ ॥ 'কিএ-চ' বা কচ্ছ

মালব থেকে উত্তর-পশ্চিমদিকে পথ চলে ৩০০ লি খানেক পার হবার পর 'কিএ-চ' বা কচ্ছে যাওয়া যায়।

দেশটি আয়তনে তিন হাজার লির কাছাকাছি। কুড়ি লি রাজধানীর পরিধি। বেশ ঘন বসতি ভরা অঞ্চল। পরিবারগুলি বেশ সমৃদ্ধ ও ধনী। কোন স্থানীয় শাসক নেই। মালব রাজ্যের অধীন।

জলবায়ু, জমির ফসল, ফুলফলাদি, গাছপালা, লোকজনের আচার ব্যবহার ইত্যাদিতে দু'দেশের মধ্যে গভীর সাম্য রয়েছে।

দশটির মতো সংঘারাম আছে। হাজারখানেক ভিক্ষুর বাস সেখানে। হীনযান ও মহাযান দুয়েরই চর্চা করে তারা। বেশ কিছু (কয়েক দশ) দেবমন্দির রয়েছে। সেখানে অগুণতি বিধর্মী অনুগামী।

॥ ৬৭ ॥ 'ফ-ল-পি' বা বল্লভী

কচ্ছকে পিছনে ফেলে এবার উত্তরমুখো চলতে থাকলাম। লক্ষ্য হলো 'ফ-ল-পি' বা বল্লভী রাজ্য। প্রায় হাজার লি মতন পথ হাঁটার পর সেখানে পেঁছলাম।

ছয় হাজার লি মতন অঞ্চল জুড়ে এ রাজ্যটি। রাজধানীর পরিসর ৩০ লির কাছাকাছি। মাটির রকম, জলবায়ু, মানুষজনের চালচলন আচার ব্যবহার সবকিছুই মালব রাজ্যের মতো।

বেশ ঘন বসতি ভরা জায়গাটি। পরিবারগুলি ধনী ও স্বচ্ছল। কয়েকশো পরিবার আছে যারা রীতিমতো কোটিপতি। দূর অঞ্চল থেকে নানারকম মূল্যবান পণ্যসম্ভার এসে এখানে পাহাড় হয়।

একশোর মতো সংঘারাম হবে এখানে। ভিক্ষুর সংখ্যা হাজার ছয়েক। বেশির ভাগই সম্মতীয় শাখানুগামী হীনযানপন্থী। দেব মন্দিরও শ'খানেক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচুর বিধর্মীর বাস সেখানে।

বুদ্ধদেব প্রায়ই এদেশে আসতেন। এজন্য রাজা অশোক বুদ্ধের বিশ্রাম স্থানগুলিতে স্মারক বা স্তূপ বানিয়েছেন। এগুলির মধ্যে অপর তিন বুদ্ধের ভ্রমণ স্থানগুলিও আছে।

বর্তমান রাজা ক্ষত্রিয় বর্ণের লোক। তিনি মালবের শীলাদিত্য রাজার ভাইপো। কন্যাকুব্জের (কান্যকুব্জ) বর্তমান রাজা শিলাদিত্যের জামাই। তাঁর নাম ধ্রুবপট (বা ধ্রুবভট্ট)। তিনি বেশ সজীব ও বাক্যবাগীশ স্বভাবের। প্রজ্ঞা ও শাসন দক্ষতা অগভীর। অতি সম্প্রতি তিনি বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হয়েছেন। প্রতিবছর তিনি এক মহাসম্মেলন ডাকেন। সাতদিন ধরে সেখানে নানা মূল্যবান ধনরত্ন, সুস্বাদু সব মিষ্টান্ন দান করেন। ভিক্ষুদের ত্রিবিধ পোষাক, ওষুধ বা তার দাম ও মূল্যবান সপ্তরত্নে তৈরী নানা রকম বস্তু বিতরণ ক'রে থাকেন। এসব দান ক'রে আবার দ্বিগুণ মূল্যে নিয়ে নেন। তিনি সদ্‌গুণাবলীর কদর করেন। ভালো কাজকে সম্মান দেখান। যাঁরা প্রজ্ঞার জন্য খ্যাতিবান তাঁদের বিশেষভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। যেসব বড়ো বড়ো ভিক্ষু দূর দূরে অঞ্চল থেকে আসেন তাঁদের তিনি বিশেষ করে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখান।

শহর থেকে একটুখানি দূরে একটি বড়ো সংঘারাম আছে। এটি অর্হৎ আচার-এর গড়া। গুণমতি ও স্থিরমতি বোধিসত্ত্ব ভ্রমণ পথে এখানে কিছুকাল থেকে প্রবন্ধ গ্রন্থাদি রচনা করেন। এই রচনাগুলি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

॥ ৬৮ ॥ 'ও-নন-তো-পু-লো' বা আনন্দপুর

এবার উত্তর-পশ্চিমদিকে রওনা হওয়া গেল। যাবো ও-নন-তো-পু-লো বা আনন্দপুর। সাতশো লি মতন পথ ভাঙতে হলো সেজন্য।

রাজ্যটি দুই হাজার লি আয়তনের। রাজধানী গড়ে উঠেছে ২০ লি মতো এলাকা জুড়ে। ঘন বসতি ভরা। পরিবারগুলি বেশ ধনী। কোন স্থানীয় রাজা নেই। মালব রাজ্যের অধীন।

এখানকার কৃষিজাত দ্রব্যাদি, জল বাতাস, সাহিত্য, আইন কানুন সব কিছুই মালব দেশের মতো।

সংঘারাম আছে প্রায় দশটি। হাজারের কিছু কম ভিক্ষু আছেন। তারা হীনযানের সম্মতীয় শাখার অনুগামী। বেশ কিছু দেবমন্দির রয়েছে (কয়েক দশ)। এগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিধর্মীদের বিচরণ ক্ষেত্র।

॥ ৬৯ ॥ 'সু-লো-চ' বা সুরাষ্ট্র

বল্লভী থেকে পশ্চিমে গেলাম এবার। ৫০০ লি যাবার পর দেখা পেলাম 'সু-লো-চ' বা সুরাষ্ট্র রাজ্যের।

দেশটির আয়তন চার হাজার লির কাছাকাছি। রাজধানীর পরিধি তিরিশ লি। রাজধানীর পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে মাহী নদী চলে গেছে। বেশ ঘন বসতি ভরা অঞ্চলটি। বাসিন্দারা স্বচ্ছল ও ধনী। রাজ্যটি বল্লভীদের অধীন।

এ অঞ্চলের মাটি নোনা। ফল ও ফুলের ছড়াছড়ি তাই বেশ কম। আবহাওয়া গা-সওয়া গোছের হলেও ঝড় ঝঞ্ঝার বিরাম নেই। লোকজন যত্নহীন, নির্বিকার নিস্পৃহ ধরনের। লঘু ও অস্থির-মতি স্বভাব। লেখাপড়া, জ্ঞানচর্চার দিকে কোন শ্রদ্ধা বা আগ্রহ নেই। সত্যধর্মী ও অন্যধর্মী দু-ই রয়েছে।

পঞ্চাশটি মতো সংঘারাম আছে। সেখানে হাজার তিনেক ভিক্ষুর বসবাস। তাদের বেশির ভাগই মহাযানের স্থবির শাখার অনুগামী। শ'খানেক দেবমন্দির রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিধর্মীতে সেগুলি ভরা।

এ রাজ্যটি পশ্চিম সাগর পথে অবস্থিত। এজন্য সাগর-নির্ভর জীবিকাগুলি ও ব্যবসা বাণিজ্য এদের আয়ের প্রধান পথ।

এই শহর থেকে খানিকটা গেলেই উদন্ত পাহাড়। এর উপর একটি সংঘারাম আছে। পাহাড়ের গা কেটে বেশির ভাগ কক্ষ ও বারান্দাগুলি বানানো হয়েছে। পাহাড়টি ঘন বন জঙ্গল ও গাছগাছালিতে ভরা। কয়েকটি ঝরনা একে ঘিরে বয়ে চলেছে। মুনি-ঋষিদের বিচরণ ও বাসের জায়গা এটি।

॥ ৭০ ॥ 'কিউ-চে-লো' বা গুর্জর

বল্লভী থেকে উত্তরমুখো কম বেশি ১৮০০ লি যাবার পর গুর্জর দেশে পৌঁছানো যায়।

দেশটির আয়তন ৫ হাজার লির কাছাকাছি। রাজধানীর নাম পি-লো-মো-লো (রাজপুতানার বালমের, 25° 48′ N 71° 16′ E) ৩০ লি এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও লোকজনের চালচলন সুরাষ্ট্রের মতোই। ঘন জনবসতি। পরিবারগুলি বেশ অবস্থাপন্ন। বেশির ভাগ লোকই অন্যধর্মী। বৌদ্ধ ধর্মীরা সংখ্যায় বেশ অল্প।

একটি মাত্র সংঘারাম আছে এ দেশে। শতখানেক ভিক্ষুর বসবাস সেখানে। সকলেই হীনযানের অনুরাগী। সর্বাস্তিবাদ শাখার নির্দেশ মতো চলে। দেবমন্দিরের সংখ্যা অনেক (কয়েক দশ)। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীরা সেখানে থাকেন।

রাজা ক্ষত্রিয় বর্ণের লোক। তাঁর বয়েস সবে মাত্র কুড়ি বছর। তিনি একজন প্রজ্ঞাবান লোক। সাহসীও। বুদ্ধের মতবাদে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী। বিশিষ্ট প্রতিভাবানদের তিনি বিশেষভাবে কদর দেখান।

॥ ৭১ ॥ 'উ-শে-ইয়েন-ন' বা উজ্জয়িনী

এবার দক্ষিণ-পূর্বদিকে যাত্রা করা গেলো। কমবেশি ২৮০০ লি পথ ভাঙার পর আমরা এসে থামলাম 'উ-শে-ইয়েন-ন' বা উজ্জয়িনী।

এরাজ্যটি পরিসরে ছয় হাজার লির মতো। রাজধানীর পরিধি ৩০ লি হবে। ঘন লোকবসতি ভরা। পরিবারগুলি বিত্তবান।

এখানে অনেকগুলি সংঘারাম থাকলেও বেশির ভাগেরই ভাঙাচোরা অবস্থা। গুটি চার পাঁচ যা খাড়া অবস্থায় আছে। সেখানে শ'তিনেক ভিক্ষু থাকেন। তাঁরা হীনযান ও মহাযান দুয়েরই চর্চা করেন। দেবমন্দির রয়েছে অনেক (কয়েক দশ)। নানা সম্প্রদায়ের বিধর্মীরা সেখানে থাকেন।

রাজা ব্রাহ্মণ বর্ণের লোক। অন্যধর্মী শাস্ত্রাদিতে তাঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে। সত্য-ধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ বা বিশ্বাস নেই।

শহর থেকে খানিক পথ গেলেই একটি স্তূপের দেখা পাওয়া যাবে।

॥ ৭২ ॥ চি-কি-তো

এখান থেকে এক হাজার লি মতো উত্তর-পূবমুখো যাবার পর 'চি-কি-তো' রাজ্যে এসে পেঁছিলাম।

এ দেশটি কমবেশি চার হাজার লি অঞ্চল নিয়ে। রাজধানীটি ১৫-১৬ লি মতন হবে। এখানকার মাটি উর্বরা বলে খ্যাতি রয়েছে। নিয়মিত চাষ-আবাদ, ফসল বোনা হয়। ফলনও যথেষ্ট। এখানে বিশেষভাবে ডাল ও যবের চাষ হয়ে থাকে। ফল, ফুল অপর্যাপ্ত ফলানো হয়।

আবহাওয়া চলনসই, লোকজনেরা সহজাতভাবে সদ্গুণবান ও শান্তশিষ্ট। বেশির ভাগই অন্য ধর্মে বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্মানুরাগী খুব কম লোকই। অনেকগুলি সংঘারাম থাকলেও মাত্র কিছু ভিক্ষু সেখানে থাকেন। দশটির মতো দেবমন্দির রয়েছে। কয়েক হাজার অনুগামী সেখানে থাকেন।

রাজা ব্রাহ্মণ বর্ণের লোক। তিনি ত্রি-রত্নে গভীর বিশ্বাসী। সদ্গুণাবলীর জন্য যারা বিশিষ্ট তাদের তিনি সম্মান করেন পুরস্কার দেন। দূর দূর দেশ থেকে এখানে প্রচুর শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকের সমাবেশ ঘটে।

॥ ৭৩ ॥ 'মো-হি-শি-ফ-লো-পু-লো' বা মহেশ্বরপুর

এখান থেকে এবার আমরা উত্তরের দিকে চলতে শুরু করলাম। যাবো মো-হি-শি-ফ-লো-পু-লো বা মহেশ্বরপুর। প্রায় ন'শো লি অতিক্রম ক'রে এখানে এলাম।

এ রাজ্যটি ৩০০০ লি মতো অঞ্চল জুড়ে। রাজধানীর ঘের তিরিশ লির কাছাকাছি।

এখানকার জমির ফল-ফসলাদি, লোকজনের আচার ব্যবহার সব কিছুই উজ্জয়িনীর মতো। এরা অন্য ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগী। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই।

অনেক দেবমন্দির এখানে (কয়েক দশ)। পাশুপত সম্প্রদায়ের লোকই সব থেকে বেশি।

রাজা ব্রাহ্মণ বর্ণের লোক। বুদ্ধদেবের মতবাদের প্রতি তার কোন অনুরাগই নেই।

॥ ৭৪ ॥ 'সিন-তু' বা সিন্ধু

এখান থেকে এবার গুর্জর ফিরে গেলাম। তারপর উত্তরমুখো চলতে থাকলাম। ধু ধু প্রান্তর, নানা বিপদজনক গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে ১৯০০ লি মতো পথ ভাঙলাম। বিরাট সিন্ধুনদ পার হয়ে এলাম সিন্ধু রাজ্যে।

রাজ্যটির পরিধি প্রায় ৭০০০ লি। রাজধানী শহরের নাম পি-শেন-পো-পু-লো। ৩০ লি খানেক এলাকা জুড়ে গ'ড়ে উঠেছে। মাটি খাদ্যশস্য ফলনের পক্ষে উপযোগী। প্রচুর গম ও জোয়ারের ফলন হয়। সোনা, রুপা ও দেশী তামা এখানে প্রচুর মেলে। গরু, ভেড়া, উট, খচ্চর ইত্যাদি পশু পালনের পক্ষেও অঞ্চলটি উপযোগী। উটগুলি আকারে ছোট, একটি মাত্র কুঁজ রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে লবণ পাওয়া যায়। দেখতে 'চিন্নবর' (chinnabar)-এর মতো লালচে। সাদা, কালো ও পাথুরে লবণও আছে। কাছের ও দূরের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সব লবণ ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

মানুষজনের প্রকৃতি কঠোর ও খেয়ালী। কিন্তু বেশ সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ তারা। ঝগড়া ঝাঁটি ও কথায় কথায় প্রতিবাদ ও অস্বীকার করার অভ্যাস রয়েছে। জ্ঞানচর্চা করে বটে, কিন্তু বিশিষ্টতা অর্জনের দিকে কোন চেষ্টা নেই। বুদ্ধের মতবাদের প্রতি অনুরাগ রয়েছে।

এখানে কয়েক শো সংঘারাম রয়েছে। সেখানে হাজার দশেকের মতো ভিক্ষু থাকেন। সম্মতীয় শাখার হীনযান অনুগামী তারা। যাঁরা একান্তভাবে ধর্মানুরাগী তাঁরা পাহাড় ও বনাঞ্চলের মধ্যে নির্জনে বসবাস করেন। সেখানে তাঁরা দিনরাত অবিরামভাবে অর্হত্ব অর্জনের জন্য সাধনা ক'রে চলেছেন।

তিরিশটির মতো দেবমন্দির আছে। নানান সম্প্রদায়ের অনুগামীরা সেখানে বাস করেন।

দেশের রাজা শূদ্রবর্ণের লোক। স্বভাবে তিনি স্বতঃই সৎ ও আন্তরিক। বুদ্ধের মতবাদকে শ্রদ্ধা করেন।

তথাগত প্রায়ই এ দেশ ভ্রমণ করেছেন। এজন্য রাজা অশোক এখানে অনেকগুলি (কয়েক দশ) স্তূপ বানিয়েছেন। পরম অর্হৎ উপগুপ্ত এ রাজ্যে প্রায়ই ধর্ম প্রচারের

জন্য আসতেন। তিনি যে সব জায়গায় থেকেছেন, সেখানেই সংঘারাম বা স্তূপ বানানো হয়েছে। যেদিকে যাও এই স্মারক চোখে পড়বে।

সিন্ধু নদের পাশে কয়েক শো লি ব্যাপী নিচু জলাভূমি অঞ্চল জুড়ে কয়েক লক্ষ পরিবারের বসবাস। এদের হৃদয় বলে কিছু নেই। অতি উগ্র ও তড়বড়ে স্বভাবের। রক্তপাতের দিকে প্রবল ঝোঁক। এরা বিশেষভাবে গো-পালন ক'রে নিজেদের ভরণপোষণ চালায়। এদের কোন শাসক বা প্রভু নেই। পুরুষ বা মেয়েই হোক এরা ধনীও নয়, দরিদ্রও নয়। এরা মাথা কামায়, ভিক্ষুদের 'কাষায়' বস্ত্র পরে। এ শুধু তাদের বাইরের পোষাকই, ভিতরে তারা সাধারণ গৃহী মানুষের মতোই আচরণ করে। নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকেই এরা সমর্থন করে ও মহাযানকে কথায় কথায় আক্রমণ করে।

॥ ৭৫ ॥ 'মু-লো-সান-পু-লু' বা মূলস্থানপুর (মুলতান)

এ রাজ্য পেরিয়ে চললাম পূবদিকে। সিন্ধুনদ ডিঙিয়ে তার পূব তীর বরাবর ন'শো লি মতো পথ চলার পর পেঁছিলাম এসে মু-লো-সান-পু-লু বা মূলস্থানপুর (মুলতান)।

এ দেশটির পরিসর মাত্র চার হাজার লি মতো। রাজধানীর ঘের তিরিশ লির কাছাকাছি। ঘন বসতি ভরা। পরিবারগুলি বেশ সমৃদ্ধ। এ রাজ্যটি চেক (ৎসে-কিঅ) রাজ্যের অধীন। জমি বেশ রসালো ও উর্বরা। জলবায়ু স্নিগ্ধ ও মনোরম। লোকজনের আচার ব্যবহার সততা ও সরলতা ভরা। বিদ্যার দিকে অনুরাগ রয়েছে, সদ্‌গুণের কদর করে। বেশির ভাগই দেব-পূজায় বিশ্বাসী। সামান্য কিছু বৌদ্ধধর্মী।

রাজ্যে দশটির মতো সংঘারাম রয়েছে, তার বেশির ভাগেরই ভাঙাচোরা অবস্থা। সামান্য কতক ভিক্ষু আছেন। তাঁরা বিদ্যাচর্চ্চা করেন বটে, তবে আত্মোন্নতির কোন স্পৃহা নেই। ৮টি দেবমন্দির আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্য ধর্মীরা সেখানে থাকে। এখানে একটি সূর্য বা আদিত্য মন্দির আছে। এটি অতি চমৎকার ও যথেষ্ট জাঁকালো করে সাজানো। সূর্যদেবের প্রতিমাটি হলদে সোনায় গড়া ও নানা দুর্লভ রত্নাদি দিয়ে সাজানো। স্ত্রীলোকেরা এখানে গান-বাজনা করে, প্রদীপ জ্বালিয়ে ফুল ও ধূপ ও ধুনা সুগন্ধি দিয়ে সম্মান জানায়। আদি থেকেই এই রীতি চলে আসছে। পঞ্চ সিন্ধুর রাজা ও অভিজাত পরিবারেরা এই দেবতার নিকট নানা দামী দামী পাথর ও রত্নাদি নিবেদন করেন।

এঁরা একটি পুণ্যশালা বানিয়েছেন। এখানে গরিব, রুগ্ন প্রভৃতিকে খাদ্য, পানীয় ও ওষুধ বিতরণ করা হয়, জীবন ধারণের উপায় করে দেয়া হয়। সব দেশের লোক এখানে পুজো দিতে আসেন। সব সময়েই শত শত লোকের ভিড়। মন্দিরটির চারিদিকে পুকুর ও ফুলের বাগান রয়েছে। সেখানে বিনা বাধায় যে কেন লোক ঘুরে বেড়াতে পারেন।

॥ ৭৬ ॥ 'পো-ফ-তো' বা পর্বত রাজ্য

এখান থেকে উত্তর-পূর্বদিকে চললাম এবার। সাতশো লি পথ ভাঙার পর এসে থামলাম 'পো-ফ-তো' বা পর্বত রাজ্যে।

প্রায় পাঁচ হাজার লি জুড়ে এই রাজ্যটি। রাজধানীর আয়তন কুড়ি লি মতো। দেশটি ঘন বসতিপূর্ণ ও চেক রাজ্যের অধীন। শুকনো জমিতে ফলন হয় এমন ধান এখানে প্রচুর পরিমাণে হয়। এ দেশের মাটি ডাল ও গম চাষের পক্ষেও অনুকূল।

আবহাওয়া না বেশি গরম না বেশি ঠাণ্ডা। লোকজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ। কিছুটা তড়বড়ে ও ব্যস্তবাগীশ। এদের ভাষা নিচু মানের। সাধারণ রচনা ও সাহিত্যে বেশ পারদর্শী। বৌদ্ধধর্মী ও অন্য ধর্মী দুই-ই রয়েছে এখানে।

দশটির মতো সংঘারাম এ রাজ্যে। ভিক্ষু হাজারখানেক হবে। হীনযান ও মহাযান দুয়েরই চর্চা করেন।

রাজা অশোকের তৈরী চারটি স্তূপ রয়েছে এখানে। কুড়িটির মতো দেবমন্দির আছে। বিভিন্ন মতের অন্য ধর্মীরা এখানে থাকেন, সমবেত হন।

রাজধানী শহরের কাছেই একটি বড়ো সংঘারামের দেখা পেলাম। শ'খানেক ভিক্ষু আছেন। মহাযানের চর্চা করেন। শাস্ত্রাচার্য জিনপুত্র এখানে থেকে যোগাচার্যভূমি শাস্ত্রকারিকা বইখানি লেখেন। শাস্ত্রাচার্য ভদ্ররুচি ও গুণপ্রভ এখানেই ধর্মজীবনে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এ সংঘারামটি অগ্নিকাণ্ডের ফলে নষ্ট হয়েছে, এজন্য বর্তমানে পুরোপুরি পরিত্যক্ত অবস্থা।

॥ ৭৭ ॥ 'ও-তিন-পো-চি-লো' বা অত্যনবকেল

সিন্ধুদেশ পিছনে ফেলে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে পনের শো থেকে ষোলো শো লি গিয়ে আমরা ও-তিন-পো-চি-লো বা অত্যনবকেল রাজ্যে পৌঁছালাম।

এ দেশটির পরিসর পাঁচ হাজার লি মতো। প্রধান শহরের নাম খিএ-র্‌স-শি-ফ-লো। আয়তনে তিরিশ লি খানেক। শহরটি সিন্ধুনদ ও মহাসাগর সঙ্গমে। এখানকার বাড়িঘরগুলি খুব অলংকৃত করা। দামী দামী আসবাব ও দুর্লভ জিনিসপত্রে বোঝাই। বর্তমানে এখানকার কোন স্থানীয় শাসক নেই, রাজ্যটি সিন্ধুর অধীন।

এখানকার জমি নিচু ও স্যাঁতসেতে, মাটি নোনা (বেশির ভাগ এলাকাই বুনো লতাপাতা গুল্মে ভরা অনাবাদী জমি)। খুব অল্প জমিতেই চাষ হয়। ডাল আর গমের ফলন হার প্রচুর। অন্যান্য কয়েক ধরনের ফসলের উৎপাদন সাধারণ রকমের।

আবহাওয়া ঠাণ্ডা, প্রচণ্ড ঝড়-বাত্যার প্রকোপ। গরু, ভেড়া, উট, গাধা এইসব ধরনের পশু পালনের পক্ষে বেশ অনুকূল জায়গা।

লোকজন মারমুখী ও ব্যস্তবাগীশ। জ্ঞানচর্চ্চার দিকে কোন আগ্রহ নেই। মধ্য ভারত থেকে এদের ভাষা কিছুটা পৃথক। আচার ব্যবহারের দিক থেকে সৎ ও আন্তরিকতাপূর্ণ। ত্রিরত্নের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল।

আশিটির মতো সংঘারাম আছে। ভিক্ষুর সংখ্যা সেখানে হাজার পাঁচেক। বেশির ভাগ ভিক্ষুই সম্মতীয় শাখানুবর্তী হীনযানপন্থী। দশটির মতো দেবমন্দির। সবাই প্রায় পাশুপত সম্প্রদায়ের।

রাজধানীতে শহর মধ্যে একটি শিবমন্দির রয়েছে। মন্দিরটি খুব উঁচু দরের ভাস্কর্য মণ্ডিত। দেব-প্রতিমার অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতি রয়েছে। পাশুপত অনুগামীরা এ মন্দিরটিতে বাস করেন। তথাগত প্রায়ই এ রাজ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য আসতেন। তাঁর স্মারক হিসাবে রাজা অশোক এখানে ছয়টি স্তূপ গড়ে গেছেন।

॥ ৭৮ ॥ 'লঙ-কিও-লো' বা লঙ্গলা

এবার পশ্চিমদিকের পথে চললাম। দু হাজার লি যাবার পর এসে উঠলাম 'লঙ-কিও-লো' বা লঙ্গলা।

এ দেশটি পূব থেকে পশ্চিমে কয়েক হাজার লি, উত্তর-দক্ষিণেও ওই রকম। রাজধানীটি ৩০ লি খানেক এলাকা জুড়ে। নাম—সু-নু-লি-চি-ফ-লো (সুনুরিশ্বর ?)

এখানকার মাটি সরস ও উর্বরা। ফসলের ফলন প্রচুর। জলবায়ু ও লোকের আচার আচরণ অত্যনবকেল-র মতোই। ঘন লোকবসতি ভরা। দামী দামী পাথর ও রত্ন প্রচুর। দেশটি সমুদ্রকূলে। পশ্চিমী প্রমীলা রাজ্য যেদিকে এ রাজ্যটি সেদিক পানে। এখানকার কোন প্রধান শাসক নেই। লোকেরা এক বিরাট উপত্যকা জুড়ে বসবাস ক'রে চলেছে। কেউ অন্য কারো 'পরে নির্ভরশীল নয়। এরা পারস্য সরকারের অধীন। বর্ণমালা প্রায় ভারতের বর্ণমালার আকার। ভাষা সামন্য কিছুটা পৃথক। বৌদ্ধধর্ম ও অন্য ধর্মী দুই-ই আছে।

শ'খানেক সংঘারাম রয়েছে। বোধহয় হাজার দুয়েক ভিক্ষু সেখানে আছেন। তাঁরা হীনযান ও মহাযান দু'য়েরই চর্চ্চা করেন। কয়েক শো দেবমন্দির চোখে পড়বে। পাশুপাত সম্প্রদায়ের অনুগামীরাই সব থেকে বেশি। শহরে একটি মহেশ্বর দেবের মন্দির রয়েছে। এটি সুন্দরভাবে কারুকার্য ও ভাস্কর্য করা।

॥ ৭৯ ॥ 'পি-তো-শি-লো' বা পীতশিলা

অত্যনবকেল রাজ্য থেকে আবার পা বাড়ালাম উত্তরদিকে। প্রায় সাতশো লি এগোবার পর পি-তো-শি-লো বা পীতশিলা রাজ্যে পেঁছালাম।

রাজ্যটির আয়তন কম হলেও হাজার তিনেক লি। রাজধানীর পরিধি ২০ লি।

জায়গাটি লোক বসতিতে ভরপুর। কোন স্থানীয় রাজা নেই, সিন্ধুর অধীন।

লবণ ও বালিভরা মাটি। হিমেল ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়। ডাল ও গমের যথেষ্ট ফলন। ফুল ফল বলতে গেলে বিরল।

মানুষজনের আচার ব্যবহার উগ্র ও রুক্ষ। এদের ভাষা মধ্য ভারতের তুলনায় সামান্য ভিন্ন। বিদ্যা চর্চ্চার দিকে ঝোঁক নেই। তবে যতটুকু জানে তার 'পরে তাদের গভীর আস্থা রয়েছে। পঞ্চাশটির মতো সংঘারাম আছে। হাজার তিনেক ভিক্ষু থাকেন সেখানে। সম্মতীয় শাখার হীনযান উপাসক সকলে। কুড়িটির মতো দেবমন্দির দেখতে পাওয়া যাবে। পাশুপত মতবাদের প্রাধান্যই সেখানে বেশি।

নগরীর উত্তরদিকে ১৫-১৬ লি গেলে একটি বিরাট বনের মধ্যে কয়েক শো ফুট উঁচু একটি স্তূপ দেখা যাবে। এটি রাজা অশোকের তৈরী।

এর কিছু পূবে একটি পুরানো সংঘারাম। বিশিষ্ট অর্হৎ মহা-কত্যায়ন এটি গড়েন। কাছেই চার বুদ্ধের স্মারক হিসেবে একটি স্তূপ আছে।

এখান থেকে উত্তর পূবমুখো তিনশো লি যাবার পর আমরা দেখা পাই 'ও-ফন--চ' বা অবন্ড রাজ্যের।

॥ ৮০ ॥ 'ও-ফন-চ' বা অবন্ড

এ রাজ্যটির আয়তন দু'হাজার থেকে আড়াই হাজার লি হবে। রাজধানীর ঘের কুড়ি লির মতো। এ রাজ্যেরও কোন স্থানীয় রাজা নেই। এটি সিন্ধুর অধীন।

মাটি শস্য আবাদের উপযোগী। ডাল ও গমের ফলন প্রচুর। ফুল ও ফল নেহাৎই কম। বন, গাছপালাও কম। আবহাওয়া ঠাণ্ডা, হাওয়ার দাপট বেশি। লোকজন উগ্র স্বভাবের ও তাড়নার বশ। ভাষা সাদামাটা ধরনের ; তেমন কিছু মার্জিত উন্নত নয়। লেখাপড়ার তেমন কদর নেই। তবে তারা বৌদ্ধধর্মে উৎসাহী ও তার আন্তরিক অনুগামী।

কুড়িটির মতো সংঘারাম রয়েছে। সেখানে হাজার দু'য়েক ভিক্ষু থাকেন। অধিকাংশই সম্মতীয় শাখার হীনযানপন্থী। গুটি পাঁচেক দেবমন্দির। সেখানে পাশুপত সম্প্রদায়ের অনুরাগীদেরই প্রাধান্য।

শহরের উত্তর-পূবে খানিকটা গেলে বনের মাঝে প্রায় ভেঙে পড়া অবস্থায় একটি সংঘারাম চোখে পড়বে। এখানকার ভিক্ষুদের তথাগত জুতা পরার অনুমতি দিয়ে যান। পাশেই রাজা অশোকের তৈরী একটি স্তূপ। ভিত অনেকটা মাটিতে দেবে গেছে, তাহলেও বাকী অংশ কয়েকশো ফুট উঁচু। স্তূপের পাশে একটি বিহার মধ্যে নীল পাথরে গড়া একটি দাঁড়ানো বুদ্ধমূর্তি আছে।

দক্ষিণে ৮০০ পা মতো দূরে বনের মধ্যে রাজা অশোকের তৈরী আরো একটি স্তূপ। এই বনের মাঝে আরো কতক স্তূপ রয়েছে। এরই একটি স্তূপে বুদ্ধদেবের চুল ও নখকণা রয়েছে।

॥ ৮১ ॥ 'ফ-ল-ন' বা বরণ

এখান থেকে উত্তর-পূর্বদিকে ন'শো লি মতো পথ চলার পর আমরা 'ফ-ল-ন' বা বরণ রাজ্যের দেখা পাই।

রাজ্যটি চার হাজার লি অঞ্চল জুড়ে। প্রধান শহরটি কুড়ি লি মতো। ঘন জন-বসতি ভরা। এটি কপিশার অধীন রাজ্য।

রাজ্যের বেশিরভাগ অঞ্চলই বন আর পাহাড়ে ভরা। নিয়মিতভাবে চাষ আবাদের কাজ চলে। আবহাওয়া একটু ঠান্ডাই। লোকজনের আচার ব্যবহার রুক্ষ ও উগ্র। নিজেদের রীতিনীতি সুরক্ষার দিকে গোঁড়ামী রয়েছে ও তার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এর উদ্ভব। ভাষা কতকটা মধ্য ভারতের মতোই। কতক বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী, কতক অন্য ধর্মে। সাহিত্য বা শিল্পের দিকে কোনরকম আগ্রহ নেই।

বেশকিছু সংঘারাম আছে। তবে সবগুলিই প্রায় ভাঙা বা ভেঙে পড়ার মুখে। শ'তিনেক ভিক্ষু আছেন। সকলেই মহাযানের চর্চা করেন। পাঁচটি দেবমন্দির রয়েছে। পাশুপত সম্প্রদায়ের অনুগামীর সংখ্যাই বেশি।

শহর থেকে একটু দক্ষিণে একটি পুরানো সংঘারাম আছে। পাশেই অতীত চার বুদ্ধদেবের স্মারক। সাধারণ খবর মতো এ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে কি-কিয়াঙ-ন (কিকন?) রাজ্য। বিরাট পাহাড়ী এলাকায় ও পর্বত উপত্যকায় লোকজন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এদের কোন রাজা নেই। এরা প্রচুর ভেড়া ও ঘোড়া উৎপাদন করে। সেই ঘোড়াগুলি বড়ো আকারের। পাশের রাজ্যগুলিতে খুব কম ঘোড়া জন্মে। এ জন্য সেখানে তাদের খুব কদর।

এ রাজ্যটিকে পিছনে ফেলে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম উত্তর-পশ্চিমদিকে। বিরাট বিরাট পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, চওড়া উপত্যকা ভেঙে, পর পর অনেক ছোট ছোট শহর পার হয়ে এগিয়ে চললাম। কম-বেশি দু'হাজার লি পথ চলার পর আমরা ভারত সীমান্ত পার হলাম। পা দিলাম ৎসোউ কু-ট বা সৌকুট রাজ্যে।

শব্দ-নির্দেশিকা

দ্রষ্টব্য ঃ শব্দের প্রথম অক্ষরের স্বর-উচ্চারণ অনুসারে (অ, আ, ই, প্রভৃতি) এই নির্দেশিকাটি সাজানো হয়েছে।

আ

দ্রষ্টব্য : শব্দের প্রথম অক্ষরের স্বর-উচ্চারণ অনুসারে (অ, আ, ই প্রভৃতি) এই নির্দেশিকাটি সাজান হয়েছে।
